"যে সমস্ত মহাত্মারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও গুরুদেবের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি লাভ করেছেন, তাঁদের কাছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সম্পূর্ণ তাৎপর্য প্রকাশিত হয়।"

(*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/২৩)

ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্যম্। "ভক্তি মানে হচ্ছে লৌকিক অথবা পারলৌকিক সব রকম বিষয়-বাসনা রহিত ভগবৎ-সেবা। বিষয়-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে মনকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় পূর্ণরূপে তন্ময় করা। সেটিই হচ্ছে নৈষ্কর্মের উদ্দেশ্য।"

(*গোপালতাপনী উপনিষদ* ১/১৫)

এগুলি হচ্ছে যোগপদ্ধতির সর্বোচ্চ সিদ্ধির স্তর—ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করার কয়েকটি উপায়।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—ধ্যানযোগ নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

বিজ্ঞান-যোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ময়ি**—আমাতে; **আসক্তমনাঃ**—অভিনিবিষ্ট চিত্ত; **পার্থ**—হে পৃথার পুত্র; **যোগম্**—যোগ; **যুঞ্জন্**—যুক্ত হয়ে; **মদাশ্রয়ঃ**—আমার ভাবনায় ভাবিত হয়ে (কৃষ্ণভাবনা); **অসংশয়ম্**—নিঃসন্দেহে; **সমগ্রম্**—সম্পূর্ণরূপে; **মাম্**—আমাকে; **যথা**—যেরূপে; **জ্ঞাস্যসি**—জানবে; **তৎ**—তা; **শৃণু**—শ্রবণ কর।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

আমাতে আসক্ত হয়ে যোগের সাধন।
তোমারে কহিনু পার্থ সব এতক্ষণ ॥
সে যোগ আশ্রয় করি সমগ্র যে আমি।
অসংশয় বুঝিবে যে অনিবার্য তুমি ॥

শুন পার্থ সেই কথা তোমাকে যে কহি।
ভক্তিযোগ শুদ্ধ সত্ত্ব যাতে তুষ্ট রহি ॥

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—হে পার্থ! আমাতে আসক্তচিত্ত হয়ে, আমাতে মনোনিবেশ করে যোগাভ্যাস করলে, কিভাবে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে জানতে পারবে, তা শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার এই সপ্তম অধ্যায়ে ভগবৎ-তত্ত্বের বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ। তাঁর এই সমস্ত ঐশ্বর্যের প্রকাশ কিভাবে হয়, তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। চার ধরনের সৌভাগ্যবান লোক ভগবানের শ্রীচরণে আসক্ত হন এবং চার ধরনের হতভাগ্য লোক কখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন না, তাঁদের কথাও এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভগবদ্গীতার প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জীবের স্বরূপ হচ্ছে তার চিন্ময় আত্মা এবং বিভিন্ন যোগ-সাধনার মাধ্যমে সে চিন্ময় স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মনকে সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় নিযুক্ত করা বা সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়াই সর্বপ্রকার যোগ-সাধনার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মনকে সর্বতোভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে একাগ্র করার মাধ্যমে পরম-তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায়, এ ছাড়া আর কোন উপায়েই তা সম্ভব নয়। নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি অথবা অন্তর্যামী পরমাত্মা উপলব্ধি পরম-তত্ত্বের পূর্ণজ্ঞান নয়, কেন না তা হচ্ছে আংশিক উপলব্ধি। পূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভাবনাময় মানুষের কাছে সব কিছুই পূর্ণ প্রকাশিত হয়ে থাকে। সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করার ফলে নিঃসন্দেহে অবগত হওয়া যায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম জ্ঞান। বিভিন্ন প্রকার যোগ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা অর্জনের পথে পদক্ষেপ মাত্র। সরাসরিভাবে ভগবদ্ভক্তি লাভ করে যিনি ভগবানের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করেন, তিনি অনায়াসে ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্মাতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্বতোভাবে অবগত হন। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযোগ অনুশীলন করার মাধ্যমে সব কিছুই পরিপূর্ণরূপে জানতে পারা যায়। তখন সর্বতোভাবে জানা যায় ভগবান কে, জীব কি, জড়া প্রকৃতি কি এবং তাদের প্রকাশ কিভাবে হয়।

তাই, *ভগবদ্গীতার* ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকের নির্দেশ অনুসারে ভক্তিযোগের অনুশীলন শুরু করা উচিত। নববিধা ভক্তির মাধ্যমে মনকে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন করা যায়। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে *শ্রবণম্*। ভগবান তাই অর্জুনকে বলেছেন, *তচ্ছৃণু* অর্থাৎ "আমার কাছ থেকে শ্রবণ কর।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে নির্ভরযোগ্য আর কেউ নেই, আর তাই তাঁর কাছ থেকে শ্রবণ করার মাধ্যমে এই জ্ঞান আহরণ করলে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনাময় মানুষ হয়ে ওঠার শ্রেষ্ঠ সুযোগ লাভ করা যায়। তাই এই জ্ঞান সরাসরি শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে অথবা শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করতে হয়—কেতাবি বিদ্যায় অহঙ্কারী, অভক্ত ভুঁইফোড়ের কাছ থেকে নয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধির এই পদ্ধতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥

নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥

তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি ॥

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥

"বৈদিক শাস্ত্রসমূহ থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করলে অথবা *ভগবদ্গীতা* থেকে ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করলে কল্যাণ হয়। কেউ যখন কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সকলের অন্তরে বিরাজমান, তিনি পরম বন্ধুর মতো তাঁর হৃদয়কে সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত করেন। এভাবেই ভক্তের হৃদয়ে সুপ্ত পারমার্থিক জ্ঞানের বিকাশ হয়। *শ্রীমদ্ভাগবত* ও ভগবদ্ভক্তের কাছ থেকে তিনি যত কৃষ্ণকথা শোনেন, ততই তাঁর অন্তরে ভগবদ্ভক্তি সুদৃঢ় হয়। ভগবদ্ভক্তি বিকশিত হওয়ার ফলে রজোগুণ ও তমোগুণ থেকে মুক্তি লাভ হয় এবং এভাবেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি অন্তর্হিত হয়। এই সমস্ত কলুষ

থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে ভগবদ্ভক্ত তখন শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হন। তিনি তখন আন্তরিকভাবে ভগবৎ-সেবায় সঞ্জীবিত হন এবং পরিপূর্ণরূপে ভগবৎ-তত্ত্বের বিজ্ঞান উপলব্ধি করেন। এভাবেই ভক্তিযোগ সাধন করার ফলে জড় আসক্তির গ্রন্থি ছিন্ন হয় এবং মানুষ তখন অচিরেই *অসংশয়ং সমগ্রম্*, অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অবগত হন।" (*ভাগবত* ১/২/১৭-২১)

তাই, কৃষ্ণতত্ত্বের বিজ্ঞান বুঝতে হয় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে অথবা কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তের কাছ থেকে।

শ্লোক ২

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥

জ্ঞানম্—জ্ঞানের কথা; **তে**—তোমাকে; **অহম্**—আমি; **স বিজ্ঞানম্**—বিজ্ঞান সমন্বিত; **ইদম্**—এই; **বক্ষ্যামি**—বলব; **অশেষতঃ**—পূর্ণরূপে; **যৎ**—যা; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **ন**—না; **ইহ**—এই জগতে; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **অন্যৎ**—আর কিছু; **জ্ঞাতব্যম্**—জানবার; **অবশিষ্যতে**—বাকি থাকে।

গীতার গান

আমার বিষয়ে যে হয় জ্ঞান বিজ্ঞান ।
সে বিষয়ে অশেষত শুন দিয়া মন ॥
জানিলে সে তত্ত্বজ্ঞান জ্ঞাতব্য বিষয় ।
সহজেই সব তত্ত্ব সমাধান হয় ॥

অনুবাদ

আমি এখন তোমাকে বিজ্ঞান সমন্বিত এই জ্ঞানের কথা সম্পূর্ণরূপে বলব, যা জানা হলে এই জগতে আর কিছুই জানবার বাকি থাকে না।

তাৎপর্য

পূর্ণজ্ঞান বলতে প্রপঞ্চময় জগৎ, এর পশ্চাতে চেতন ও উভয়ের উৎস সম্পর্কিত জ্ঞানকে বোঝায়। এটিই হচ্ছে অপ্রাকৃত জ্ঞান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলেন, তার কারণ হচ্ছে অর্জুন ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্ত

ও সখা। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমে ভগবান সেই কথা ব্যাখ্যা করেছেন এবং এখানেও তিনি প্রতিপন্ন করেছেন যে, ভগবানের ভক্তই কেবল গুরু-পরম্পরা ধারায় সাক্ষাৎ ভগবানের কাছ থেকে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারেন। তাই, যথার্থ বুদ্ধিমত্তা সহকারে সমস্ত জ্ঞানের উৎসকে জানবার প্রয়াসী হতে হয়, যিনি হচ্ছেন সমস্ত কারণের কারণ এবং সমস্ত যোগ-সাধনায় ধ্যানের একমাত্র বিষয়বস্তু। যখন সমস্ত কারণের কারণকে জানা যায়, তখন যা কিছু জ্ঞাতব্য তা সবই জানা হয়ে যায় এবং আর কোন কিছুই অজানা থাকে না। *বেদে* (*মুণ্ডক উপনিষদ* ১/৩) বলা হয়েছে—*কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।*

শ্লোক ৩

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥

মনুষ্যাণাম্—মানুষের মধ্যে; **সহস্রেষু**—হাজার হাজার; **কশ্চিৎ**—কোন একজন; **যততি**—যত্ন করেন; **সিদ্ধয়ে**—সিদ্ধি লাভের জন্য; **যততাম্**—সেই প্রকার যত্নশীল; **অপি**—বাস্তবিকই; **সিদ্ধানাম্**—সিদ্ধদের; **কশ্চিৎ**—কেউ; **মাম্**—আমাকে; **বেত্তি**—জানতে পারেন; **তত্ত্বতঃ**—স্বরূপত।

গীতার গান

সহস্র মনুষ্য মধ্যে কোন একজন ।
সিদ্ধিলাভ করিবারে করয়ে যতন ॥
যত্নশীল সেই কার্যে কোন একজন ।
সিদ্ধিলাভ করিবারে উপযুক্ত হন ॥
তার মধ্যে কেহ কেহ আমাকে তত্ত্বত ।
বুঝিতে সমর্থ হন বিবেকবশত ॥

অনুবাদ

হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কোন একজন সিদ্ধি লাভের জন্য যত্ন করেন, আর সেই প্রকার যত্নশীল সিদ্ধদের মধ্যে কদাচিৎ একজন আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎ-স্বরূপকে তত্ত্বত অবগত হন।

তাৎপর্য

মানব-সমাজে নানা রকম মানুষ আছে এবং হাজার হাজার মানুষের মধ্যে দুই-একজন কেবল আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ও পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়ার জন্য পরমার্থ সাধনের যথার্থ প্রয়াসী হন। সাধারণ অবস্থায় মানুষ পশুর মতো জীবন যাপন করে, অর্থাৎ তার একমাত্র চিন্তা হচ্ছে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন। কদাচিৎ কেউ দিব্যজ্ঞান লাভের জন্য আগ্রহী হয়। *গীতার* প্রথম ছয় অধ্যায়ের প্রয়োজনীয়তা কেবল সেই সাধকেরই আছে, যাঁরা আত্মজ্ঞান তথা পরমাত্ম জ্ঞান লাভের জন্য জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ ও বিবেক, বুদ্ধি আদি আত্মানুভূতির মার্গ অনুগমন করেন। কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তেরাই কেবল কৃষ্ণকে জানতে পারেন। অন্য অধ্যাত্মবাদীরা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারেন, কারণ তা শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধির চেয়ে সহজ। শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষোত্তম, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা জ্ঞানেরও অতীত। যোগীরা ও জ্ঞানীরা শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যান। যদিও নির্বিশেষবাদীদের অগ্রগণ্য শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য তাঁর গীতার ভাষ্যে স্বীকার করে গেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান, কিন্তু তবুও তাঁর অনুগামীরা কৃষ্ণকে ভগবান বলে মানতে চায় না, কারণ শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা খুবই দুঃসাধ্য, এমন কি নির্বিশেষ ব্রহ্মানুভূতি হওয়ার পরেও কৃষ্ণতত্ত্ব সুদুর্বোধ্য থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, সর্ব কারণের কারণ, আদি পুরুষ গোবিন্দ। *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ / অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্।* অভক্তদের পক্ষে তাঁকে জানা অত্যন্ত কঠিন। যদিও তারা বলে, ভক্তিমার্গ অতি সহজ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তার অনুগমন করতে পারে না। ভক্তিমার্গ যদি এতই সহজ হয়, তা হলে তারা তা পরিত্যাগ করে অত্যন্ত কষ্টসাপেক্ষ নির্বিশেষ পথ গ্রহণ করে কেন? প্রকৃতপক্ষে, ভক্তিমার্গ সহজ নয়। তথাকথিত কোন মনগড়া পন্থায় ভক্তিযোগ অনুশীলন করা সহজ হতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যথার্থ ভক্তিযোগ অনুশীলন করা মনোধর্মী জ্ঞানী ও দার্শনিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই, তারা অচিরেই ভক্তিমার্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (*পূর্ব* ২/১০১) শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ বলেছেন—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা ।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

"*উপনিষদ, পুরাণ, নারদ-পঞ্চরাত্র* আদি প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রবিধির অনুগামী না হয়ে যে ভগবদ্ভক্তি, তা কেবল সমাজে উৎপাতেরই সৃষ্টি করে।"

ব্রহ্মবেত্তা নির্বিশেষবাদী অথবা পরমাত্ম-তত্ত্বজ্ঞ যোগী কখনই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যশোদানন্দন অথবা পার্থসারথি রূপকে জানতে পারে না। এমন কি মহা মহিমাময় দেবতারাও কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন (*মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ*)। *মাং তু বেদ ন কশ্চন*—ভগবান নিজেই বলেছেন, "কেউই আমাকে তত্ত্বত জানতে পারে না।" আর কেউ যদি তাঁকে জেনে থাকে, তবে *স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*—"এমন মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।" এভাবেই ভগবদ্ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করলে, মহাপণ্ডিত অথবা দার্শনিকেরাও শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত জানতে পারে না। কেবলমাত্র শুদ্ধ ভক্তেরাই কেবল শ্রীকৃষ্ণের সর্বকারণ-কারণত্ব, সর্বশক্তি, শ্রী, যশ, সৌন্দর্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্য আদি অচিন্ত্য চিন্ময় গুণসমূহ কিঞ্চিৎরূপে জানেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের প্রতি সর্বদাই অনুগ্রহশীল। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রহ্ম-উপলব্ধির পরাকাষ্ঠা। তাই ভক্তেরাই কেবল তাঁকে তত্ত্বত উপলব্ধি করতে পারেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

"জড় স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কখনই শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারা যায় না। ভক্তের ভক্তিতে প্রসন্ন হলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর কাছে নিজেকে প্রকাশিত করেন।"

(*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব* ২/২৩৪)।

শ্লোক ৪

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

ভূমিঃ—মাটি; **আপঃ**—জল; **অনলঃ**—অগ্নি; **বায়ুঃ**—বায়ু; **খম্**—আকাশ; **মনঃ**—মন; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **এব**—অবশ্যই; **চ**—এবং; **অহঙ্কার**—অহঙ্কার; **ইতি**—এভাবে, **ইয়ম্**—এই সমস্ত; **মে**—আমার; **ভিন্না**—ভিন্ন; **প্রকৃতিঃ**—প্রকৃতি; **অষ্টধা**—অষ্টবিধ।

গীতার গান

ভূমি জল অগ্নি বায়ু বুদ্ধি যে আকাশ ।
আর অহঙ্কার মন বুদ্ধির প্রকাশ ॥
এই সব অষ্ট প্রকারের হয় যে প্রকৃতি ।
ভিন্না সেই আমা হতে বাহির বিভূতি ॥

অনুবাদ

ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আট প্রকারে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি বিভক্ত।

তাৎপর্য

ভগবৎ-বিজ্ঞান ভগবানের স্বরূপ এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে। ভৌতিক শক্তিকে প্রকৃতি বা ভগবানের বিভিন্ন পুরুষাবতারের শক্তি বলা হয়। সেই সম্বন্ধে *সাত্বত-তন্ত্রে* বলা হয়েছে—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্ ।
তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥

"প্রাকৃত সৃষ্টির নিমিত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ তিনজন বিষ্ণুরূপে প্রকট হন। প্রথম মহাবিষ্ণু মহৎ-তত্ত্ব নামে সম্পূর্ণ ভৌতিক শক্তির সৃজন করেন। দ্বিতীয়, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে নানাবিধ সৃষ্টি করবার জন্য তাদের মধ্যে প্রবেশ করেন। তৃতীয়, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু পরমাত্মারূপে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হন। এমন কি, তিনি পরমাণুগুলির মধ্যেও বিরাজ করেন। এই তিন বিষ্ণুতত্ত্ব সম্বন্ধে যিনি অবগত, তিনি জড় বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের যোগ্য।"

এই জড় জগৎ ভগবানের অনন্ত শক্তির একটির সাময়িক প্রকাশ। জড় জগতের প্রতিটি কার্যকলাপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আংশিক প্রকাশ এই তিন বিষ্ণুর পরিচালনায় সাধিত হয়। তাঁদের বলা হয় ভগবানের পুরুষ-অবতার। সাধারণত যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত নয়, তারা মনে করে যে, এই জড় জগৎটি জীবের ভোগের জন্য এবং জীবই হচ্ছে পুরুষ—প্রকৃতির কারণ, নিয়ন্তা ও ভোক্তা। *ভগবদ্গীতা* অনুসারে এই নিরীশ্বরবাদী সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আলোচ্য শ্লোকটিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন জড় সৃষ্টির আদি কারণ। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* এই কথা প্রমাণিত হয়েছে। জড়া সৃষ্টির যে সমস্ত উপাদান তা হচ্ছে ভগবানেরই ভিন্না শক্তি। এমন কি নির্বিশেষবাদীদের পরম লক্ষ্য ব্রহ্মজ্যোতিও হচ্ছে পরব্যোমে অভিব্যক্ত ভগবানেরই একটি চিন্ময় শক্তি। বৈকুণ্ঠলোকের মতো ব্রহ্মজ্যোতিতে চিন্ময় বৈচিত্র্য নেই এবং নির্বিশেষবাদীরা এই ব্রহ্মজ্যোতিকেই তাদের পরম লক্ষ্য বলে মনে করে। পরমাত্মার প্রকাশও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর অস্থায়ী সর্বব্যাপক রূপ। চিন্ময় জগতে পরমাত্মা রূপের

অভিব্যক্তি নিত্য শাশ্বত নয়। সুতরাং, যথার্থ পরমতত্ত্ব হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই পূর্ণ শক্তিমান পুরুষ এবং তিনি বিভিন্ন অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তি সমন্বিত।

পূর্বের উল্লেখ অনুসারে জড়া প্রকৃতি প্রধান আটটিরূপে অভিব্যক্ত হয়। সেগুলির মধ্যে প্রথম পাঁচটি—মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশকে বলা হয় পঞ্চমহাভূত বা স্থূল সৃষ্টি। তাদের মধ্যে নিহিত আছে পাঁচটি ইন্দ্রিয়-বিষয়—ভৌত জগতের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। জড় বিজ্ঞানে এই দশটি তত্ত্বই আছে, আর কিছুই নেই। কিন্তু অন্য তিনটি তত্ত্ব—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সম্পর্কে জড়বাদীরা কোন গুরুত্ব দেয় না। সব কিছুর পরম উৎস শ্রীকৃষ্ণকে না জানার ফলে মনোধর্মী দার্শনিকেরা কখনই পূর্ণজ্ঞানী হতে পারে না। 'আমি' ও 'আমার' —এই মিথ্যা অহঙ্কারই জড় অস্তিত্বের মূল কারণ এবং এর মধ্যে বিষয় ভোগের জন্য দশটি ইন্দ্রিয়ের সমাবেশ হয়। বুদ্ধি বলতে মহৎ-তত্ত্ব নামক সমগ্র প্রাকৃত সৃষ্টিকে বোঝায়। এভাবেই ভগবানের ভিন্না আটটি শক্তি থেকে জড় জগতের চব্বিশটি তত্ত্বের প্রকাশ হয়, যা নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শনের বিষয়বস্তু। এই ভিন্ন তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি থেকে উৎপন্ন হয়। কিন্তু অল্পজ্ঞ নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য দার্শনিকেরা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব কারণের পরম কারণ বলে জানতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তিই সাংখ্য-দর্শনের বিষয়বস্তু, যা *ভগবদ্গীতাতেই* বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৫

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

অপরা—নিকৃষ্টা; **ইয়ম্**—এই; **ইতঃ**—ইহা ব্যতীত; **তু**—কিন্তু; **অন্যাম্**—আর একটি; **প্রকৃতিম্**—প্রকৃতি; **বিদ্ধি**—অবগত হও; **মে**—আমার; **পরাম্**—উৎকৃষ্টা; **জীবভূতাম্**—জীবস্বরূপা; **মহাবাহো**—হে মহাবীর; **যয়া**—যার দ্বারা; **ইদম্**—এই; **ধার্যতে**—ধারণ করে আছে; **জগৎ**—জড় জগৎ।

গীতার গান

অনুৎকৃষ্টা তারা সহ উৎকৃষ্টা তা হতে ।
প্রকৃতি আর এক যে আছয়ে আমাতে ॥

জীবভূতা সে প্রকৃতি শুন মহাবাহো ।
জীব দ্বারা ধার্য জড়া জান অহরহ ॥

অনুবাদ

হে মহাবাহো! এই নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্য-স্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জড় জগৎকে ধারণ করে আছে।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জীব ভগবানের পরা প্রকৃতি বা উৎকৃষ্টা শক্তির অন্তর্গত। ভগবানের অনুৎকৃষ্টা শক্তিই হচ্ছে জড় জগৎ, যা ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার নামক উপাদানগুলির দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। জড় জগতে স্থূল পদার্থ—ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ এবং সূক্ষ্ম পদার্থ—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই সবগুলিই ভগবানের অনুৎকৃষ্টা শক্তি থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই অনুৎকৃষ্টা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তার অভীষ্ট সিদ্ধির চেষ্টা করছে যে জীব, সে হচ্ছে ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি এবং এই শক্তির প্রভাবেই সমস্ত জড় জগৎ সক্রিয় হয়ে আছে। ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি জীবের দ্বারা সক্রিয় না হলে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোন কর্মই সাধিত হয় না। শক্তি সব সময়ই শক্তিমানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই, জীব সর্বদাই ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—তাদের স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। কিছু নির্বোধ লোক মনে করে যে, জীব ভগবানের মতোই শক্তিশালী। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে, জীব কখনই ভগবানের সমকক্ষ হতে পারে না। জীব ও ভগবানের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/৮৭/৩০) বলা হয়েছে—

অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা ।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥

"হে শাশ্বত পরমেশ্বর! দেহধারী জীব যদি তোমার মতোই শাশ্বত ও সর্বব্যাপক হত, তা হলে তারা কখনই তোমার নিয়ন্ত্রণাধীন হত না। কিন্তু তারা যদি তোমার অনন্ত শক্তির অণুসদৃশ অংশ হয়, তা হলে তারা সর্বতোভাবে তোমার পরম

নিয়ন্ত্রণের অধীন। তাই, তোমার শরণাগত হওয়াই হচ্ছে জীবের প্রকৃত মুক্তি এবং এই শরণাগতি জীবকে প্রকৃত আনন্দ দান করে। সেই স্বরূপে অবস্থান করলে তবেই তারা নিয়ন্তা হতে পারে। সুতরাং, যে সমস্ত মূর্খ মানুষ অদ্বৈতবাদের প্রচার করে বলে যে, ভগবান ও জীব সর্বতোভাবে সমান, তারা প্রকৃতপক্ষে ভ্রান্ত ও কলুষিত চিন্তাধারা নিয়ে বিপথে পরিচালিত হচ্ছে এবং অন্যদেরও বিপথে পরিচালিত করছে।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন প্রকৃত নিয়ন্তা এবং সমস্ত জীবেরা তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। এই সব জীবেরা ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি, কারণ গুণগতভাবে তার অস্তিত্ব ভগবানের সঙ্গে এক, কিন্তু ক্ষমতার বিচারে তারা কখনই ভগবানের সমকক্ষ নয়। ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি জীব যখন সূক্ষ্ম ও স্থূল অনুৎকৃষ্টা শক্তিকে ভোগ করে, তখন সে তার প্রকৃত চিন্ময় মন ও বুদ্ধিকে ভুলে যায়। জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ার ফলে জীবের এই বিস্মরণ ঘটে। কিন্তু জীব যখন মায়ার মোহময় জড়া শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়, তখন সে মুক্তি লাভের পর্যায়ে উপনীত হয়। জড়া শক্তির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে অহঙ্কারের প্রভাবে জীব মনে করে যে, সে তার দেহ এবং এই দেহকে কেন্দ্র করে যা কিছু, তা সবই তার। যখনই সে তার অজ্ঞতা-জনিত জড়া শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়, তখনই সে তার স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হয়। আবার ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার যে দুরভিসন্ধি, সেটিও একটি মস্ত বড় বন্ধন। প্রকৃতপক্ষে, এটিই হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম বন্ধন। তাই, জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হলে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার দুরভিসন্ধি ত্যাগ করতে হয়। এখানে *গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, জীব হচ্ছে তাঁর অনন্ত শক্তির একটি শক্তিমাত্র; এই শক্তি যখন জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণভাবে কৃষ্ণচেতনা লাভ করে, তখন সে তার স্বরূপ উপলব্ধি করে মুক্তি লাভ করতে পারে।

শ্লোক ৬

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয় ।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

এতৎ—এই দুটি প্রকৃতি থেকে; **যোনীনি**—উৎপন্ন হয়েছে; **ভূতানি**—জড় ও চেতন সব কিছু; **সর্বাণি**—সমস্ত; **ইতি**—এভাবে; **উপধারয়**—জ্ঞাত হও; **অহম্**—আমি;

কৃৎস্নস্য—সমগ্র; জগতঃ—জগতের; প্রভবঃ—উৎপত্তির কারণ; প্রলয়ঃ—প্রলয়; তথা—এবং।

গীতার গান

এই দুই প্রকৃতি সে নাম পরাপরা।
সর্বভূত যোনি তারা জান পরম্পরা ॥
যেহেতু প্রকৃতি দুই আমা হতে হয়।
জগতের উৎপত্তি লয় আমি সে নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

আমার এই উভয় প্রকৃতি থেকে জড় ও চেতন সব কিছু উৎপন্ন হয়েছে। অতএব নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো যে, আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল কারণ।

তাৎপর্য

বিশ্বচরাচরে যা কিছু বর্তমান তা সবই জড় ও চেতন থেকে উৎপন্ন। চেতন হচ্ছে সৃষ্টির আধার এবং জড় বস্তু এই চেতনতত্ত্ব দ্বারা রচিত। এমন নয় যে, জড়ের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় কোন এক পর্যায়ে চেতনার সৃষ্টি হয়েছে। পক্ষান্তরে, এই চিন্ময় শক্তি থেকেই জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের এই জড় দেহটিতে চিৎ-শক্তি বা আত্মা আছে বলেই এই দেহটির বৃদ্ধি হয়, বিকাশ হয়; একটি শিশু ধীরে ধীরে বালকে পরিণত হয়, তারপরে সে যুবকে পরিণত হয়, কারণ ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি আত্মা সেই দেহতে রয়েছে। ঠিক তেমনই, এই বিরাট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডেরও বিকাশ হয় পরমাত্মা বিষ্ণুর অবস্থিতির ফলে। তাই চেতন ও জড়, যাদের সমন্বয়ের ফলে এই বিরাট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হয়, তারা হচ্ছে মূলত ভগবানেরই দুটি শক্তি। সুতরাং, ভগবানই হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির মূল কারণ। ভগবানের অণুসদৃশ অংশ জীব একটি গগনচুম্বী অট্টালিকা, একটি বৃহৎ কারখানা অথবা একটি বড় শহর গড়ে তুলতে পারে, কিন্তু সে কখনও একটি বিশাল ব্রহ্মাণ্ড গড়তে পারে না। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের পরম কারণ হচ্ছেন বৃহৎ আত্মা বা পরমাত্মা। আর পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র উভয় আত্মার কারণ। তাই, তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের মূল কারণ। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *কঠ উপনিষদে* (২/২/১৩) বলা হয়েছে—*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*।

শ্লোক ৭

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

মত্তঃ—আমার থেকে; পরতরম্—শ্রেষ্ঠ; ন—না; অন্যৎ—অন্য; কিঞ্চিৎ—কিছু; অস্তি—আছে; ধনঞ্জয়—হে ধনঞ্জয়; ময়ি—আমাতে; সর্বম্—সব কিছু; ইদম্—এই; প্রোতম্—গাঁথা; সূত্রে—সূত্রে; মণিগণাঃ—মণিসমূহের; ইব—মতন।

গীতার গান

আমাপেক্ষা পরতত্ত্ব শুন ধনঞ্জয়।
পরাৎপর যে তত্ত্ব অন্য কেহ নয় ॥
আমাতেই সমস্ত জগৎ আছে প্রতিষ্ঠিত।
সূত্রে যেন গাঁথা থাকে মণিগণ যত ॥

অনুবাদ

হে ধনঞ্জয়! আমার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। সূত্রে যেমন মণিসমূহ গাঁথা থাকে, তেমনই সমস্ত বিশ্বই আমাতে ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থান করে।

তাৎপর্য

পরমতত্ত্ব সবিশেষ না নির্বিশেষ এই সম্বন্ধে বহু আলোচিত মতবিভেদ আছে। *ভগবদ্গীতাতে* বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব এবং প্রতি পদক্ষেপেই আমরা সেই সত্যের প্রমাণ পাই। বিশেষ করে এই শ্লোকটিতে পরমতত্ত্ব যে সবিশেষ পুরুষ, তা জোর দিয়ে বলা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষত্ব সম্বন্ধে *ব্রহ্মসংহিতাতেও* বলা হয়েছে—*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ*। অর্থাৎ, পরমতত্ত্ব পরম পুরুষ ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের উৎস, তিনিই হচ্ছেন আদিপুরুষ গোবিন্দ এবং তাঁর শ্রীবিগ্রহ হচ্ছেন সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। ব্রহ্মার মতো মহাজনদের কাছ থেকে যখন আমরা নিঃসন্দেহে জানতে পারি যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন পরম পুরুষ এবং তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ, তখন আর তাঁর সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। নির্বিশেষবাদীরা অবশ্য বৈদিক ভাষ্য মতে *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের* (৩/১০) এই শ্লোকটির উল্লেখ করে তর্ক করে—*ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্ / য*

এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপিযন্তি। "এই জড় জগতে ব্রহ্মা হচ্ছেন প্রথম জীব। সুর, অসুর ও মানুষের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ব্রহ্মারও ঊর্ধ্বে এক অপ্রাকৃত তত্ত্ব বর্তমান, যাঁর কোন জড় আকৃতি নেই এবং যিনি সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত। তাঁকে যে জানতে পারেন, তিনি এই জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশ করতে পারেন। আর যারা তাঁকে জানতে পারে না, তারা এই জড় জগতে নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করে।"

নির্বিশেষবাদীরা এই শ্লোকের *অরূপম্* শব্দটির উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু এই অরূপম্ শব্দটির অর্থ নির্বিশেষ নয়। এর দ্বারা ভগবানের সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত রূপকে নির্দেশ করা হয়েছে, যা *ব্রহ্মসংহিতার* উপরে উদ্ধৃত অংশে ব্যক্ত হয়েছে। *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের* অন্যান্য শ্লোকেও (৩/৮-৯) সেই কথার সত্যতা প্রমাণ করে বলা হয়েছে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্ যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্ ॥

"আমি সেই পরমেশ্বরকে জানি, যিনি সর্বতোভাবে সংসারের সকল অজ্ঞানতার অন্ধকারের অতীত। যিনি তাঁকে জানেন, তিনিই কেবল জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে পারেন। এই পরম পুরুষের জ্ঞান ব্যতীত আর কোন উপায়েই মুক্তি লাভ করা যায় না।

"এই পরম পুরুষের অতীত আর কোন সত্য নেই, কেন না তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ক্ষুদ্রতম থেকে ক্ষুদ্রতর এবং তিনি মহত্তম থেকেও মহত্তর। একটি গাছের মতো মৌনভাবে অধিষ্ঠিত রয়েছেন এবং তিনি সমস্ত পরব্যোমকে আলোকে উদ্ভাসিত করে রেখেছেন। একটি গাছ যেমন তার শিকড় বিস্তার করে, তিনিও তেমনই তাঁর বিভিন্ন শক্তিকে বিস্তৃত করেছেন।"

এই সমস্ত শ্লোক থেকে আমরা অনায়াসে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, যিনি তাঁর জড় ও চিন্ময় অনন্ত শক্তির প্রভাবে সর্বব্যাপ্ত।

শ্লোক ৮

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্যয়োঃ ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥

রসঃ—স্বাদ; **অহম্**—আমি; **অপ্সু**—জলে; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **প্রভা**—জ্যোতি; **অস্মি**—আমি হই; **শশিসূর্যয়োঃ**—চন্দ্র ও সূর্যের; **প্রণবঃ**—ওঙ্কার; **সর্ব**—সমগ্র; **বেদেষু**—বেদে; **শব্দঃ**—শব্দ; **খে**—আকাশে; **পৌরুষম্**—ক্ষমতা; **নৃষু**—মানুষে।

গীতার গান

জলের যে সরসতা আমি সে কৌন্তেয় ।
চন্দ্রসূর্য প্রভা যেই আমা হতে জ্ঞেয় ॥
সর্ববেদে যে প্রণব হয় মুখ্যতত্ত্ব ।
আকাশের শব্দ সেই আমি হই সত্য ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! আমিই জলের রস, চন্দ্র ও সূর্যের প্রভা, সর্ব বেদের প্রণব, আকাশের শব্দ এবং মানুষের পৌরুষ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে ভগবান তাঁর বিভিন্ন জড়া শক্তি ও চিৎ-শক্তির দ্বারা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। ভগবান সম্বন্ধে জানতে সচেষ্ট হলে প্রথমে তাঁর বিভিন্ন শক্তির প্রকাশের মাধ্যমে তাঁকে অনুভব করা যায়। তবে এই স্তরের যে ভগবৎ-উপলব্ধি তা নির্বিশেষ। যেমন সূর্যদেব হচ্ছেন একজন পুরুষ এবং তাঁকে উপলব্ধি করা যায় তাঁর সর্বব্যাপক শক্তি তাঁর কিরণের মাধ্যমে। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান যদিও তাঁর নিত্য ধামে বিরাজমান, তবুও তাঁর সর্বব্যাপক শক্তির প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। জলের স্বাভাবিক স্বাদ হচ্ছে জলের একটি সক্রিয় ধর্ম। আমরা কেউ সমুদ্রের জল পান করতে চাই না, তার কারণ সেখানে বিশুদ্ধ জলের সাথে লবণ মেশানো রয়েছে। আস্বাদনের শুদ্ধতার জন্যই জলের প্রতি আমাদের আকর্ষণ এবং এই শুদ্ধ আস্বাদন ভগবানেরই অনন্ত শক্তির একটি অভিপ্রকাশ। নির্বিশেষবাদীরা জলের স্বাদের মধ্যে ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করে এবং সবিশেষবাদীরাও ভগবান যে করুণা করে মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলের সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য তাঁর গুণকীর্তন করেন। এভাবেই পরম পুরুষের উপলব্ধি হয়। প্রকৃতপক্ষে নির্বিশেষবাদ আর সবিশেষবাদের মধ্যে কোন বিবাদ নেই। যিনি বাস্তবিক ভগবানকে জেনেছেন, তিনি জানেন যে, নির্বিশেষ ও সবিশেষ উভয় রূপেই তিনি সব কিছুর মধ্যে বিরাজ করছেন এবং এতে কোন বিরোধ নেই।

তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মহা মহিমান্বিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব অর্থাৎ একই সাথে একত্ব ও পৃথকত্ব প্রতিষ্ঠিত করে আমাদের পূর্ণ ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান দান করেছেন।

সূর্য ও চন্দ্রের রশ্মিচ্ছটাও মূলত ভগবানের দেহনির্গত নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি থেকে প্রকাশিত হয়। তেমনই বৈদিক মন্ত্রের প্রারম্ভে ভগবানকে সম্বোধনসূচক অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম *প্রণব* বা 'ওঁকার' মন্ত্রও ভগবানের থেকে প্রকাশিত হয়েছে। যেহেতু নির্বিশেষবাদীরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর অসংখ্য নামের দ্বারা সম্বোধন করতে খুবই ভয় পায়, তাই তারা অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম ওঁকারের মাধ্যমে তাঁকে সম্বোধন করে। কিন্তু তারা বোঝে না যে, ওঁকার হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই শব্দ প্রকাশ। কৃষ্ণভাবনার পরিধি সর্বব্যাপ্ত, তাই কৃষ্ণচেতনার উপলব্ধি যিনি লাভ করেছেন, তাঁর জীবন সার্থক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যারা জানে না, তারা মায়াবদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অবগত হওয়াই হচ্ছে মুক্তি, আর তাঁর সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকাই হচ্ছে বন্ধন।

শ্লোক ৯

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাং চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥

পুণ্যঃ—পবিত্র; **গন্ধঃ**—গন্ধ; **পৃথিব্যাম্**—পৃথিবীর; **চ**—ও; **তেজঃ**—তেজ; **চ**—ও; **অস্মি**—আমি হই; **বিভাবসৌ**—অগ্নির; **জীবনম্**—আয়ু; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূতেষু**—প্রাণীর; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **চ**—ও; **অস্মি**—হই; **তপস্বিষু**—তপস্বীদের।

গীতার গান

পৃথিবীর পুণ্য গন্ধ সূর্যের প্রভাব ।
জীবন সর্বভূতের তপস্বীর তপ ॥

অনুবাদ

আমি পৃথিবীর পবিত্র গন্ধ, অগ্নির তেজ, সর্বভূতের জীবন এবং তপস্বীদের তপ।

তাৎপর্য

পুণ্য শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যার বিকার হয় না; পুণ্য হচ্ছে মৌলিক। এই জড় জগতে সব কিছুরই একটি বিশিষ্ট সৌরভ বা গন্ধ আছে। যেমন ফুলের গন্ধ, মাটির গন্ধ, আগুনের গন্ধ, জলের গন্ধ, বাতাসের গন্ধ আদি। তবে, পবিত্র নিষ্কলুষ, আদি অকৃত্রিম যে সুবাস সব কিছুর মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে, তা হচ্ছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তেমনই, সব কিছুরই বিশেষ একটি স্বাদ আছে, তবে রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণে এই স্বাদের পরিবর্তন করা যায়। তাই প্রতিটি বস্তুর নিজস্ব ঘ্রাণ, সুবাস ও স্বাদ আছে। *বিভাবসু* মানে অগ্নি। এই অগ্নি ছাড়া কলকারখানা চলে না, রান্না করা যায় না, অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোন কাজই করা যায় না। সেই আগুন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, সেই আগুনের তাপই হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বলা হয় যে, আমাদের উদরস্থ নিম্নতাপের ফলেই অজীর্ণতা হয়। সুতরাং, খাদ্য হজম করবার জন্যও আমাদের আগুনের প্রয়োজন। কৃষ্ণভাবনার প্রভাবে আমরা জানতে পারি যে, মাটি, জল, বায়ু, অগ্নি আদি সব রকমের সক্রিয় উপাদান এবং সব রকমের রাসায়নিক ও ভৌতিক পদার্থ শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। মানুষের আয়ুও নির্ভর করে শ্রীকৃষ্ণের উপরে। তাই, শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ফলে মানুষের আয়ু দীর্ঘ অথবা সীমিত হয়। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, কৃষ্ণভাবনা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সক্রিয় রয়েছে।

শ্লোক ১০

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

বীজম্—বীজ; **মাম্**—আমাকে; **সর্বভূতানাম্**—সর্বভূতের; **বিদ্ধি**—জানবে; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **সনাতনম্**—নিত্য; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **বুদ্ধিমতাম্**—বুদ্ধিমানদের; **অস্মি**—হই; **তেজঃ**—তেজ; **তেজস্বিনাম্**—তেজস্বীগণের; **অহম্**—আমি।

গীতার গান

উৎপত্তির বীজরূপ সবার সে আমি ।
সনাতন তত্ত্ব পার্থ সকলের স্বামী ॥
বুদ্ধিমান যেবা হয় তার বুদ্ধি আমি ।
তেজস্বীর তেজ হয় যাহা অন্তর্যামী ॥

অনুবাদ

হে পার্থ, আমাকে সর্বভূতের সনাতন কারণ বলে জানবে। আমি বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এবং তেজস্বীদের তেজ।

তাৎপর্য

বীজ থেকে সব কিছু উৎপত্তি হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর বীজ। সচল ও অচল নানা রকমের জীব আছে। পশু, পাখি, মানুষ এই ধরনের জীবেরা জঙ্গম অর্থাৎ সচল। গাছপালা আদি হচ্ছে স্থাবর অর্থাৎ অচল, কেবল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন জীবের মধ্যে কেউ স্থাবর, কেউ আবার জঙ্গম। কিন্তু তাদের সকলেরই বীজ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্ব হচ্ছেন তিনিই, যাঁর থেকে সব কিছু উদ্ভূত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমব্রহ্ম বা পরম আত্মা। ব্রহ্ম হচ্ছে নির্বিশেষ, কিন্তু পরমব্রহ্ম হচ্ছেন সবিশেষ। নির্বিশেষ ব্রহ্ম যে সবিশেষ রূপের মধ্যেই অবস্থিত, তা *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে। তাই, মূলত শ্রীকৃষ্ণই সব কিছুর উৎস। তিনিই সব কিছুর মূল। একটি গাছের মূল যেমন সমস্ত গাছটিকে প্রতিপালন করে, শ্রীকৃষ্ণও তেমন সব কিছুর আদি মূলরূপে সমস্ত জড়-জাগতিক অভিপ্রকাশের প্রতিপালন করেন। বৈদিক শাস্ত্রে (*কঠ উপনিষদ* ২/২/১৩) সেই কথা প্রমাণিত হয়েছে—

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্ ।

যা কিছু নিত্য, তার মধ্যে তিনিই হচ্ছেন পরম নিত্য। যা কিছু চেতন, তার মধ্যে তিনিই হচ্ছেন পরম চেতন। তিনি একাই সব কিছুর প্রতিপালন করেন। বুদ্ধি ছাড়া কেউ কোন কিছু করতে পারে না এবং শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনিই সমস্ত বুদ্ধির উৎস। মানুষের বুদ্ধির বিকাশ না হলে সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না।

শ্লোক ১১

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্ ।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

বলম্—বল; **বলবতাম্**—বলবানের; **চ**—এবং; **অহম্**—আমি; **কাম**—কাম; **রাগ**—আসক্তি; **বিবর্জিতম্**—বিহীন; **ধর্মাবিরুদ্ধঃ**—ধর্মের অবিরোধী; **ভূতেষু**—সমস্ত জীবের মধ্যে; **কামঃ**—কাম; **অস্মি**—হই; **ভরতর্ষভ**—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

বলবান যত আছে তার বল আমি ।
কামরাগ বিবর্জিত যত অগ্রগামী ॥
ধর্ম অবিরুদ্ধ কাম হে ভরতর্ষভ ।
সে সব বুঝহ তুমি আমার বৈভব ॥

অনুবাদ

হে ভরতর্ষভ! আমি বলবানের কাম ও রাগ বিবর্জিত বল এবং ধর্মের অবিরোধী কামরূপে আমি প্রাণীগণের মধ্যে বিরাজমান।

তাৎপর্য

যে বলবান তার কর্তব্য হচ্ছে দুর্বলকে রক্ষা করা। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য যখন অপরকে আক্রমণ করা হয়, লুণ্ঠন করা হয়, তখন সেটি বলের অপচয় করা হয়। তেমনই, কাম বা যৌন জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মপরায়ণ সন্তান উৎপাদন করা। তা না করে যদি ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য যৌন জীবন যাপন করা হয়, তা অন্যায়। প্রতিটি পিতা-মাতার পরম কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের সন্তানদের কৃষ্ণভাবনাময় করে গড়ে তোলা।

শ্লোক ১২

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে ।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

যে—যে সকল; **চ**—এবং; **এব**—অবশ্যই; **সাত্ত্বিকাঃ**—সাত্ত্বিক; **ভাবাঃ**—ভাবসমূহ; **রাজসাঃ**—রাজসিক; **তামসাঃ**—তামসিক; **চ**—ও; **যে**—যে সমস্ত; **মত্তঃ**—আমার থেকে; **এব**—অবশ্যই; **ইতি**—এভাবে; **তান্**—সেগুলি; **বিদ্ধি**—জানবার চেষ্টা কর; **ন**—নাই; **তু**—কিন্তু; **অহম্**—আমি; **তেষু**—তাদের মধ্যে; **তে**—তারা; **ময়ি**—আমাতে।

গীতার গান

যে সব সাত্ত্বিক ভাব রজস তমস ।
আমা হতে হয় সব আমি নহি বশ ॥

অনুবাদ

সমস্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবসমূহ আমার থেকেই উৎপন্ন বলে জানবে। আমি সেই সকলের অধীন নই, কিন্তু তারা আমার শক্তির অধীন।

তাৎপর্য

এই জড় জগতে সব কিছুই প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাবে সাধিত হয়। জড়া প্রকৃতির এই ত্রিগুণ যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তবুও তিনি কখনই এই গুণত্রয়ের দ্বারা প্রভাবিত হন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রাজা যেমন আইন সৃষ্টি করে দোষীদের দণ্ড দেন, কিন্তু তিনি নিজে সেই আইনের অতীত। তেমনই জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণ—সত্ত্ব, রজ ও তম পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কখনও এই সমস্ত গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাই তিনি নির্গুণ, অর্থাৎ এই গুণগুলি যদিও তাঁর থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তবুও তিনি এই সমস্ত গুণের অতীত। এটিই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

শ্লোক ১৩

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

ত্রিভিঃ—তিন; **গুণময়ৈঃ**—গুণের দ্বারা; **ভাবৈঃ**—ভাবের দ্বারা; **এভিঃ**—এই; **সর্বম্**—সমগ্র; **ইদম্**—এই; **জগৎ**—জগৎ; **মোহিতম্**—মোহিত; **ন অভিজানাতি**—জানতে পারে না; **মাম্**—আমাকে; **এভ্যঃ**—এই সকলের অতীত; **পরম্**—পরম; **অব্যয়ম্**—অব্যয়।

গীতার গান

এই তিনগুণ দ্বারা মোহিত জগত ।
না বুঝিতে পারে মোরে পরম শাশ্বত ॥

অনুবাদ

(সত্ত্ব, রজ, ও তম) তিনটি গুণের দ্বারা মোহিত হওয়ার ফলে সমগ্র জগৎ এই সমস্ত গুণের অতীত ও অব্যয় আমাকে জানতে পারে না।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির এই তিনটি গুণের দ্বারা সমগ্র জগৎ বিমোহিত হয়ে আছে। জড়া প্রকৃতি বা মায়ার প্রভাবে যারা বিমোহিত, তারা বুঝতে পারে না যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন এই জড়া প্রকৃতির অতীত।

প্রকৃতির প্রভাবে জড় জগতে প্রতিটি জীব ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন মানসিক ও দৈহিক গুণাবলীতে ভূষিত হয়। এই গুণের প্রভাবে মানুষেরা চারটি বর্ণে বিভক্ত হয়। যাঁরা সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁদের বলা হয় ব্রাহ্মণ। যাঁরা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাঁদের বলা হয় ক্ষত্রিয়। যারা রজ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাদের বলা হয় বৈশ্য। যারা সম্পূর্ণ তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাদের বলা হয় শূদ্র। আর তার থেকেও যারা হেয়, তারা হচ্ছে পশু। তবে, এই বর্ণবিভাগ নিত্য নয়। আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কিংবা শূদ্র অথবা যা-ই হই না কেন, যে কোন অবস্থাতেই এই জীবনটি অনিত্য। কিন্তু যদিও জীবন অনিত্য এবং আমরা জানি না পরবর্তী জীবনে কি দেহ আমরা লাভ করব, তবুও মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে আমরা আমাদের দেহটিকেই আমাদের স্বরূপ বলে মনে করি এবং ভাবতে শুরু করি যে, আমরা আমেরিকান, রাশিয়ান, ভারতীয়, কিংবা ব্রাহ্মণ, হিন্দু, মুসলমান আদি। এভাবেই যখন আমরা জড় গুণের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ি, তখন সমস্ত গুণের অন্তরালে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আছেন, তা আমরা ভুলে যাই। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা বিমোহিত হয়ে মানুষ বুঝতে পারে না যে, এই সমস্ত বিশ্ব-চরাচরের উৎস হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং।

পশু, পক্ষী, মানুষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, দেব-দেবী আদি প্রতিটি বিভিন্ন জীবই জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত এবং এরা সকলেই অপ্রাকৃত পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে গেছে। যারা রজ ও তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত, এমন কি যারা সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন, তারাও পরম-তত্ত্বের নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপলব্ধির ঊর্ধ্বে যেতে পারে না। শ্রীভগবান, যিনি পরম পুরুষ, যাঁর মধ্যে পরিপূর্ণ শ্রী, ঐশ্বর্য, জ্ঞান, বীর্য, যশ ও বৈরাগ্য বিদ্যমান, সেই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ সবিশেষ ভগবানের সামনে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং, যারা সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত রয়েছে, তারাও যখন এই তত্ত্বকে বুঝতে পারে না, তখন রজ ও তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত জীবের সম্বন্ধে আর কি আশা করা যেতে পারে? কৃষ্ণভাবনামৃত বা কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে জড়া প্রকৃতির এই তিন গুণের অতীত। আর যাঁরা সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হয়ে আছেন, তাঁরাই হচ্ছেন প্রকৃত মুক্ত।

শ্লোক ১৪

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥

দৈবী—অলৌকিকী; **হি**—নিশ্চয়; **এষা**—এই; **গুণময়ী**—ত্রিগুণময়ী; **মম**—আমার; **মায়া**—শক্তি; **দুরত্যয়া**—দুরতিক্রমণীয়া; **মাম্**—আমাকে; **এব**—অবশ্যই; **যে**—যাঁরা; **প্রপদ্যন্তে**—শরণাগত হন; **মায়াম্ এতাম্**—এই মায়াশক্তিকে; **তরন্তি**—উত্তীর্ণ হন; **তে**—তাঁরা।

গীতার গান

অতএব গুণময়ী আমার যে মায়া ।
বহিরঙ্গা শক্তি সেই অতি দুরত্যয়া ॥
সে মায়ার হাত হতে যদি মুক্তি চায় ।
আমার চরণে সেই প্রপত্তি করয় ॥

অনুবাদ

আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যাঁরা আমাতে প্রপত্তি করেন, তাঁরাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত দিব্য শক্তির অধীশ্বর এবং সেই শক্তিরাজি দিব্যগুণ-সম্পন্ন। যদিও, জীব তাঁর সেই শক্তিসম্ভূত এবং তাই দিব্য, কিন্তু জড়া শক্তির সংস্পর্শে আসার ফলে তাদের সেই প্রকৃত দিব্য স্বরূপ আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে। এভাবেই জড়া শক্তির প্রভাবে আচ্ছাদিত হওয়ার ফলে জীব তার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে চিন্ময় পরা শক্তি ও জড় অপরা শক্তি উভয়ই নিত্য। জীব ভগবানের নিত্য পরা শক্তির অংশ, কিন্তু অপরা প্রকৃতি বা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ার ফলে তার মোহও নিত্য। তাই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ জীবকে বলা হয় নিত্যবদ্ধ। জড় জগতের সময়ের হিসাবে কেউই বলতে পারে না, জীব কবে বদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। তাই এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। জড়া প্রকৃতি যদিও ভগবানের অনুৎকৃষ্টা শক্তি, তবুও পরমেশ্বর ভগবানের

পরম ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে ভগবানের উৎকৃষ্টা শক্তি জীব তাকে অতিক্রম করতে পারে না বা তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। অনুৎকৃষ্টা জড়া শক্তি বা মায়াকে ভগবান এখানে দৈবী বলে অভিহিত করেছেন, কেন না তা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত। ভগবানের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে এই অপরা প্রকৃতি নিকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অদ্ভুতভাবে সৃষ্টি এবং বিনাশের কাজ করে চলেছে। এই সম্বন্ধে *বেদে* বলা হয়েছে—*মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্* । "মায়া যদিও মিথ্যা অথবা অনিত্য, তবুও মায়ার অন্তরালে রয়েছেন পরম যাদুকর পরম পুরুষ ভগবান, যিনি হচ্ছেন মহেশ্বর, পরম নিয়ন্তা।" (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৪/১০)

গুণ শব্দের আর একটি অর্থ হচ্ছে রজ্জু। এর থেকে বোঝা যায় যে, মায়া এ সমস্ত রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ জীবকে দৃঢ়ভাবে বেঁধে রেখেছে। যে মানুষের হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা, সে নিজে মুক্ত হতে পারে না। মুক্ত হতে হলে তাকে এমন কারও সাহায্য নিতে হয়, যিনি নিজে মুক্ত। কারণ, যে নিজেই বদ্ধ, সে কাউকে মুক্ত করতে পারে না; অর্থাৎ মুক্ত পুরুষেরাই কেবল অপরকে মুক্ত করতে পারেন। তাই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবই কেবল বদ্ধ জীবকে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন। এই ধরনের পরম সাহায্য ব্যতীত জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণভাবনা এই মুক্তির পরম সহায়ক হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মায়াশক্তির অধীশ্বর। তাই, তিনি যখন এই অলঙ্ঘনীয় মায়াকে আদেশ দেন কাউকে মুক্ত করে দিতে, মায়া তৎক্ষণাৎ তাঁর সেই আদেশ পালন করেন। জীব হচ্ছে ভগবানের সন্তান, তাই জীব যখন ভগবানের শরণাগত হয়, তখন ভগবান তাঁর অহৈতুকী করুণাবশে পিতৃবৎ স্নেহে তাকে মুক্ত করতে মনস্থ করেন এবং তিনি তখন মায়াকে আদেশ দেন তাকে মুক্ত করে দিতে। তাই, ভগবানের চরণ-কমলের শরণাগত হওয়াটাই হচ্ছে কঠোর জড়া প্রকৃতির কবল থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায়।

মাম্ এব কথাগুলিও তাৎপর্যপূর্ণ। *মাম্* মানে শ্রীকৃষ্ণকে বা বিষ্ণুকেই বোঝায়—ব্রহ্মা কিংবা শিব নয়। যদিও ব্রহ্মা এবং শিব অসীম শক্তিসম্পন্ন এবং তারা প্রায় বিষ্ণুর সমকক্ষ, কিন্তু ভগবানের এই রজোগুণ ও তমোগুণের গুণাবতারেরা কখনই জীবকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে না। পক্ষান্তরে বলা যায়, ব্রহ্মা এবং শিবও মায়ার দ্বারা প্রভাবিত। বিষ্ণুই কেবল মায়াধীশ। তাই, তিনিই কেবল বদ্ধ জীবকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন। এই সম্বন্ধে *বেদে* (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৩/৮) প্রতিপন্ন করা হয়েছে, *তমেব বিদিত্বা*, অর্থাৎ

"শ্রীকৃষ্ণকে জানার মাধ্যমেই কেবল জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।" স্বয়ং মহাদেব স্বীকার করেন যে, বিষ্ণুর কৃপার ফলেই কেবল মুক্তি লাভ করা যায়। তিনি বলেছেন, *মুক্তিপ্রদাতা সর্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ*—"ভগবান শ্রীবিষ্ণুই যে সকলের মুক্তিদাতা, সেই সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই।"

শ্লোক ১৫

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

ন—না; **মাম্**—আমাকে; **দুষ্কৃতিনঃ**—দুষ্কৃতকারী; **মূঢ়াঃ**—মূঢ়; **প্রপদ্যন্তে**—শরণাগত হয়; **নরাধমাঃ**—নিকৃষ্ট নরগণ; **মায়য়া**—মায়ার দ্বারা; **অপহৃত**—অপহৃত; **জ্ঞানাঃ**—যাদের জ্ঞান; **আসুরম্**—আসুরিক; **ভাবম্**—স্বভাব; **আশ্রিতাঃ**—আশ্রয় করে।

গীতার গান

কিন্তু যারা দুরাচার নরাধম মূঢ় ।
সর্বদাই গুণকার্যে অতিমাত্রা দৃঢ় ॥
মায়ার দ্বারাতে যারা অপহৃত জ্ঞান ।
প্রপত্তি করে না তারা যত অসুরান্ ॥

অনুবাদ

মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবসম্পন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনও আমার শরণাগত হয় না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতাতে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-কমলে শুধুমাত্র আত্মসমর্পণ করলেই অনায়াসে দুরতিক্রম্য মায়াকে অতিক্রম করা যায়। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, তথাকথিত পণ্ডিত, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী, পরিচালক, রাজনীতিবিদ ও জনসাধারণের নেতারা কেন সর্ব শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণে শরণাগত হন না? মানব-সমাজের নেতারা জড়া প্রকৃতির বিধান থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য বহু বছর ধরে অধ্যবসায় সহকারে অনেক বড় বড় পরিকল্পনা করে। কিন্তু সেই মুক্তি লাভ করাটা যদি কেবল মাত্র ভগবানের শ্রীচরণে

আত্মসমর্পণ করার মতো সহজ ব্যাপার হয়, তা হলে এই সমস্ত বুদ্ধিমান ও কঠোর পরিশ্রমী নেতারা সেই সহজ সরল পন্থাকে অবলম্বন করে না কেন?

ভগবদ্গীতাতে অত্যন্ত সরলভাবে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ সমাজের যথার্থ নেতা, যেমন—ব্রহ্মা, শিব, কুমার, মনু, ব্যাসদেব, কপিল, দেবল, অসিত, জনক, প্রহ্লাদ, বলি এবং পরবর্তীকালে মধ্বাচার্য, রামানুজাচার্য, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং আরও অনেকে—যাঁরা হচ্ছেন বিশ্বস্ত দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক, তাঁরা সকলেই পরম শক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করেছেন। যারা প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক নয়, বৈজ্ঞানিক নয়, শিক্ষক নয়, শাসক নয়, কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেই প্রকার ভান করে লোক ঠকায়, তারা কখনই ভগবানের নির্ধারিত পন্থা অবলম্বন করে না। ভগবান সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণা নেই; তারা কেবলমাত্র মনগড়া জড়-জাগতিক পরিকল্পনা রচনা করে এবং তার ফলে সমাজের সমস্যা লাঘব হওয়ার পরিবর্তে তাদের ব্যর্থ প্রচেষ্টার দ্বারা তা আরও জটিল হয়ে ওঠে। কারণ, জড়া প্রকৃতি এতই শক্তিশালী যে, আসুরিক ভাবাপন্ন নাস্তিক নেতাদের সব রকম শাস্ত্রবিরোধী পরিকল্পনাগুলি সে ব্যর্থ করে দেয় এবং 'পরিকল্পনা কমিশনগুলির' জ্ঞানের দম্ভ নস্যাৎ করে দেয়।

নাস্তিক পরিকল্পনাকারীদের এখানে *দুষ্কৃতিনঃ* অথবা 'দুষ্কৃতকারী' বলে অভিহিত করা হয়েছে। *কৃতী* মানে সুকৃতিকারী। ভগবৎ-বিদ্বেষী পরিকল্পনাকারীরা অনেক সময়ে খুব বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন ও গুণ-সম্পন্নও হয়, কেন না যে কোন বড় পরিকল্পনা, তা ভালই হোক অথবা খারাপই হোক, সফল করতে হলে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। কিন্তু পরমেশ্বরের পরিকল্পনার বিরুদ্ধাচরণ করে বলে নিরীশ্বরবাদী পরিকল্পনাকারীদের *দুষ্কৃতী* বলা হয় অর্থাৎ তাদের বুদ্ধি ও প্রচেষ্টা ভুল পথে চালিত হচ্ছে।

ভগবদ্গীতাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, জড়া শক্তি সম্পূর্ণভাবে ভগবানের নির্দেশে পরিচালিত হয়। এর কোনও স্বাধীন-স্বতন্ত্র ক্ষমতা নেই। কোন কিছুর প্রতিবিম্ব যেমন প্রকৃত বস্তুর উপর নির্ভরশীল, জড়া প্রকৃতিও ঠিক তেমনই ভগবানের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু তবুও জড়া শক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী। ভগবৎ-বিমুখ নাস্তিকদের ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান নেই, তাই তারা কখনই বুঝতে পারে না জড়া প্রকৃতি কিভাবে পরিচালিত হয় এবং ভগবানের পরিকল্পনা কি। মায়ার প্রভাবে সম্মোহ এবং রজোগুণ ও তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকার ফলে তার সব কয়টি পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়। হিরণ্যকশিপু, রাবণ আদি অসুরেরা বিদ্যা-বুদ্ধিতে কারও চাইতে কম ছিল না। তারা সকলেই ছিল মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, শিক্ষক ও পরিচালক। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় তাদের সেই সমস্ত বিরাট বিরাট

পরিকল্পনাগুলি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এই সমস্ত দুরাচারীদের চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—মূঢ়, নরাধম, মায়াপহৃত-জ্ঞান ও আসুরিক ভাবাপন্ন।

(১) *মূঢ়* হচ্ছে তারা, যারা কঠোর পরিশ্রমী ভারবাহী পশুর মতো মূর্খ। তারা সব সময় তাদের নিজেদের পরিশ্রমের ফল নিজেরাই ভোগ করতে চায়। তাই, তারা শ্রীভগবানকে তাদের কর্ম উৎসর্গ করতে পারে না। গাধা হচ্ছে ভারবাহী পশুর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এই পশুটি তার মনিবের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে পারে। এই বেচারি গাধা জানে না সে কার জন্য দিন-রাত খেটে চলেছে। একটুখানি ঘাস খেয়ে উদরপূর্তি করে, মনিবের হাতে মার খাওয়ার আতঙ্কে একটুখানি ঘুমিয়ে উঠে এবং গর্দভীর লাথি খেতে খেতে তার যৌন ক্ষুধার তৃপ্তি করে সে মনে করে যে, সে খুব সুখেই আছে। এই গাধাগুলি মাঝে মাঝে কবিতা আবৃত্তি করে জীবন-দর্শন আওড়ায়, কিন্তু তার রাসভ-নাদের ফলে সে অন্যদের কেবল জ্বালাতনই করে। মূঢ় সকাম কর্মীদের অবস্থাও ঠিক এই গাধারই মতো। তারা জানে না কার জন্য কর্ম করা উচিত। তারা জানে না যে, কর্ম করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে যজ্ঞ, অর্থাৎ ভগবানকে সন্তুষ্ট করাই হচ্ছে কর্ম করার যথার্থ উদ্দেশ্য।

এই সমস্ত কর্মী, যারা তাদের স্বকল্পিত কর্তব্যের ভার লাঘব করবার জন্য দিন-রাত গাধার মতো খেটে চলেছে, তারা প্রায়ই বলে যে, জীবের অমরত্বের কথা শোনবার মতো সময় তাদের নেই। এই সমস্ত মূঢ় লোকগুলির কাছে ক্ষয়িষ্ণু জাগতিক লাভটাই হচ্ছে সব কিছু। অথচ ওরা জানে না দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে তারা যে কর্ম করছে, তার একটা নগণ্য অংশই কেবল তারা উপভোগ করতে পারে। অনর্থক বিষয় লাভের জন্য তারা দিনরাত না ঘুমিয়ে গাধার মতো পরিশ্রম করে, মন্দাগ্নি আদি উদরপীড়ায় পীড়িত হয়ে এক রকম অনাহারে থেকে তারা তাদের কল্পিত প্রভুর সেবায় রত থাকে। তাদের যথার্থ প্রভুকে না জেনে তারা ধনদেবতার পরিচর্যা করে তাদের অমূল্য সময় নষ্ট করে। দুর্ভাগাবশত, তারা কখনই সমস্ত প্রভুর পরম প্রভুর শরণাগত হয় না, অথবা তারা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তাঁর কথা শ্রবণ করে না। বিষ্ঠাহারী শূকর কখনই দুধ, ঘি, চিনির তৈরি মিঠাই খেতে চায় না। তেমনই, মূঢ় কর্মীরা অস্থির পার্থিব জগতের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিদায়ক কথাই কেবল শ্রবণ করে, কিন্তু যে শাশ্বত প্রাণশক্তি জড় জগৎকে চালনা করছে, সেই অপ্রাকৃত শক্তির কথা শোনবার বিন্দুমাত্র সময় পায় না।

(২) অন্য শ্রেণীর দুরাচারীদের বলা হয় *নরাধম* অর্থাৎ তারা হচ্ছে সব চাইতে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষ। ৮৪,০০,০০০ যোনির মধ্যে ৪,০০,০০০ হচ্ছে মনুষ্য-যোনি। এর মধ্যে অসংখ্য নিম্ন শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা সাধারণত অসভ্য। সভ্য মানুষ

হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন যাপন করে। আর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত হলেও যাদের জীবন ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা পরিচালিত হয় না, তাদের *নরাধম* বলে গণ্য করা হয়। ভগবানকে বাদ দিয়ে কখনও কোন ধর্ম হয় না। কারণ, ধর্মের পথ অনুসরণ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম-তত্ত্বকে জানা এবং তাঁর সঙ্গে মানুষের নিত্য সম্পর্কের কথা অবগত হওয়া। *গীতাতে* পরমেশ্বর ভগবান স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর উপরে ক্ষমতাশালী কেউ নেই এবং তিনিই হচ্ছেন পরম সত্য। তাঁর উর্ধ্বে আর কোনও ক্ষমতা নেই। সভ্য মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরম সত্য বা সর্ব শক্তিমান, পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মানুষের নিত্য সম্পর্কের লুপ্ত চেতনার পুনর্জাগরণ করা। মনুষ্য-শরীর পাওয়া সত্ত্বেও যে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না, তাকে বলা হয় নরাধম। শাস্ত্রের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে (যে অবস্থাটি অত্যন্ত অস্বস্তিকর), তখন সে ভগবানের কাছে প্রতিজ্ঞা করে যে, সেই অবস্থা থেকে মুক্ত হলেই সে ভগবানের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করবে। বিপদে পড়লে ভগবানকে প্রার্থনা জানানো জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কারণ ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্বন্ধ রয়েছে। কিন্তু প্রসব হওয়ার পরেই শিশু তার জন্ম-যন্ত্রণার কথা ভুলে যায় এবং মায়ার প্রভাবে তার মুক্তিদাতাকেও ভুলে যায়।

শিশুর অভিভাবকদের কর্তব্য হচ্ছে, তাঁদের সন্তানদের সুপ্ত ভগবৎ-প্রেমকে পুনর্জাগরিত করা। ধর্মশাস্ত্র *মনু-স্মৃতিতে* নির্দেশিত দশকর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্ণাশ্রম পদ্ধতির মাধ্যমে এই ভগবৎ-প্রেমকে পুনর্জাগরিত করা। কিন্তু আধুনিক যুগে পৃথিবীর কোথাও এই পদ্ধতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় না। তাই, আধুনিক যুগে শতকরা নিরানব্বই জন মানুষই নরাধমে পরিণত হয়েছে।

যখন সমগ্র জনগণই নরাধমে পরিণত হয়, তখন স্বাভাবিক ভাবেই সর্ব শক্তিময়ী মায়ার প্রভাবে তাদের তথাকথিত শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন হয়ে পড়ে। *গীতার* মানদণ্ড অনুসারে, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত পণ্ডিত, যিনি একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ, একটি কুকুর, একটি গরু, একটি হাতি ও একজন চণ্ডালকে সমদৃষ্টিতে দেখেন। এই হচ্ছে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গি। পরমেশ্বর ভগবানের অবতার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যথার্থ নরাধম জগাই ও মাধাই ভ্রাতৃদ্বয়কে উদ্ধার করেন এবং এভাবেই তিনি দেখিয়ে গেছেন যে, প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের করুণা কিভাবে সব চাইতে অধঃপতিত মানুষের উপরেও বর্ষিত হয়। তাই, যে নরাধমকে ভগবান পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছেন, ভগবদ্ভক্তের কৃপার প্রভাবে তার হৃদয়ে আবার পারমার্থিক কৃষ্ণভাবনার উন্মেষ হতে পারে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু *ভাগবত-ধর্ম* অথবা ভগবদ্ভক্তদের কার্যপদ্ধতি প্রচার করে উপদেশ দিয়ে গেছেন যে, শ্রদ্ধাবনত চিত্তে মানুষকে পরমেশ্বর ভগবানের বাণী শ্রবণ করতে হবে। ভগবানের দেওয়া এই উপদেশের সারমর্ম হচ্ছে *ভগবদ্গীতা*। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ভগবানের দেওয়া উপদেশ শ্রবণ করার ফলে নরাধমও উদ্ধার পেতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করা তো দূরে থাকুক, এই সমস্ত নরাধমগুলি ভগবানের বাণী পর্যন্ত কানে শুনতে চায় না। এভাবেই নরাধমেরা সব সময়ই মানব-জীবনের পরম কর্তব্যকে একেবারেই অবহেলা করে।

(৩) পরবর্তী শ্রেণীর দুষ্কৃতকারীদের বলা হয় *মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ*, অর্থাৎ মায়ার প্রভাবে যাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান অপহৃত হয়েছে। সাধারণত এরা অধিকাংশই খুব বিদ্বান হয়—যেমন বড় বড় দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক আদি। কিন্তু মায়াশক্তি তাদের বিপথগামী করেছে, তাই তারা পরমেশ্বর ভগবানকে অবজ্ঞা করে থাকে।

আজকের জগতে অসংখ্য *মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ* মানুষ দেখা যায়, এমন কি অনেক *ভগবদ্গীতার* পণ্ডিতও এই ধরনের মূঢ়। *গীতাতে* সহজ সরল ভাষায় বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবান। তাঁর সমকক্ষ অথবা তাঁর থেকে মহৎ আর কেউ নেই। তাঁকে সমস্ত মানুষের আদি পিতা ব্রহ্মারও পিতারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুত, শ্রীকৃষ্ণকে কেবল ব্রহ্মারই পিতা বলা হয় না, তিনি সমস্ত যোনিভুক্ত জীবেরও পিতা। তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মের আশ্রয় এবং সমস্ত জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা হচ্ছেন তাঁরই অংশ। তিনি সব কিছুরই উৎস, তাই তাঁর চরণারবিন্দের শরণাগত হওয়ার জন্য প্রত্যেককেই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সুদৃঢ়ভাবে এই সব সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও *মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ* মানুষেরা ভগবানকে অবজ্ঞা করে এবং তাঁকে আর একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। তারা জানে না যে, এই দুর্লভ মনুষ্য-শরীর ভগবানেরই নিত্য চিন্ময় শ্রীবিগ্রহের অনুকরণে রচিত হয়েছে।

মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ মূর্খেরা *গীতার* যে প্রামাণ্যবর্জিত ব্যাখ্যা করে, তার ফলে তারা প্রকৃতপক্ষে *গীতার* যথাযথ অর্থের কদর্থ করে। গুরু-পরম্পরাক্রমে *গীতার* জ্ঞান প্রাপ্ত না হওয়ার ফলে তারা *গীতার* প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পারে না। তারা যে মনগড়া ব্যাখ্যা করে তা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত এবং তাদের সেই সমস্ত মতবাদগুলি পারমার্থিক সাধনার পথে দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধকের মতো হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্ত মোহগ্রস্ত ব্যাখ্যাকাররা কখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের শরণাগত হয় না এবং অন্য কাউকেও ভগবানের শরণাগত হওয়ার শিক্ষাদান করে না।

(৪) সর্বশেষ শ্রেণীর দুষ্কৃতকারীদের বলা হয় *আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ* অথবা আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তি। এই ধরনের মানুষেরা নির্লজ্জভাবে নাস্তিক। এই শ্রেণীর নররূপধারী অসুরেরা তর্ক করে যে, পরমেশ্বর ভগবান কখনই এই জড় জগতে অবতরণ করতে পারেন না। কিন্তু ভগবান যে কেন এই জড় জগতে অবতরণ করতে পারেন না, সেই সম্বন্ধে তারা কোন যুক্তিও প্রদর্শন করতে পারে না। এদের কেউ কেউ আবার বলে যে, ভগবান নির্বিশেষ ব্রহ্মের অধীন, যদিও *গীতাতে* ঠিক এর বিপরীত কথাই বলা হয়েছে। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে এই সমস্ত নাস্তিকেরা স্বকপোলকল্পিত অপ্রামাণিক একাধিক অবতারদের অবতারণা করে। এই ধরনের মানুষদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ভগবানের নিন্দা করা, তাই তারা কখনই শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের শরণাগত হতে পারে না।

দক্ষিণ ভারতের শ্রীযামুনাচার্য আলবন্দার বলেছেন, "হে ভগবান! তুমি যদিও তোমার অপ্রাকৃত রূপ, গুণ ও লীলার দ্বারা অলঙ্কৃত, সমস্ত শাস্ত্র যদিও তোমার বিশুদ্ধ সত্ত্বময় শ্রীবিগ্রহকে অঙ্গীকার করে এবং দৈবীগুণ-সম্পন্ন জ্ঞানী আচার্যেরা তোমার জয়জয়কার করেন, কিন্তু তবুও আসুরিক ভাবাপন্ন নিরীশ্বরবাদীরা কখনই তোমাকে জানতে পারে না।"

তাই, উপরোক্ত (১) মূঢ়, (২) নরাধম, (৩) মায়াপহৃত-জ্ঞান (৪) আসুরিক ভাবাপন্ন নাস্তিকেরা শাস্ত্র ও মহাজনদের উপদেশ সত্ত্বেও কখনই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের শরণাগত হয় না।

শ্লোক ১৬

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন ।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

চতুর্বিধাঃ—চার প্রকার; **ভজন্তে**—ভজনা করেন; **মাম্**—আমাকে; **জনাঃ**—ব্যক্তিগণ; **সুকৃতিনঃ**—পুণ্যকর্মা; **অর্জুন**—হে অর্জুন; **আর্তঃ**—আর্ত; **জিজ্ঞাসুঃ**—অনুসন্ধিৎসু; **অর্থার্থী**—ভোগ অভিলাষী; **জ্ঞানী**—তত্ত্বজ্ঞ; **চ**—ও; **ভরতর্ষভ**—হে ভরতশ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

সুকৃতি করেছে যারা সেই চারিজন ।
আর্ত অর্থার্থী জিজ্ঞাসু কিম্বা জ্ঞানী হন ॥

প্রপত্তি সহিত তারা করয়ে ভজন ।
অসুরাদি মায়াযুদ্ধে হারায় জীবন ॥

অনুবাদ

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন! আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী—এই চার প্রকার পুণ্যকর্মা ব্যক্তিগণ আমার ভজনা করেন।

তাৎপর্য

দুষ্কৃতকারীদের ঠিক বিপরীত হচ্ছে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণকারী এবং তাঁদের বলা হয় *সুকৃতিনঃ* অর্থাৎ সুকৃতিসম্পন্ন মানুষ। এরা সব সময়ই শাস্ত্র নির্দেশিত বিধি-নিষেধগুলি মেনে চলে, সমাজের নীতি মেনে চলে এবং এরা সকলেই অল্প-বিস্তর ভগবদ্ভক্ত। এরাও আবার চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত— (১) আর্ত, (২) অর্থার্থী (৩) জিজ্ঞাসু ও (৪) জ্ঞানী। এই সমস্ত ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন কারণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভগবানের শ্রীচরণে শরণাগত হয়। এরা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত নয়, কারণ ভক্তির বিনিময়ে এরা কোন না কোন অভিলাষ পূর্তির কামনা করে। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তি সব রকমের কামনা থেকে মুক্ত এবং জড়-জাগতিক কোন কিছু লাভ করার অভিলাষ থাকে না। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (*পূর্ব* ১/১১) শুদ্ধ ভক্তির বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"জড়-জাগতিক লাভের অভিলাষ বর্জন করে, জ্ঞান, কর্ম, যোগ আদি নৈমিত্তিক ধর্মের আচরণ থেকে মুক্ত হয়ে, অনুকূলভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য প্রেমভক্তি সেবা করাই হচ্ছে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি।"

এই চার শ্রেণীর ব্যক্তিরা যখন ভগবানের সেবা করে, তখন সাধুসঙ্গের প্রভাবে তারাও শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়। দুষ্কৃতকারীদের পক্ষে ভগবদ্ভক্তি করা খুবই কঠিন, কারণ তারা অত্যন্ত স্বার্থপর, অসংযত ও পারমার্থিক উদ্দেশ্যহীন। কিন্তু তবুও সৌভাগ্যক্রমে তাদের কেউ যদি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সংস্পর্শে আসে, তা হলে তারাও শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হতে পারে।

যারা সকাম কর্মের ফল ভোগ করবার জন্য সর্বদাই নানা রকম কাজে ব্যস্ত, তারা নানা রকম দুঃখ-দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হয়ে ভগবানের শরণাগত হয় এবং

শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সংস্পর্শে আসার ফলে দুঃখের মধ্যেও তারা ভগবদ্ভক্তে পরিণত হয়। নৈরাশ্যের ফলেও অনেকে সাধুসঙ্গ করে এবং তার প্রভাবে ভগবানের কথা জানতে জিজ্ঞাসু হয়। তেমনই, আবার শূন্যগর্ভ দার্শনিকেরাও সমস্ত জাগতিক জ্ঞানের নিরর্থকতা উপলব্ধি করতে পেরে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার প্রয়াসী হয় এবং ভগবানের সেবা করতে শুরু করে। তার ফলে নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং ভগবানের আংশিক প্রকাশ পরমাত্মা স্তর অতিক্রম করে, পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কৃপায় ভগবানের সাকার রূপের জ্ঞান লাভ করে। মোটের উপর এই সমস্ত আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীরা যখন উপলব্ধি করতে পারে যে, পরমার্থ সাধন করার সঙ্গে জড়-জাগতিক লাভ-ক্ষতির কোন সম্পর্ক নেই, তখন তারা শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়। এই পরম শুদ্ধ ভক্তির স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত ভক্ত সকাম কর্মের দ্বারা দূষিত হয়ে থাকে এবং জড়-জাগতিক জ্ঞানের অন্বেষণও করতে থাকে। তাই, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হতে হলে, এই সমস্ত প্রতিবন্ধকগুলি অতিক্রম করতে হয়।

শ্লোক ১৭

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে ।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

তেষাম্—তাঁদের মধ্যে; **জ্ঞানী**—তত্ত্বজ্ঞ; **নিত্যযুক্তঃ**—সর্বদাই আমাতে একাগ্রচিত্ত; **এক**—একমাত্র; **ভক্তিঃ**—ভগবদ্ভক্তিতে; **বিশিষ্যতে**—শ্রেষ্ঠ; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **হি**—যেহেতু; **জ্ঞানিনঃ**—জ্ঞানীর; **অত্যর্থম্**—অত্যন্ত; **অহম্**—আমি; **সঃ**—তিনি; **চ**—ও; **মম**—আমার; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়।

গীতার গান

এই চারিজন মধ্যে জ্ঞানী সে বিশিষ্ট ।
প্রিয় হয় জ্ঞানী মোর অতি সে বলিষ্ঠ ॥

অনুবাদ

এই চার প্রকার ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত, আমাতে একনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। কেন না আমি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

সব রকম জড় বাসনার কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীরা শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়। কিন্তু এদের মধ্যে সমস্ত জড় বাসনা থেকে নিস্পৃহ তত্ত্বজ্ঞানী বাস্তবিকই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তে পরিণত হন। এই চার শ্রেণীর মধ্যে যিনি পূর্ণ জ্ঞানবান এবং সেই সঙ্গে ভক্তিপরায়ণ, ভগবান বলেছেন যে, তিনিই প্রকৃতপক্ষে ভগবানের শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হন। প্রকৃত জ্ঞান অন্বেষণ করার ফলে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, জড় দেহটি থেকে আত্মা ভিন্ন এবং এই তত্ত্বানুসন্ধানের পথে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে তিনি নিরাকার ব্রহ্ম ও পরমাত্মার জ্ঞান উপলব্ধি করেন। পূর্ণরূপে শুদ্ধ হওয়ার পর তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে, তাঁর স্বরূপে তিনি ভগবানের নিত্য দাস। শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ লাভ করার ফলে আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী—এঁরা সকলেই শুদ্ধ হন। কিন্তু যে মানুষ প্রাথমিক সাধনাবস্থায় ভগবান সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানসম্পন্ন এবং সেই সঙ্গে ভক্তিপরায়ণ, তিনি ভগবানের অতিশয় প্রিয়। যিনি ভগবানের অপ্রাকৃতত্ত্ব সম্পর্কে শুদ্ধ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত, ভক্তিযোগের পথে ভগবান তাঁকে এমনভাবে সংরক্ষণ করেন যে, জড় জগতের কোন কলুষতা আর তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

শ্লোক ১৮

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্ ।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥

উদারাঃ—উদার; **সর্ব**—সকলে; **এব**—অবশ্যই; **এতে**—এরা; **জ্ঞানী**—জ্ঞানী; **তু**—কিন্তু; **আত্মা এব**—আমার নিজের মতো; **মে**—আমার; **মতম্**—মত; **আস্থিতঃ**—অবস্থিত; **সঃ**—তিনি; **হি**—যেহেতু; **যুক্তাত্মা**—ভক্তিযোগে যুক্ত; **মাম্**—আমাকে; **এব**—অবশ্যই; **অনুত্তমাম্**—সর্বোৎকৃষ্ট; **গতিম্**—গতি।

গীতার গান

উক্ত চারিজন ভক্ত সকলে উদার ।
শুদ্ধভক্তি প্রাপ্ত হন ক্রমশ বিস্তার ॥
তার মধ্যে জ্ঞানী ভক্ত অতি সে আত্মীয় ।
সে কারণে উত্তম গতি হয় বরণীয় ॥

অনুবাদ

এই সকল ভক্তেরা সকলেই নিঃসন্দেহে মহাত্মা, কিন্তু যে জ্ঞানী আমার তত্ত্বজ্ঞানে অধিষ্ঠিত, আমার মতে তিনি আমার আত্মস্বরূপ। আমার অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত হয়ে তিনি সর্বোত্তম গতিস্বরূপ আমাকে লাভ করেন।

তাৎপর্য

ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানী ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানের প্রিয়, কিন্তু তা বলে যে ভগবান তাঁর অন্য ভক্তদের ভালবাসেন না, তা নয়। ভগবান বলেছেন যে, তাঁরা সকলেই উদার, কারণ যে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যাঁরাই ভগবানের কাছে আসেন, তাঁরা সকলেই মহাত্মা। ভগবদ্ভক্তির বিনিময়ে যে সমস্ত ভক্ত কোন কিছু লাভের আশা করেন, ভগবান তাঁকেও গ্রহণ করেন, কারণ সেই ক্ষেত্রেও প্রীতির আদান-প্রদান হয়। ভগবানকে ভালবেসেই তাঁরা তাঁর কাছে কোন বিষয় লাভের কামনা করেন। তারপর তাঁর বাঞ্ছাপূর্তি-জনিত সন্তুষ্টির ফলে তিনি আরও গভীরভাবে ভগবানকে ভালবাসেন। কিন্তু তবুও পূর্ণ জ্ঞানবান ভগবদ্ভক্ত ভগবানের অতিশয় প্রিয়, কারণ তাঁর একমাত্র প্রয়োজন হচ্ছে প্রেমভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করা। এই ধরনের ভক্ত ভগবৎ-সান্নিধ্য বা ভগবৎ-সেবা বিনা এক মুহূর্তও বাঁচতে পারেন না। সেই রকম ভগবানও তাঁর ভক্তের প্রতি এতই অনুরক্ত যে, তাঁকে ছেড়ে তিনি থাকতে পারেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৯/৪/৬৮) ভগবান বলেছেন—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহম্ ।
মদন্যৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥

"ভক্তেরা আমার হৃদয়ে সর্বদাই নিবাস করেন এবং আমিও সর্বক্ষণই তাঁদের হৃদয়ে বিরাজমান থাকি। আমাকে ছাড়া ভক্ত আর কিছুই জানেন না, আর আমিও তাই ভক্তকে কখনই ভুলতে পারি না। আমার শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তা প্রগাঢ় প্রেমময় ও আন্তরিক। পূর্ণজ্ঞানী শুদ্ধ ভক্তেরা কখনই পারমার্থিক সান্নিধ্য বর্জন করেন না, তাই তাঁরা আমার এত প্রিয়।"

শ্লোক ১৯

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯ ॥

বহূনাম্—বহু; **জন্মনাম্**—জন্মের; **অন্তে**—পরে; **জ্ঞানবান্**—তত্ত্বজ্ঞানী; **মাম্**—আমাতে; **প্রপদ্যতে**—প্রপত্তি করেন; **বাসুদেবঃ**—বাসুদেব; **সর্বম্**—সমস্ত; **ইতি**—এভাবে; **সঃ**—সেইরূপ; **মহাত্মা**—মহাপুরুষ; **সুদুর্লভঃ**—অত্যন্ত দুর্লভ।

গীতার গান

ক্রমে ক্রমে জ্ঞানীজন বহু জন্ম পরে ।
আমার চরণে শুদ্ধ প্রপত্তি সে করে ॥
বাসুদেবময় তদা জগৎ দর্শন ।
দুর্লভ মহাত্মা সেই শাস্ত্রের বর্ণন ॥

অনুবাদ

বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্ব কারণের পরম কারণ রূপে জেনে আমার শরণাগত হন। সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

তাৎপর্য

বহু বহু জন্মে ভগবদ্ভক্তি সাধন করার ফলে অথবা পারমার্থিক কর্ম অনুষ্ঠান করার ফলে জীব এই অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হয় যে, পারমার্থিক উপলব্ধির চরম লক্ষ্য হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। পারমার্থিক উপলব্ধির প্রারম্ভিক স্তরে, সাধক যখন ভোগাসক্তির জড় বন্ধন নিবৃত্তি করার চেষ্টা করেন, তখন তাঁর প্রবৃত্তি কিছুটা নির্বিশেষবাদের প্রতি আকৃষ্ট থাকে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি যখন উন্নতি লাভ করেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, পারমার্থিক জীবনেও অপ্রাকৃত ক্রিয়াকর্ম আছে এবং তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ। এটি বুঝতে পেরে, তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হন এবং তাঁর শ্রীচরণ-কমলে আত্মনিবেদন করেন। এই অবস্থায় তিনি বুঝতে পারেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপাই হচ্ছে সর্ব সারসর্বস্ব, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ এবং এই বিশ্বচরাচর তাঁর থেকে স্বাধীন স্বতন্ত্র নয়। তিনি বুঝতে পারেন, এই জড় জগৎ চিন্ময় বৈচিত্র্যেরই বিকৃত প্রতিবিম্ব এবং সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কোন না কোনভাবে সম্বন্ধযুক্ত। তাই, তিনি বাসুদেব অথবা শ্রীকৃষ্ণের পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছু চিন্তা করেন। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে সর্বত্র দেখার এই অভ্যাস পরম লক্ষ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্পণ ত্বরান্বিত করে। এই প্রকার শরণাগত মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

এই শ্লোকটি *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের* তৃতীয় অধ্যায়ে (শ্লোক ১৪-১৫) খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ॥

পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্ ।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥

ছান্দোগ্য উপনিষদে (৫/১/১৫) বলা হয়েছে, *ন বৈ বাচো ন চক্ষূংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্বাণি ভবন্তি*—"জীবের দেহের মধ্যে বাক্‌শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, চিন্তাশক্তি আসল জিনিস নয়; প্রাণশক্তিই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রবিন্দু।" ঠিক সেই রকমভাবে, ভগবান বাসুদেব অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সব কিছুর মধ্যে মূল সত্তা। এই দেহের মধ্যে বাকশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, চিন্তাভাবনার শক্তি আদি রয়েছে। কিন্তু এই সব যদি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না হয়, তা হলে এগুলির কোনই গুরুত্ব থাকে না। আর যেহেতু বাসুদেব সর্বব্যাপক এবং সব কিছুই হচ্ছেন বাসুদেব স্বয়ং, তাই ভক্ত পূর্ণজ্ঞানে আত্মসমর্পণ করেন। (তুলনীয়—*ভগবদ্গীতা* ৭/১৭ ও ১১/৪০)

শ্লোক ২০

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

কামৈঃ—কামনাসমূহের দ্বারা; **তৈঃ**—সেই; **তৈঃ**—সেই; **হৃত**—অপহৃত; **জ্ঞানাঃ**—জ্ঞান; **প্রপদ্যন্তে**—প্রপত্তি করে; **অন্য**—অন্য; **দেবতাঃ**—দেব-দেবীদের; **তম্**—সেই; **তম্**—সেই; **নিয়মম্**—নিয়ম; **আস্থায়**—পালন করে; **প্রকৃত্যা**—স্বভাবের দ্বারা; **নিয়তাঃ**—নিয়ন্ত্রিত হয়ে; **স্বয়া**—স্বীয়।

গীতার গান

যে পর্যন্ত কামনার দ্বারা থাকে বশীভূত ।
প্রপত্তি আমাতে তদা নহে ত' সম্ভূত ॥
সেই কাম দ্বারা তারা হৃতজ্ঞান হয় ।
আমাকে ছাড়িয়া অন্য দেবতা পূজয় ॥

অনুবাদ

জড় কামনা-বাসনার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, তারা অন্য দেব-দেবীর শরণাগত হয় এবং তাদের স্বীয় স্বভাব অনুসারে বিশেষ নিয়ম পালন করে দেবতাদের উপাসনা করে।

তাৎপর্য

যারা সর্বতোভাবে জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে পেরেছে, তারাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করে তাঁর প্রতি ভক্তিযুক্ত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত জীব জড় জগতের কলুষ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে না পারছে, ততক্ষণ সে স্বভাবতই অভক্ত থাকে। কিন্তু এমন কি বিষয়-বাসনার দ্বারা কলুষিত থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ ভগবানের আশ্রয় অবলম্বন করে, তখন সে আর ততটা বহিরঙ্গা প্রকৃতির দ্বারা আকৃষ্ট হয় না; যথার্থ লক্ষ্যের প্রতি উত্তরোত্তর অগ্রসর হতে হতে সে শীঘ্রই সমস্ত প্রাকৃত কাম-বিকার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে যে, সমস্ত জড় কামনা-বাসনা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত শুদ্ধ ভক্তই হোক, অথবা প্রাকৃত অভিলাষযুক্ত হোক, অথবা জড় কলুষ থেকে মুক্তিকামীই হোক না কেন, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে বাসুদেবের শরণাগত হয়ে তাঁর উপাসনা করা। *শ্রীমদ্ভাগবতে* তাই বলা হয়েছে (২/৩/১০)—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

যে সব স্বল্পবুদ্ধি মানুষের পারমার্থিক জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, তারাই বিষয়-বাসনার তাৎক্ষণিক পূর্তির জন্য দেবতাদের শরণাপন্ন হয়। সাধারণত, এই স্তরের মানুষেরা ভগবানের শরণাগত হয় না, কারণ রজ ও তমোগুণের দ্বারা কলুষিত থাকার ফলে তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনার প্রতি অধিক আকৃষ্ট থাকে। দেবোপাসনার বিধি-বিধান পালন করেই তারা সন্তুষ্ট থাকে। বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসকেরা তাদের তুচ্ছ অভিলাষের দ্বারা এতই মোহাচ্ছন্ন থাকে যে, তারা পরম লক্ষ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকে। ভগবানের ভক্ত কিন্তু কখনই এই পরম লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হন না। বৈদিক শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীকে পূজা করার বিধান দেওয়া আছে। যেমন, রোগ নিরাময়ের জন্য সূর্যদেবের উপাসনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে অভক্তেরা মনে করে যে, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেব-দেবীরা ভগবান থেকেও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত জানেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সব কিছুর অধীশ্বর। *শ্রীচৈতন্য-*

চরিতামৃতে (*আদি* ৫/১৪২) বলা হয়েছে—*একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য ।* তাই, শুদ্ধ ভক্ত কখনও তাঁর বিষয়-বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য দেব-দেবীর কাছে যান না। তিনি সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের উপর নির্ভরশীল এবং ভগবানের কাছ থেকে তিনি যা পান তাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন।

শ্লোক ২১

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি ।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১ ॥

যঃ—যে; **যঃ**—যে; **যাম্**—যে; **যাম্**—যে; **তনুম্**—দেব-দেবীর মূর্তি; **ভক্তঃ**—ভক্ত; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **অর্চিতুম্**—পূজা করতে; **ইচ্ছতি**—ইচ্ছা করে; **তস্য**—তার; **তস্য**—তার; **অচলাম্**—অচলা; **শ্রদ্ধাম্**—শ্রদ্ধা; **তাম্**—তাতে; **এব**—অবশ্যই; **বিদধামি**—বিধান করি; **অহম্**—আমি।

গীতার গান

আমি অন্তর্যামী তার থাকিয়া অন্তরে ।
সেই সেই দেবপূজা করাই সত্বরে ॥
সেই সেই শ্রদ্ধা দিই করিয়া অচল ।
অতএব অন্য দেব করয়ে পূজন ॥

অনুবাদ

পরমাত্মারূপে আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করি। যখনই কেউ দেবতাদের পূজা করতে ইচ্ছা করে, তখনই আমি সেই সেই ভক্তের তাতেই অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি।

তাৎপর্য

ভগবান প্রত্যেককেই স্বাধীনতা দিয়েছেন; তাই, কেউ যদি জড় সুখভোগ করার জন্য কোন দেবতার পূজা করতে চায়, তখন সকলের অন্তরে পরমাত্মারূপে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান তাদের সেই সমস্ত দেবতাদের পূজা করার সব রকম সুযোগ-সুবিধা দান করেন। সমস্ত জীবের পরম পিতা ভগবান কখনও তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। পক্ষান্তরে, তিনি তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার

সব রকম সুযোগ-সুবিধা দান করেন। এই সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, জড় জগৎকে ভোগ করার ফলে জীব যদি মায়ার ফাঁদে পতিত হয়, তা হলে সর্বশক্তিমান ভগবান কেন তাদের এই সুযোগ প্রদান করেন? এর উত্তর হচ্ছে, পরমাত্মারূপে ভগবান যদি সেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা না দিতেন, তা হলে জীবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কোন মূল্যই থাকত না। তাই, তিনি প্রতিটি জীবকে তাদেরই ইচ্ছানুরূপ আচরণ করার জন্য পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য দান করেন। কিন্তু তাঁর পরম নির্দেশ আমরা *ভগবদ্গীতাতে* পাই—সব কিছু পরিত্যাগ করে তাঁর শরণাগত হোন। আর মানুষ যদি তা করে, তা হলেই সে সুখী হতে পারে।

জীবাত্মা ও দেবতা, এরা উভয়েই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ইচ্ছার অধীন। তাই, জীব নিজের ইচ্ছায় দেব-দেবীর পূজা করতে পারে না এবং দেব-দেবীরাও ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত বর দান করতে পারেন না। ভগবান বলেছেন যে, তাঁর ইচ্ছা বিনা একটি পাতাও নড়ে না। সাধারণত, সংসারে বিপদগ্রস্ত মানুষেরাই বৈদিক নির্দেশ অনুসারে দেবোপাসনা করে। যেমন, রোগ নিরাময়ের জন্য রোগী সূর্যোপাসনা করে, বিদ্যার্থী বাগ্‌দেবী সরস্বতীর পূজা করে এবং সুন্দরী স্ত্রী লাভ করার জন্য কোন ব্যক্তি শিবপত্নী উমার পূজা করে। এভাবেই শাস্ত্রে বিভিন্ন দেবতাদের পূজা করার বিধান দেওয়া আছে। আর যেহেতু প্রতিটি জীবই কোন বিশেষ জাগতিক সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করার অভিলাষী হয়, তাই ভগবান তাদের অন্তরে বিশেষ বিশেষ দেব-দেবীদের প্রতি অচলা শ্রদ্ধা দান করে তাঁদের উপাসনা করতে অনুপ্রাণিত করেন এবং তার ফলে তারা সেই সমস্ত দেব-দেবীর কাছ থেকে বর লাভ করতে সমর্থ হয়। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর প্রতি জীবের যে অনুরাগ জন্মায়, তা ভগবানেরই দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। দেব-দেবীরা তাঁদের নিজেদের শক্তির প্রভাবে জীবকে তাঁদের প্রতি অনুরক্ত করতে পারেন না। জীবের অন্তরে পরমাত্মারূপে বিদ্যমান থেকে শ্রীকৃষ্ণই মানুষকে দেবোপাসনায় অনুপ্রাণিত করেন। দেবতারা প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপের বিভিন্ন অঙ্গ, তাই তাঁদের কোনই স্বাতন্ত্র্য নেই। বেদে বলা হয়েছে, "পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান দেবতাদের হৃদয়েও বিরাজ করেন, তাই তিনিই বিভিন্ন দেব-দেবীর মাধ্যমে জীবের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। এভাবেই দেবতা ও জীবাত্মা কেউই স্বাধীন নয়, তাঁরা সকলেই ভগবানের ইচ্ছার অধীন।"

শ্লোক ২২

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে ।
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২ ॥

সঃ—তিনি; **তয়া**—সেই; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **যুক্তঃ**—যুক্ত হয়ে; **তস্য**—তাঁর; **আরাধনম্**—আরাধনা; **ঈহতে**—প্রয়াস করেন; **লভতে**—লাভ করেন; **চ**—এবং; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **কামান্**—কামনাসমূহ; **ময়া**—আমার দ্বারা; **এব**—কেবল; **বিহিতান্**—বিহিত; **হি**—অবশ্যই; **তান্**—সেই।

গীতার গান

সে তখন শ্রদ্ধাযুক্ত দেব আরাধন ।
করিয়া সে ফল পায় আমার কারণ ॥
কিন্তু সেই সেই ফল অনিত্য সকল ।
স্বল্প মেধা চাহে তাই সাধন বিফল ॥

অনুবাদ

সেই ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই দেবতার আরাধনা করেন এবং সেই দেবতার কাছ থেকে আমারই দ্বারা বিহিত কাম্য বস্তু অবশ্যই লাভ করেন।

তাৎপর্য

ভগবানের অনুমতি ছাড়া দেব-দেবীরা তাঁদের ভক্তদের কোন রকম বর দান করে পুরস্কৃত করতে পারেন না। সব কিছুই যে পরমেশ্বর ভগবানের সম্পত্তি, সেই কথা জীব ভুলে যেতে পারে, কিন্তু দেবতারা তা ভোলেন না। তাই, বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই ব্যবস্থা অনুসারে সাধিত হয়। এই ব্যাপারে দেব-দেবীরা হচ্ছেন উপলক্ষ্য মাত্র। অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা সেই কথা জানে না, তাই তারা কিছু সুবিধা লাভের জন্য নির্বোধের মতো বিভিন্ন দেব-দেবীর শরণাপন্ন হয়। কিন্তু শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের যখন কোন কিছুর প্রয়োজন হয়, তখন তিনি কেবল পরমেশ্বর ভগবানের কাছে সেই জন্য প্রার্থনা করেন। জড়-জাগতিক সুযোগ-সুবিধা প্রার্থনা করা যদিও শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ নয়। কিন্তু জীব মাত্রই দেবতাদের শরণাপন্ন হয়, কারণ তারা কামনা চরিতার্থ করার জন্য মত্ত হয়ে থাকে। এটি তখনই হয়, যখন সে কোন ভ্রান্ত অনর্থ কামনা করে, যার পূর্তি ভগবান নিজে করেন না। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, যদি কেউ ভগবানের আরাধনা করে সেই সঙ্গে জড় সুখ কামনা করে, তবে তা পরস্পর বিরোধী ও অসঙ্গত। পরমেশ্বর ভগবানের সেবা আর দেব-দেবীদের উপাসনা একই পর্যায়ে হতে পারে না, কারণ দেবোপাসনা হচ্ছে প্রাকৃত, আর ভগবদ্ভক্তি হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত।

যে জীব তার যথার্থ আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে চায়, তার কাছে জাগতিক কামনা-বাসনাগুলি হচ্ছে এক একটি প্রতিবন্ধক। তাই, শুদ্ধ ভক্তকে ভগবান জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগৈশ্বর্য দান করেন না, যা অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা আবার সেগুলিই লাভ করবার জন্য দেবোপাসনায় তৎপর হয়।

শ্লোক ২৩

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ ভবত্যল্পমেধসাম্ ।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩ ॥

অন্তবৎ—সীমিত ও অস্থায়ী; **তু**—কিন্তু; **ফলম্**—ফল; **তেষাম্**—তাদের; **তৎ**—সেই; **ভবতি**—হয়; **অল্পমেধসাম্**—অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের; **দেবান্**—দেবতাগণকে; **দেবযজঃ**—দেবোপাসকগণ; **যান্তি**—প্রাপ্ত হন; **মৎ**—আমার; **ভক্তাঃ**—ভক্তগণ; **যান্তি**—প্রাপ্ত হন; **মাম্**—আমাকে; **অপি**—অবশ্যই।

গীতার গান

তারা দেবলোকে যায় অনিত্য সে ধাম ।
মোর ভক্ত মোর ধামে নিত্য পূর্ণকাম ॥
স্বল্পবুদ্ধি যার হয় সে বলে নিরাকার ।
জানে না তাহারা চিদ্ বিগ্রহ আমার ॥

অনুবাদ

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদের আরাধনা লব্ধ সেই ফল অস্থায়ী। দেবোপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, কিন্তু আমার ভক্তেরা আমার পরম ধাম প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার কোন কোন ভাষ্যকার বলেন যে, কোন দেব-দেবীর উপাসনা যে করে, সে-ও ভগবানের কাছে যেতে পারে, কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে যে, দেবোপাসকেরা সেই সমস্ত গ্রহলোকে যায়, যেখানে তাদের উপাসিত দেব-দেবীরা অধিষ্ঠিত। যেমন, সূর্যের উপাসকেরা সূর্যলোকে যায়, চন্দ্রের উপাসকেরা চন্দ্রলোকে যায়। তেমনই, কেউ যদি ইন্দ্রের মতো দেবতার উপাসনা করে, তা

হলে সে সেই বিশেষ দেবতার লোকে যেতে পারে। এমন নয় যে, যে-কোন দেব-দেবীর পূজা করলেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে পৌছানো যায়। এখানে সেই কথা অস্বীকার করা হয়েছে। ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসকেরা এই জড় জগতের ভিন্ন ভিন্ন গ্রহলোক প্রাপ্ত হয়, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত সরাসরিভাবে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ধামে গমন করেন।

এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যে, দেব-দেবীরা যদি ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হন, তা হলে তাদের পূজা করার মাধ্যমেও একই উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া উচিত। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, দেব-দেবীর উপাসকেরা অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন, তাই তারা জানে না দেহের কোন অংশে খাদ্য দিতে হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এত বোকা যে, তারা দাবি করে, ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্নভাবে খাবার দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেউ কি কান দিয়ে কিংবা চোখ দিয়ে দেহকে খাওয়াতে পারে? তারা জানে না যে, বিভিন্ন দেব-দেবীরা হচ্ছেন ভগবানের বিশ্বরূপের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং তাদের অজ্ঞতার ফলে তারা বিশ্বাস করে যে, ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীরা হচ্ছেন এক-একজন ভগবান এবং তাঁরা সকলেই ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বী।

দেব-দেবীরাই কেবল ভগবানের অংশ নন, সাধারণ জীবেরাও ভগবানের অংশ-বিশেষ। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণেরা হচ্ছে ভগবানের মস্তক, ক্ষত্রিয়েরা হচ্ছে তাঁর বাহু, বৈশ্যেরা তাঁর উদর, শূদ্রেরা হচ্ছে তাঁর পদ এবং তারা সকলেই এক-একটি বিশেষ কর্তব্য সম্পাদন করছে। মানুষ যে স্তরেই থাক না কেন, যদি সে বুঝতে পারে যে, দেব-দেবীরা ও সে নিজে ভগবানের অংশ-বিশেষ, তা হলে তার জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। আর এটি না বুঝতে পেরে সে যদি কোন বিশেষ দেবতার পূজা করে, তা হলে সে সেই দেবলোকে গমন করে। এটি সেই একই গন্তব্যস্থল নয়, যেখানে ভক্তেরা পৌছয়।

দেব-দেবীদের তুষ্ট করার ফলে যে বর লাভ হয়, তা ক্ষণস্থায়ী, কারণ এই জড় জগতের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দেব-দেবীরা, তাঁদের ধাম ও তাঁদের উপাসক সব কিছুই বিনাশশীল। তাই, এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, দেব-দেবীর পূজা করে যে ফল লাভ হয়, তা বিনাশশীল এবং অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরাই কেবল এই সমস্ত দেব-দেবীর পূজা করে থাকে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের সেবা করার ফলে সচ্চিদানন্দময় জীবন প্রাপ্ত হন। তিনি যা প্রাপ্ত হন, তা দেবোপাসকদের প্রাপ্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরমেশ্বর

ভগবান অসীম, তাঁর অনুগ্রহ অসীম এবং তাঁর করুণাও অসীম। তাই তাঁর শুদ্ধ ভক্তের উপর তাঁর যে করুণা বর্ষিত হয়, তা অসীম।

শ্লোক ২৪

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

অব্যক্তম্—অব্যক্ত; **ব্যক্তিম্**—ব্যক্তিত্ব; **আপন্নম্**—প্রাপ্ত; **মন্যন্তে**—মনে করে; **মাম্**—আমাকে; **অবুদ্ধয়ঃ**—বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণ; **পরম্**—পরম; **ভাবম্**—ভাব; **অজানন্তঃ**—না জেনে; **মম**—আমার; **অব্যয়ম্**—অব্যয়; **অনুত্তমম্**—সর্বোত্তম।

গীতার গান

সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠ হয় আমার শরীর ।
অব্যয় সচ্চিদানন্দ যাহা জানে সব ধীর ॥
আমি সূর্য সম নিত্য সনাতন ধাম ।
সবার নিকটে নহি দৃশ্য আত্মারাম ॥

অনুবাদ

বুদ্ধিহীন মানুষেরা, যারা আমাকে জানে না, মনে করে যে, আমি পূর্বে অব্যক্ত নির্বিশেষ ছিলাম, এখন ব্যক্তিত্ব পরিগ্রহ করেছি। তাদের অজ্ঞতার ফলে তারা আমার অব্যয় ও সর্বোত্তম পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয়।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে দেবোপাসকদের অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এখানে নির্বিশেষবাদীদেরও সেই রকম বুদ্ধিহীন বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বরূপে অর্জুনের সঙ্গে এখানে কথা বলছেন, অথচ নির্বিশেষবাদীরা এতই মূর্খ যে, অন্তিমে ভগবানের কোন রূপ নেই বলে তারা তর্ক করে। শ্রীরামানুজাচার্যের পরম্পরায় মহিমাময় ভগবদ্ভক্ত শ্রীযামুনাচার্য এই সম্পর্কে একটি অতি সমীচীন শ্লোক রচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ ।

প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্ ॥

"হে ভগবান! মহামুনি ব্যাসদেব, নারদ আদি ভক্তেরা তোমাকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জানেন। বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্র উপলব্ধির মাধ্যমে তোমার গুণ, রূপ, লীলা আদি সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় এবং জানতে পারা যায় যে, তুমিই পরমেশ্বর ভগবান। কিন্তু রজ ও তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত অভক্ত অসুরেরা কখনই তোমাকে জানতে পারে না, কারণ তোমার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে তারা সম্পূর্ণ অসমর্থ। এই ধরনের অভক্তেরা *বেদান্ত, উপনিষদ* আদি বৈদিক শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী হতে পারে, কিন্তু তাদের পক্ষে পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারা সম্ভব নয়।" (*স্তোত্ররত্ন* ১২)

ব্রহ্মসংহিতাতে বলা হয়েছে যে, কেবল *বেদান্ত* শাস্ত্র অধ্যয়ন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারা যায় না। ভগবানের কৃপার ফলেই কেবল তিনি যে পরম পুরুষোত্তম, সেই সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। তাই, এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, দেব-দেবীর উপাসকেরাই কেবল অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন নয়, যে সমস্ত অভক্ত *বেদান্ত* ও বৈদিক শাস্ত্র সম্বন্ধে তাদের কল্পনাপ্রসূত মতবাদ পোষণ করে এবং যাদের অন্তরে কৃষ্ণভাবনামৃতের লেশমাত্র নেই, তারাও অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং তাদের পক্ষে ভগবানের সবিশেষ রূপ অবগত হওয়া অসম্ভব। যারা মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবান নিরাকার, তাদের *অবুদ্ধয়ঃ* বলা হয়েছে অর্থাৎ এরা পরম-তত্ত্বের পরম রূপকে জানে না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে যে, অদ্বয়-জ্ঞানের সূচনা হয় নির্বিশেষ ব্রহ্ম থেকে, তারপর তা পরমাত্মার স্তরে উন্নীত হয়, কিন্তু পরম-তত্ত্বের শেষ কথা হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবান। আধুনিক যুগের নির্বিশেষবাদীরা বিশেষভাবে মূর্খ, কারণ তারা এমন কি তাদের পূর্বতন মহান আচার্য শঙ্করাচার্যের শিক্ষাও অনুসরণ করে না, যিনি বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। নির্বিশেষবাদীরা তাই পরমতত্ত্ব সম্পর্কে অবগত না হয়ে মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন দেবকী ও বসুদেবের সন্তান মাত্র, অথবা একজন রাজকুমার, অথবা একজন অত্যন্ত শক্তিশালী জীব মাত্র। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১১) ভগবান এই ভ্রান্ত ধারণার নিন্দা করে বলেছেন, *অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*—"অত্যন্ত মূঢ় লোকগুলিই কেবল আমাকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে আমাকে অবজ্ঞা করে।"

প্রকৃতপক্ষে, ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবা করে কৃষ্ণভাবনা অর্জন না করলে কখনই শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারা যায় না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/২৯)

এই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥

"হে ভগবান! আপনার শ্রীচরণ-কমলের কণামাত্রও কৃপা যে লাভ করতে পারে, সে আপনার মহান পুরুষত্বের উপলব্ধি অর্জন করতে পারে। কিন্তু যারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধির উদ্দেশ্যে কেবলই জল্পনা-কল্পনা করে, তারা বহু বছর ধরে বেদ অধ্যয়ন করতে থাকলেও আপনাকে জানতে সক্ষম হয় না।" কেবলমাত্র জল্পনা-কল্পনা আর বৈদিক শাস্ত্রের আলোচনার মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-লীলা আদি জানতে পারা যায় না। তাঁকে জানতে হলে অবশ্যই ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করতে হয়। কেউ যখন **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে /হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে** —এই মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে ভক্তিযোগ অনুশীলন শুরু করে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনামৃতে মগ্ন হয়, তখনই কেবল পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানা যায়। নির্বিশেষবাদী অভক্তেরা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ এই জড়া প্রকৃতির তৈরি এবং তাঁর শ্রীবিগ্রহ, লীলা আদি সবই মায়া। এই ধরনের নির্বিশেষবাদীদের বলা হয় মায়াবাদী। তারা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

বিংশতি শ্লোকে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ* —"কামনা-বাসনা দ্বারা যারা অন্ধ, তারাই বিভিন্ন দেব-দেবীর শরণাপন্ন হয়।" এটিও স্বীকৃত হয়েছে যে, ভগবানের পরম ধাম ছাড়াও বিভিন্ন দেব-দেবীর নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন গ্রহলোক আছে। ত্রয়োবিংশতিতম শ্লোকে বলা হয়েছে, *দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি*—দেব-দেবীর উপাসকেরা দেব-দেবীদের বিভিন্ন লোকে যায় এবং যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, তারা কৃষ্ণলোকে যায়। যদিও এই সব কিছুই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তবুও মূঢ় নির্বিশেষবাদীরা দাবি করে যে, ভগবান নিরাকার এবং তাঁর এই সমস্ত রূপ আরোপণ মাত্র। *গীতা* পড়ে কি কখনও মনে হয় যে, বিভিন্ন দেব-দেবী ও তাঁদের লোকগুলি নির্বিশেষ? তা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায় যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বিভিন্ন দেব-দেবীরা কেউই নির্বিশেষ নন। তাঁরা সকলেই সবিশেষ ব্যক্তি। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তাঁর নিজস্ব গ্রহধাম আছে এবং দেব-দেবীদেরও তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন গ্রহলোক আছে।

তাই অদ্বৈতবাদীদের মতবাদ এই যে, পরমতত্ত্ব নিরাকার এবং তাঁর রূপ কেবল আরোপণ মাত্র, তা সত্য বলে প্রমাণিত নয়। এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরম-তত্ত্বের সবিশেষ রূপ আরোপিত নয়। *ভগবদ্গীতা* থেকে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি যে, বিভিন্ন দেব-দেবীর ও ভগবানের রূপ একই সঙ্গে বিদ্যমান এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ সচ্চিদানন্দময়। *বেদেও* বার বার উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন *আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ* অর্থাৎ স্বভাবতই তিনি চিৎ-ঘনানন্দ এবং তিনি অনন্ত শুভ মঙ্গলময় গুণের আধার। *গীতাতে* ভগবান বলেছেন যে, যদিও তিনি অজ, তবুও তিনি আবির্ভূত হন। *গীতার* মাধ্যমে ভগবানের সম্বন্ধে এই সমস্ত তত্ত্ব আমরা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারি। মায়াবাদীরা যে মনে করে ভগবান নির্বিশেষ, সেটি আমাদের ধারণারও অতীত। *গীতার* মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, নির্বিশেষবাদীদের অদ্বৈতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, পরমতত্ত্ব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ আছে এবং ব্যক্তিত্ব আছে।

শ্লোক ২৫

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **প্রকাশঃ**—প্রকাশিত; **সর্বস্য**—সকলের কাছে; **যোগমায়া**—অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **সমাবৃতঃ**—আবৃত; **মূঢ়ঃ**—মূঢ়; **অয়ম্**—এই; **ন**—না; **অভিজানাতি**—জানতে পারে; **লোকঃ**—ব্যক্তিরা; **মাম্**—আমাকে; **অজম্**—জন্মরহিত; **অব্যয়ম্**—অব্যয়।

গীতার গান

উপরোক্ত মূঢ় লোক নাহি দেখে মোরে ।
আমি যে অব্যয় আত্মা অজর অমরে ॥

অনুবাদ

আমি মূঢ় ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদের কাছে কখনও প্রকাশিত হই না। তাদের কাছে আমি আমার অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকি। তাই, তারা আমার অজ ও অব্যয় স্বরূপকে জানতে পারে না।

তাৎপর্য

অনেক সময় অনেকে যুক্তি দেখায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন এ পৃথিবীতে ছিলেন, তখন তিনি সকলেরই গোচরীভূত ছিলেন, তা হলে এখন তিনি সবার সামনে প্রকট হন না কেন? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সকলের কাছে প্রকাশিত হননি। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই বসুন্ধরায় অবতরণ করেছিলেন, তখন কয়েকজন দুর্লভ মহাত্মাই কেবল তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জানতে পেরেছিলেন। কৌরব সভায়, যখন শিশুপাল সভার অধ্যক্ষরূপে শ্রীকৃষ্ণকে নির্বাচিত করণের বিরোধিতা করেন, তখন ভীষ্মদেব শ্রীকৃষ্ণকে সমর্থন করে তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে ঘোষণা করেন। সেই রকম পঞ্চপাণ্ডব আদি কিছু সংখ্যক মহাত্মাই কেবল তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে জানতে পেরেছিলেন, সকলে পারেনি। অভক্ত ও সাধারণ মানুষের কাছে তিনি প্রকাশিত হননি। তাই *ভগবদ্গীতাতে* শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তাঁর শুদ্ধ ভক্ত ছাড়া আর সকলেই তাঁকে তাদেরই মতো একজন বলে মনে করে। তিনি কেবল তাঁর ভক্তদেরই কাছে সমস্ত আনন্দের উৎসরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন অভক্তদের কাছে তিনি নিজেকে যোগমায়ার দ্বারা আবৃত করে রেখেছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৮/১৯) কুন্তীদেবী তাঁর প্রার্থনায় বলেছেন যে, ভগবান যোগমায়ার যবনিকার দ্বারা নিজেকে আবৃত করে রাখেন, তাই সাধারণ মানুষ তাঁকে জানতে পারে না। যোগমায়ার আবরণ সম্পর্কে *শ্রীঈশোপনিষদেও* (মন্ত্র ১৫) প্রতিপন্ন করা হয়েছে, যেখানে ভক্ত প্রার্থনা করছেন—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ ।
তৎ ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥

"হে ভগবান! তুমিই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিপালক। তোমাকে ভক্তি করাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তাই, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি যেন তুমি আমাকেও পালন কর। তোমার অপ্রাকৃত রূপ যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত। ব্রহ্মজ্যোতিই তোমার অন্তরঙ্গা শক্তির আবরণ। কৃপা করে তুমি তোমার এই জ্যোতির্ময় আবরণকে উন্মোচিত করে তোমার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের দর্শন দান কর।" ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ তাঁর চিন্ময়-শক্তি ব্রহ্মজ্যোতির দ্বারা আচ্ছাদিত এবং এই কারণেই অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন নির্বিশেষবাদীরা ভগবানকে দেখতে পায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও (১০/১৪/৭) ব্রহ্মা তাঁর প্রার্থনায় বলেছেন, "হে পরম পুরুষোত্তম

ভগবান! হে পরমাত্মন্! হে সমস্ত রহস্যের স্বামীন্! এই জগতে আপনার শক্তি ও লীলা কে হিসাব করতে পারে? আপনি সর্বদাই আপনার অন্তরঙ্গা শক্তির বিস্তার করছেন, তাই কেউই আপনাকে বুঝতে পারে না। বিদ্বান বৈজ্ঞানিকেরা ও পণ্ডিতেরা এই পৃথিবীর ও অন্যান্য গ্রহের সমস্ত অণু-পরমাণুর হিসাব করতে পারলেও, কিন্তু তবুও তারা কখনই তোমার অনন্ত শক্তির হিসাব করতে পারে না, যদিও তুমি সকলের সামনে বিদ্যমান।" পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেবল অজই নন, তিনি অব্যয়ও। তাঁর শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময় এবং তাঁর সমস্ত শক্তি অক্ষয় অব্যয়।

শ্লোক ২৬

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন ।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥

বেদ—জানি; **অহম্**—আমি; **সমতীতানি**—সম্পূর্ণরূপে অতীত; **বর্তমানানি**—বর্তমান; **চ**—এবং; **অর্জুন**—হে অর্জুন; **ভবিষ্যাণি**—ভবিষ্যৎ; **চ**—ও; **ভূতানি**—জীবসমূহ; **মাম্**—আমাকে; **তু**—কিন্তু; **বেদ**—জানে; **ন**—না; **কশ্চন**—কেউই।

গীতার গান

আমার আনন্দরূপ নিত্য অবস্থিতি ।
সে কারণে হে অর্জুন ত্রিকালবিধিতি ॥
বর্তমান ভবিষ্যৎ অথবা অতীত ।
সমস্ত কালের গতি আমাতে বিদিত ॥
কিন্তু মূঢ় লোক যারা নাহি জানে মোরে ।
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ বিদিত সংসারে ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! পরমেশ্বর ভগবানরূপে আমি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত। আমি সমস্ত জীব সম্বন্ধে জানি, কিন্তু আমাকে কেউ জানে না।

তাৎপর্য

ভগবানের রূপ নির্বিশেষ না সবিশেষ, সেই সম্বন্ধে এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। নির্বিশেষবাদীদের ধারণা অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের রূপ যদি মায়া হত তা হলে আর সমস্ত জীবের মতো তাঁরও দেহান্তর হত এবং তার ফলে তিনি তাঁর পূর্বজীবনের সব কথা ভুলে যেতেন। জড় শরীর-বিশিষ্ট কেউই তাঁর পূর্বজন্মের কথা মনে রাখতে পারে না এবং তার ভবিষ্যৎ জন্ম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারে না, তা ছাড়া তার বর্তমান জীবনের পরিণাম সম্পর্কেও পূর্বাভাস দিতে অক্ষম। অতএব সে তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞ। জড় জগতের কলুষ থেকে মুক্ত না হতে পারলে কেউই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবগত হতে পারে না।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে যাঁর তুলনা হয় না, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি পূর্ণরূপে জানেন অতীতে কি হয়েছিল, বর্তমানে কি হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও কি হবে। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোটি কোটি বছর আগে সূর্যদেব বিবস্বানকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা সম্পূর্ণরূপে তাঁর মনে আছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি জীব সম্বন্ধেই জানেন, কারণ তিনি পরমাত্মারূপে প্রতিটি জীবেরই অন্তরে বিরাজ করছেন। কিন্তু যদিও তিনি পরমাত্মারূপে প্রতিটি জীবের অন্তরে এবং এই জগতের অতীত ভগবৎ-ধামে ভগবৎ-স্বরূপে বিরাজ করছেন, তবুও অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা তাঁকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করতে পারলেও, পরমেশ্বর ভগবান বলে চিনতে পারে না। ভগবানের দিব্য শ্রীবিগ্রহ অবিনশ্বর ও নিত্য। ভগবান হচ্ছেন ঠিক সূর্যের মতো এবং মায়া একটি মেঘের মতো। জড় আকাশে আমরা দেখতে পাই যে, সূর্য আছে, মেঘ আছে ও গ্রহ-নক্ষত্র আছে। আমাদের সীমিত দৃষ্টির জন্যই আমরা মনে করি যে, সূর্য, চন্দ্র আদিকে মেঘ ঢেকে ফেলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র কখনই আচ্ছাদিত হয় না। তেমনই, মায়াও কখনই পরমেশ্বর ভগবানকে আচ্ছাদিত করতে পারে না। ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না। এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কয়েকজন দুর্লভ ব্যক্তি এই মানবজন্মে সিদ্ধি লাভের প্রয়াসী হয় এবং এই রকম হাজার হাজার সিদ্ধ-পুরুষের মধ্যে কোন একজন কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বত জানতে সক্ষম হন। এমন কি যদিও কেউ নির্বিশেষ ব্রহ্ম অথবা হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থিত পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত ব্যতীত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কখনই জানতে পারা যায় না।

শ্লোক ২৭

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥

ইচ্ছা—বাসনা; **দ্বেষ**—দ্বেষ; **সমুত্থেন**—উদ্ভূত; **দ্বন্দ্ব**—দ্বন্দ্ব; **মোহেন**—মোহের দ্বারা; **ভারত**—হে ভারত; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূতানি**—জীবসমূহ; **সম্মোহম্**—মোহাচ্ছন্ন; **সর্গে**—সৃষ্টির সময়ে; **যান্তি**—প্রাপ্ত হয়; **পরন্তপ**—হে শত্রু নিপাতকারী।

গীতার গান

দুর্ভাগা যে লোক সেই দ্বন্দ্বেতে মোহিত ।
ইচ্ছা দ্বেষ দ্বারা তারা সংসারে চালিত ॥
অতএব হে ভারত তারা জন্মকালে ।
পূর্বাপূর্ব সংস্কারের সর্বদা কবলে ॥

অনুবাদ

হে ভারত! হে পরন্তপ! ইচ্ছা ও দ্বেষ থেকে উদ্ভূত দ্বন্দ্বের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে সমস্ত জীব মোহাচ্ছন্ন হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

তাৎপর্য

জীবের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে যে, সে শুদ্ধ জ্ঞানময় ভগবানের নিত্য দাস। কেউ যখন মোহাচ্ছন্ন হয়ে এই শুদ্ধ জ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন সে মায়ার কবলিত হয় এবং পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না। মায়ার অভিব্যক্তি হয় ইচ্ছা, দ্বেষ আদি দ্বন্দ্বের মাধ্যমে। ইচ্ছা ও দ্বেষের প্রভাবেই অজ্ঞানী মানুষ ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায় এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হিংসা করতে শুরু করে। যাঁরা ইচ্ছা ও দ্বেষের মোহ অথবা কলুষ থেকে মুক্ত, ভগবানের সেই শুদ্ধ ভক্তেরা বুঝতে পারেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে এই জড় জগতে অবতীর্ণ হন, কিন্তু যারা দ্বন্দ্ব ও অজ্ঞানতার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন, তারা মনে করে যে, জড়া শক্তি থেকেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সৃষ্টি হয়। এটি তাদের দুর্ভাগ্য। এ ধরনের মোহাচ্ছন্ন মানুষেরা মান-অপমান, সুখ-দুঃখ, স্ত্রী-পুরুষ, ভাল-মন্দ আদির দ্বন্দ্বে প্রভাবান্বিত হয়ে মনে করে, "এই আমার স্ত্রী, এটি আমার বাড়ি, আমি এই বাড়ির মালিক। আমি এই স্ত্রীর স্বামী।" এটিই

হচ্ছে মোহের দ্বন্দ্ব। যারা এভাবেই দ্বন্দ্বের দ্বারা মোহিত, তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাই তারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারে না।

শ্লোক ২৮

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

যেষাম্—যে সমস্ত; **তু**—কিন্তু; **অন্তগতম্**—সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত; **পাপম্**—পাপ; **জনানাম্**—ব্যক্তিদের; **পুণ্য**—পুণ্য; **কর্মণাম্**—কর্মকারী; **তে**—তাঁরা; **দ্বন্দ্ব**—দ্বন্দ্ব; **মোহ**—মোহ; **নির্মুক্তাঃ**—বিমুক্ত; **ভজন্তে**—ভজনা করেন; **মাম্**—আমাকে; **দৃঢ়ব্রতাঃ**—দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে।

গীতার গান

নিষ্পাপ হয়েছে যারা পুণ্যকর্ম দ্বারা ।
দ্বন্দ্বমোহ হতে মুক্ত হয়েছে যাহারা ॥
তারা হয় দৃঢ়ব্রত ভজনে আমার ।
নির্ভয় তাহারা সব জিনিতে সংসার ॥

অনুবাদ

যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তির পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে এবং যাঁরা দ্বন্দ্বমোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন।

তাৎপর্য

যাঁরা অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হওয়ার যোগ্য, তাঁদের কথা এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যারা পাপী, নাস্তিক, মূঢ় ও প্রবঞ্চক, তাদের পক্ষে ইচ্ছা ও দ্বেষের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। যাঁরা ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করে জীবনকে অতিবাহিত করেছেন এবং যাঁরা পুণ্যকর্ম করে নিষ্পাপ হয়েছেন, তাঁরা ভগবানের শরণাগত হতে পারেন এবং ক্রমে ক্রমে পূর্ণজ্ঞান লাভ করে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারেন। তখন তাঁরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ধ্যানে ধীরে ধীরে সমাধিস্থ হতে পারেন। এটি হচ্ছে আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হওয়ার পন্থা। শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গের প্রভাবে কৃষ্ণভাবনায় এই উন্নত স্তর লাভ করা সম্ভব, কেন না মহান ভক্তদের সঙ্গের ফলে মানুষ মোহ থেকে উদ্ধার পেতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/৫/২) বলা হয়েছে যে, যদি কেউ জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, তাকে অবশ্যই ভগবদ্ভক্তের সেবা করতে হবে (*মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ*); কিন্তু বিষয়ী লোকদের সঙ্গের প্রভাবে মানুষ জড় অস্তিত্বের অন্ধতম প্রদেশের দিকে ধাবিত হয় (*তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্*)। ভগবানের অনুগত মহাভাগবতেরা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ, মোহাচ্ছন্ন মানুষদের উদ্ধার করবার জন্য এই পৃথিবী পর্যটন করেন। নির্বিশেষবাদীরা জানে না যে, ভগবানের নিত্য দাসরূপে তাঁদের স্বরূপ ভুলে যাওয়াই হচ্ছে ভগবানের আইন লঙ্ঘন করা। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত না হচ্ছে, ততক্ষণ সে পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না, অথবা দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে দিব্য ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত হতে পারে না।

শ্লোক ২৯

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে ।
তে ব্রহ্ম তদ্ বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ ॥

জরা—বার্ধক্য; **মরণ**—মৃত্যু; **মোক্ষায়**—মুক্তি লাভের জন্য; **মাম্**—আমাকে; **আশ্রিত্য**—আশ্রয় করে; **যতন্তি**—যত্ন করেন; **যে**—যাঁরা; **তে**—তাঁরা; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **তৎ**—সেই; **বিদুঃ**—জানতে পারেন; **কৃৎস্নম্**—সব কিছু; **অধ্যাত্মম্**—অধ্যাত্মতত্ত্ব; **কর্ম**—কর্মতত্ত্ব; **চ**—ও; **অখিলম্**—সম্পূর্ণরূপে।

গীতার গান

আমাকে আশ্রয় করি যে জন সংসারে ।
জরা মরণ মোক্ষের মার্গ সদা যত্ন করে ॥
সে যোগী জানে তত্ত্ব ব্রহ্ম পরমাত্মা ।
কিংবা কর্মগতি যাহা জানে সে ধর্মাত্মা ॥

অনুবাদ

যে সমস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি জরা ও মৃত্যু থেকে মুক্তি লাভের জন্য আমাকে আশ্রয় করে যত্ন করেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মভূত, কেন না তাঁরা অধ্যাত্মতত্ত্ব ও কর্মতত্ত্ব সব কিছু সম্পূর্ণরূপে অবগত।

তাৎপর্য

জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির দ্বারা এই জড় শরীর আক্রান্ত হয়, কিন্তু চিন্ময় দেহ কখনই এদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। চিন্ময় দেহের জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি নেই। তাই, কেউ যখন তার চিন্ময় দেহ ফিরে পায়, তখন সে ভগবানের নিত্য পার্ষদত্ব লাভ করে এবং ভগবানের নিত্য সেবায় নিযুক্ত হয়, তখন সে যথার্থই মুক্ত। *অহম্ ব্রহ্মাস্মি*—আমি ব্রহ্ম। কথিত আছে—প্রত্যেকের জানা উচিত যে, সে হচ্ছে ব্রহ্ম বা আত্মা। ভক্তিমার্গে ভগবানের সেবা করার মধ্যেও এই ব্রহ্মানুভূতির অবকাশ রয়েছে, যা এই শ্লোকে বলা হয়েছে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা *ব্রহ্মভূত* স্তরে অবস্থান করেন এবং তাঁরা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত সব কিছু সম্বন্ধেই অবগত।

ভগবৎ-সেবা পরায়ণ চার প্রকার অশুদ্ধ ভক্তের যখন অভীষ্ট সিদ্ধি হয় এবং ভগবানের অহৈতুকী কৃপার ফলে পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ হয়, তখন তারাও ভগবানের দিব্য সাহচর্য লাভ করে। কিন্তু যারা বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা করে, তারা কখনই পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য ধামে পৌঁছতে পারে না। এমন কি অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রহ্মজ্ঞানীরাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ধাম গোলোক বৃন্দাবনে পৌঁছতে পারে না। যাঁরা সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম করেন (*মাম্ আশ্রিত্য*), তাঁদেরই যথার্থ 'ব্রহ্ম' বলে অভিহিত করা যায়, কারণ, তাঁরা বাস্তবিকই কৃষ্ণলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার অভিলাষী। এই ধরনের ভক্তের শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, তাই তাঁরা বাস্তবিকই 'ব্রহ্ম'।

যাঁরা ভগবানের অর্চা বিগ্রহের উপাসনা করেন, অথবা জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য ভগবানের ধ্যান করেন, তাঁরাও ভগবানের কৃপার ফলে ব্রহ্ম, অধিভূত আদির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন। সেই কথা ভগবান পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ৩০

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

সাধিভূত—অধিভূত; **অধিদৈবম্**—অধিদৈব; **মাম্**—আমাকে; **সাধিযজ্ঞম্**—অধিযজ্ঞ সহ; **চ**—এবং; **যে**—যাঁরা; **বিদুঃ**—জানেন; **প্রয়াণকালে**—মৃত্যুর সময়; **অপি**—

এমন কি; **চ**—এবং; **মাম্**—আমাকে; **তে**—তাঁরা; **বিদুঃ**—জানেন; **যুক্তচেতসঃ**—আমাতে আসক্তচিত্ত।

গীতার গান

অধিভূত অধিদৈব কিংবা অধিযজ্ঞ ।
সেই সব তত্ত্বজ্ঞানে যারা হয় বিজ্ঞ ॥
তাহারাও প্রয়াণ সময়ে বুঝে মোরে ।
পরমাত্মার সালোক্য লাভ সেই করে ॥

অনুবাদ

যাঁরা অধিভূত-তত্ত্ব, অধিদৈব-তত্ত্ব ও অধিযজ্ঞ-তত্ত্ব সহ আমাকে পরমেশ্বর ভগবান বলে অবগত হন, তাঁরা আমাতে আসক্তচিত্ত, এমন কি মরণকালেও আমাকে জানতে পারেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে যে মানুষ ভগবানের সেবা করেন, তিনি কখনই পরমেশ্বর ভগবানকে পূর্ণরূপে উপলব্ধির পথ থেকে বিচ্যুত হন না। কৃষ্ণভাবনার অপ্রাকৃত সান্নিধ্য লাভ করার ফলে মানুষ বুঝতে পারে যে, ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জড় জগতের নিয়ন্তা, এমন কি বিভিন্ন দেব-দেবীরাও তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এভাবেই, অপ্রাকৃত সান্নিধ্য লাভ করার ফলে ধীরে ধীরে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি মানুষের বিশ্বাস দৃঢ় হয় এবং মৃত্যুর সময়েও এই ধরনের কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে ভোলেন না। স্বভাবতই তিনি ভগবানের কৃপা লাভ করে অনায়াসে ভগবানের অপ্রাকৃত ধাম গোলোক বৃন্দাবনে উন্নীত হন।

এই সপ্তম অধ্যায়ে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কিভাবে পূর্ণ কৃষ্ণচেতনা লাভ করা যায়। কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তির সান্নিধ্যের ফলেই কৃষ্ণভাবনা শুরু হয়। এই পারমার্থিক সঙ্গ লাভ করার ফলে সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গে সংযোগ হয় এবং তাঁর কৃপার ফলে জানতে পারা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। সেই সঙ্গে এটিও জানা যায় যে, স্বরূপত কৃষ্ণদাস হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে জীব শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যায় এবং জাগতিক কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সৎসঙ্গের প্রভাবে কৃষ্ণভাবনায় ক্রমান্বয়ে উন্নতি সাধন করার ফলে জীব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, কৃষ্ণকে ভুলে থাকার দরুন সে জড়া প্রকৃতির অনুশাসনে আবদ্ধ

হয়ে পড়েছে। সে আরও বুঝতে পারে যে, মনুষ্যজন্ম লাভ করার ফলে সে তার অন্তরে কৃষ্ণভাবনা বিকশিত করে তোলবার এক মহৎ সুযোগ লাভ করেছে এবং ভগবানের অহৈতুকী কৃপা লাভ করবার জন্য এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা উচিত।

এই অধ্যায়ে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে—আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মার জ্ঞান, জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির হাত থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় এবং ভগবানের আরাধনা। তবে, যিনি যথার্থ কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করেছেন, তিনি অন্য কোন পদ্ধতিকেই কোন রকম গুরুত্ব দেন না। তিনি কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হয়ে সর্বদাই ভগবানের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন এবং এভাবেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাসরূপে তাঁর স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন। সেই অবস্থায় তিনি শুদ্ধ ভক্তি সহকারে ভগবানের লীলা শ্রবণ ও কীর্তন করে মহানন্দ অনুভব করেন। তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে, এরই মাধ্যমে তাঁর পরম প্রাপ্তি সাধিত হবে। এই সুদৃঢ় বিশ্বাসকে বলা হয় 'দৃঢ়ব্রত'। এর থেকেই শুরু হয় ভক্তিযোগ বা অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবা। সমস্ত শাস্ত্রাদিতে এই কথা স্বীকৃত হয়েছে। *ভগবদ্গীতার* সপ্তম অধ্যায়ের সারমর্ম হচ্ছে এই সুদৃঢ় বিশ্বাস।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।
শুনে যদি শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—পরম-তত্ত্বের বিশেষ জ্ঞান বিষয়ক 'বিজ্ঞান-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়

অক্ষরব্রহ্ম-যোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ

কিং তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম ।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; **কিম্**—কি; **তৎ**—সেই; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **কিম্**—কি; **অধ্যাত্মম্**—আত্মা; **কিম্**—কি; **কর্ম**—কর্ম; **পুরুষোত্তম**—হে পুরুষোত্তম; **অধিভূতম্**—জড়-জাগতিক প্রকাশ; **চ**—এবং; **কিম্**—কি; **প্রোক্তম্**—বলা হয়; **অধিদৈবম্**—দেবতাগণ; **কিম্**—কি; **উচ্যতে**—বলা হয়।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

ব্রহ্ম কিংবা অধ্যাত্ম কি কর্ম পুরুষোত্তম ।
অধিভূত অধিদৈব কহ তার ক্রম ॥

অনুবাদ

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম কি? অধিভূত ও অধিদৈবই বা কাকে বলে? অনুগ্রহপূর্বক আমাকে স্পষ্ট করে বল।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মতত্ত্ব থেকে শুরু করে অর্জুনের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি এখানে কর্ম, সকাম কর্ম, ভক্তিযোগ, যোগের পন্থা ও শুদ্ধ ভক্তির ব্যাখ্যা করেছেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান, এই নামে অভিহিত হন। তা ছাড়া, স্বতন্ত্র জীবাত্মাকেও ব্রহ্ম বলা হয়। অর্জুন ভগবানের কাছে আত্মা সম্বন্ধেও প্রশ্ন করেন। *আত্মা* বলতে দেহ, আত্মা ও মনকে বোঝায়। বৈদিক অভিধান অনুসারে *আত্মা* বলতে মন, আত্মা, দেহ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে বোঝায়।

অর্জুন এখানে ভগবানকে *পুরুষোত্তম* বলে সম্বোধন করেছেন, অর্থাৎ এই প্রশ্নগুলি তিনি শুধু মাত্র এক বন্ধুকে করছেন তা নয়, তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান জেনে তিনি এই প্রশ্নগুলি করেছেন, যিনি সেই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দানে পরম অধিকর্তা।

শ্লোক ২

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্মধুসূদন ।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥

অধিযজ্ঞঃ—যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা; **কথম্**—কিভাবে; **কঃ**—কে; **অত্র**—এখানে; **দেহে**—শরীরে; **অস্মিন্**—এই; **মধুসূদন**—হে মধুসূদন; **প্রয়াণকালে**—মৃত্যুর সময়; **চ**—এবং; **কথম্**—কিভাবে; **জ্ঞেয়ঃ**—জ্ঞাত; **অসি**—হও; **নিয়তাত্মভিঃ**—আত্মসংযমীর দ্বারা।

গীতার গান

অধিযজ্ঞ কিবা সেই হে মধুসূদন ।
কিভাবে তোমাকে পায় প্রয়াণ যখন ॥

অনুবাদ

হে মধুসূদন! এই দেহে অধিযজ্ঞ কে, এবং এই দেহের মধ্যে তিনি কিরূপে অবস্থিত? মৃত্যুকালে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা কিভাবে তোমাকে জানতে পারেন?

তাৎপর্য

শ্রীবিষ্ণু ও ইন্দ্র উভয়কেই যজ্ঞের অধীশ্বররূপে গণ্য করা হয়। শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত মুখ্য দেবতাদের, এমন কি ব্রহ্মা ও শিবেরও অধীশ্বর এবং যে সমস্ত দেব-

দেবী প্রকৃতির পরিচালনা কার্যে সহায়তা করেন, ইন্দ্র তাঁদের মধ্যে প্রধান দেবতা। যজ্ঞ অনুষ্ঠানে শ্রীবিষ্ণু ও ইন্দ্র উভয়েরই উপাসনা করা হয়। কিন্তু এখানে অর্জুন জিজ্ঞাসা করছেন যে, যজ্ঞের প্রকৃত অধীশ্বর কে এবং কিভাবে তিনি জীবের দেহে অবস্থান করেন।

অর্জুন এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মধুসূদন নামে সম্বোধন করেছেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ একদা মধু নামক এক অসুরকে সংহার করেছিলেন। অর্জুন কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্ত, তাই তাঁর মনে এই সমস্ত সংশয়জনক প্রশ্নের উদয় হওয়া উচিত নয়। সুতরাং অর্জুনের মনের এই সংশয়গুলি অসুরের মতো; আর শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু অসুর সংহার করার ব্যাপারে অত্যন্ত পারদর্শী, তাই অর্জুন তাঁকে মধুসূদন নামে সম্বোধন করেছেন, যাতে তিনি তাঁর মনের সমস্ত আসুরিক সন্দেহগুলি সমূলে বিনাশ করেন।

এই শ্লোকে *প্রয়াণকালে* কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, আমাদের সারা জীবনে আমরা যা কিছুই করি, তার পরীক্ষা হয় আমাদের মৃত্যুর সময়। অর্জুনের মনে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে যে, মৃত্যুর সময় কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানের কথা স্মরণ করতে পারেন কি না, কারণ মৃত্যুর সময় দেহের সমস্ত ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং মন তখন স্বাভাবিক অবস্থায় নাও থাকতে পারে। এভাবেই দেহের অস্বাভাবিক অবস্থায় বিচলিত হয়ে, তখন পরমেশ্বরকে স্মরণ করা সম্ভব না-ও হতে পারে। তাই, মহাভাগবত মহারাজ কুলশেখর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, "হে ভগবান! আমার শরীর এখন সুস্থ এবং এখনই যেন আমার মৃত্যু হয়, যাতে আমার মনরূপী রাজহংস তোমার শ্রীচরণ-কমল লতায় আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।" এখানে এই উপমার অবতারণা করা হয়েছে, কারণ রাজহংস যেমন কমল-কর্ণিকায় প্রবেশ করে আনন্দিত হয়, তেমনই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের মনরূপী রাজহংস ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। মহারাজ কুলশেখর পরমেশ্বরকে জানাচ্ছেন, "এখন আমার মন অবিচলিত রয়েছে, আর আমি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছি। যদি আমি এখনই তোমার চরণপদ্ম স্মরণ করে মৃত্যু বরণ করি, তা হলে আমি নিশ্চিত হব যে, তোমার প্রতি আমার প্রেমভক্তি সার্থকতা লাভ করবে। কিন্তু যদি আমার স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হয়, তা হলে কি যে ঘটবে তা আমি জানি না, কারণ সেই সময়ে আমার শারীরিক ক্রিয়াকলাপ বিঘ্নিত হবে, আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাবে, আর তাই, আমি জানি না, আমি তোমার নাম জপ করতে পারব কি না। তাই, এখনই এই মুহূর্তে আমার মৃত্যু হোক।" অর্জুন তাই প্রশ্ন করছেন—মৃত্যুর সময় কিভাবে মনকে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে একাগ্র রাখা যায়।

শ্লোক ৩

শ্রীভগবানুবাচ
অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে ।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **অক্ষরম্**—বিনাশ-রহিত; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **পরমম্**—পরম; **স্বভাবঃ**—নিত্য স্বভাব; **অধ্যাত্মম্**—অধ্যাত্ম; **উচ্যতে**—বলা হয়; **ভূতভাবোদ্ভবকরঃ**—জীবের জড় দেহের উৎপত্তিকর; **বিসর্গঃ**—সৃষ্টি; **কর্ম**—কর্ম; **সংজ্ঞিতঃ**—কথিত হয়।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ
অক্ষয় বিনাশ নাহি অতএব ব্রহ্ম ।
আমি ভগবান সেজন্য পরম-ব্রহ্ম ॥
পরমাত্মা আর যে ভগবান ।
সেই যে পরমতত্ত্ব সেই ব্রহ্মজ্ঞান ॥
কর্ম সে কারণ জড় শরীর বিসর্গ ।
ভূতোদ্ভব যার নাম শুন তার বর্গ ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—নিত্য বিনাশ-রহিত জীবকে বলা হয় ব্রহ্ম এবং তার নিত্য স্বভাবকে অধ্যাত্ম বলে। ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিকর সংসারই কর্ম।

তাৎপর্য

ব্রহ্ম অবিনশ্বর, নিত্য শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু এই ব্রহ্মেরও অতীত হচ্ছে পরব্রহ্ম। ব্রহ্ম বলতে জীবকে বোঝায় এবং পরব্রহ্ম বলতে পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানকে বোঝায়। জীবের স্বরূপ জড় জগতে তার যে স্থিতি তার থেকে ভিন্ন। জড় চেতনায় জীব জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায়। কিন্তু পারমার্থিক কৃষ্ণভাবনায় তার স্থিতি হচ্ছে নিরন্তর ভগবানের সেবা করা। জীব যখন জড় চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তখন তাকে জড় জগতে নানা রকম দেহ

ধারণ করতে হয়। তাকে বলা হয় কর্ম, অর্থাৎ জড় চেতনার প্রভাবে উৎপন্ন নানাবিধ সৃষ্টি।

বৈদিক সাহিত্যে জীবকে বলা হয় জীবাত্মা ও ব্রহ্ম, কিন্তু কখনই তাকে পরব্রহ্ম বলা হয় না। জীবাত্মা বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হয়—কখনও সে অন্ধকারাচ্ছন্ন জড়া প্রকৃতিতে পতিত হয়ে নিজেকে সে জড় পদার্থ বলে মনে করে, আবার কখনও সে নিজেকে উৎকৃষ্ট, পরা প্রকৃতির অন্তর্গত বলে মনে করে। তাই, তাকে ভগবানের তটস্থা শক্তি বলে বর্ণনা করা হয়। অপরা ও পরা প্রকৃতিতে তার স্থিতি অনুসারে সে পঞ্চভৌতিক জড় দেহ অথবা চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হয়। সে যখন নিজেকে জড় পদার্থ বলে মনে করে জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ থাকে, তখন সে চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন শরীরের কোনও একটি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পরা প্রকৃতিতে তার রূপ একটি। জড়া প্রকৃতিতে সে তার কর্ম অনুসারে মানুষ, দেবতা, পশু, পাখি আদির শরীর প্রাপ্ত হয়। স্বর্গলোকে নানা রকম সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করার জন্য সে কখনও কখনও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে, কিন্তু তার সেই পুণ্য-কর্মফলগুলি যখন শেষ হয়ে যায়, তখন সে এই পৃথিবীতে পতিত হয়ে আবার মনুষ্যদেহ ধারণ করে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় কর্ম।

ছান্দোগ্য উপনিষদে বৈদিক যাগযজ্ঞের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। যজ্ঞের বেদিতে পাঁচ রকমের অগ্নিকুণ্ডে পাঁচ রকমের অর্ঘ্য দান করা হয়। পঞ্চবিধ অগ্নিকুণ্ডকে বিভিন্ন স্বর্গলোক, মেঘ, পৃথিবী, নর ও নারীরূপে ধারণা করা হয় এবং পঞ্চবিধ যাজ্ঞিক অর্ঘ্যগুলি হচ্ছে বিশ্বাস, চন্দ্রলোকের ভোক্তা, বৃষ্টি, শস্য ও বীর্য।

বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে জীবাত্মা বিভিন্ন স্বর্গলোকে গমন করতে পারে। তারপর সেই যজ্ঞের ফলে অর্জিত পুণ্য-কর্মফল যখন শেষ হয়ে যায়, তখন সে বৃষ্টির মাধ্যমে এই পৃথিবীতে পতিত হয়, তারপর সে শস্যকণায় পরিণত হয়। মানুষ সেই শস্য আহার করে এবং তা বীর্যে পরিণত হয়, তারপর সেই বীর্য স্ত্রীযোনিতে সঞ্চারিত হয়ে গর্ভবতী করে। এভাবেই জীবাত্মা আবার মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়ে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। এভাবেই জীব প্রতিনিয়ত এই জড় জগতে গমনাগমন করতে থাকে। কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্ত অবশ্য এই ধরনের যজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিহার করেন। তিনি সরাসরিভাবে কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন এবং ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার আয়োজন করেন।

নির্বিশেষবাদীরা অযৌক্তিকভাবে *গীতার* ব্যাখ্যা করে অনুমান করে যে, ব্রহ্ম জড় জগতে জীবরূপ ধারণ করে এবং তার প্রমাণস্বরূপ তারা *গীতার* পঞ্চদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকের অবতারণা করে। কিন্তু এই শ্লোকে জীবাত্মা সম্পর্কে পরমেশ্বর এই কথাও বলেছেন যে, "আমারই নিত্য ভিন্ন অংশ"। ভগবানের

অণুসদৃশ অংশ জীবাত্মা জড় জগতে পতিত হতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান (অচ্যুত) কখনও পতিত হন না। তাই পরমব্রহ্ম জীবে পরিণত হন এই অনুমান গ্রহণযোগ্য নয়। বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্ম (জীবাত্মা) ও পরম-ব্রহ্মকে (পরমেশ্বরকে) কখনই এক বলে বর্ণনা করা হয়নি, সেই কথা আমাদের মনে রাখা উচিত।

শ্লোক ৪

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ ।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪ ॥

অধিভূতম্—অধিভূত; **ক্ষরঃ**—নিয়ত পরিবর্তনশীল; **ভাবঃ**—ভাব; **পুরুষঃ**—সূর্য, চন্দ্র আদি সমস্ত দেবতাদের সমষ্টিরূপ বিরাট পুরুষ; **চ**—এবং; **অধিদৈবতম্**—অধিদৈব বলা হয়; **অধিযজ্ঞঃ**—পরমাত্মা; **অহম্**—আমি (শ্রীকৃষ্ণ); **এব**—অবশ্যই; **অত্র**—এই; **দেহে**—শরীরে; **দেহভৃতাম্**—দেহধারীদের মধ্যে; **বর**—শ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

পদার্থ যে অধিভূত ক্ষর ভাব নাম ।
বিরাট পুরুষ সেই অধিদৈব নাম ॥
অন্তর্যামী আমি সেই অধিযজ্ঞ নাম ।
যত দেহী আছে তার হৃদে মোর ধাম ॥

অনুবাদ

হে দেহধারীশ্রেষ্ঠ! নশ্বর জড়া প্রকৃতি অধিভূত। সূর্য, চন্দ্র আদি সমস্ত দেবতাদের সমষ্টিরূপ বিরাট পুরুষকে অধিদৈব বলা হয়। আর দেহীদের দেহান্তর্গত অন্তর্যামী রূপে আমিই অধিযজ্ঞ।

তাৎপর্য

প্রতিনিয়তই প্রকৃতির পরিবর্তন হচ্ছে। জড় শরীর সাধারণত ছয়টি অবস্থা প্রাপ্ত হয়—তার জন্ম হয়, বৃদ্ধি হয়, কিছুকালের জন্য স্থায়ী হয়, প্রজনন করে, ক্ষীণ হয় এবং অবশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই জড়া প্রকৃতিকে বলা হয় *অধিভূত*। এক সময় এর সৃষ্টি হয় এবং কোন এক সময় এর বিনাশ হয়। ভগবানের বিশ্বরূপ, যাতে সমস্ত দেব-দেবীরা ও তাঁদের নিজস্ব লোকসমূহ অবস্থিত, তাকে বলা হয়

অধিদৈবত। শ্রীকৃষ্ণের আংশিক প্রকাশ পরমাত্মা, যিনি অন্তর্যামীরূপে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তাঁকে বলা হয় *অধিযজ্ঞ*। এই শ্লোকের *এব* শব্দটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই শব্দটির দ্বারা ভগবান এখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করছেন যে, এই পরমাত্মা তাঁর থেকে অভিন্ন। পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি জীবের সঙ্গে থেকে তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে চলেন এবং তিনি হচ্ছেন তাদের বিবিধ চেতনার উৎস। পরমাত্মা জীবকে স্বাধীনভাবে কর্ম করার সুযোগ দেন এবং তার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন। ভগবানের এই সমস্ত বিভিন্ন প্রকারের তত্ত্ব কৃষ্ণভাবনাময় ভগবৎ-সেবা পরায়ণ শুদ্ধ ভক্তের কাছে আপনা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভগবদ্ভক্তির প্রাথমিক স্তরে কনিষ্ঠ ভক্ত *অধিদৈবত* নামক ভগবানের সুমহান বিশ্বরূপের ধ্যান করে, কারণ তখন সে ভগবানের পরমাত্মা রূপকে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই, কনিষ্ঠ ভক্তকে ভগবানের বিশ্বরূপের অথবা বিরাট পুরুষের ধ্যান করতে উপদেশ দেওয়া হয়, যাঁর পদদ্বয় হচ্ছে পাতাললোক, যাঁর চক্ষুদ্বয় হচ্ছে সূর্য ও চন্দ্র এবং যাঁর মস্তক হচ্ছে ঊর্ধ্বলোক।

শ্লোক ৫

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

অন্তকালে—অন্তিম সময়ে; **চ**—ও; **মাম্**—আমাকে; **এব**—অবশ্যই; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **মুক্ত্বা**—ত্যাগ করে; **কলেবরম্**—দেহ; **যঃ**—যিনি; **প্রয়াতি**—প্রয়াণ করেন; **সঃ**—তিনি; **মদ্ভাবম্**—আমার স্বভাব; **যাতি**—লাভ করেন; **নাস্তি**—নেই; **অত্র**—এখানে; **সংশয়ঃ**—সন্দেহ।

গীতার গান

অতএব অন্তকালে আমারে স্মরিয়া ।
যেবা চলি যায় এই শরীর ছাড়িয়া ॥
সে পায় আমার ভাব অমর সে হয় ।
নিশ্চয়ই কহিনু এই নাহিত সংশয় ॥

অনুবাদ

মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ভাবই প্রাপ্ত হন। এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে কৃষ্ণভাবনামৃতের গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে দেহত্যাগ করলে তৎক্ষণাৎ ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করা যায়। পরমেশ্বর ভগবান সকল শুদ্ধ সত্তার মধ্যে শুদ্ধতম। সুতরাং, নিরন্তর কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকলে শুদ্ধ সত্তার মধ্যে শুদ্ধতম হয়ে ওঠা যায়। এখানে *স্মরন্* শব্দটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে সমস্ত জীবেরা অশুদ্ধ, যারা কখনও ভগবদ্ভক্তি সাধন করেনি, তাদের পক্ষে ভগবানকে স্মরণ করা সম্ভব নয়। তাই, জীবনের সূচনা থেকেই কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন করা উচিত। জীবনের শেষে সার্থকতা অর্জন করতে হলে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ অপরিহার্য। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণকে মনে রাখতে হলে সর্বক্ষণ অবিরামভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে** কীর্তন করতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়েছেন যে, প্রত্যেকের তরুর মতো সহিষ্ণু হওয়া উচিত (*তরোরিব সহিষ্ণুনা*)। যে ব্যক্তি হরে কৃষ্ণ কীর্তন করবেন, তাঁর অনেক রকম বাধাবিঘ্ন আসতে পারে। তা সত্ত্বেও, এই সমস্ত বাধা-বিঘ্নগুলিকে সহ্য করে তাঁকে অনবরত **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—কীর্তন করে যেতে হবে, যাতে জীবনের অন্তিমকালে তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতের পূর্ণ সুফল লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ৬

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

যম্ যম্—যেমন যেমন; **বা**—বা; **অপি**—ও; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **ভাবম্**—ভাব; **ত্যজতি**—ত্যাগ করেন; **অন্তে**—অন্তিমকালে; **কলেবরম্**—দেহ; **তম্ তম্**—সেই সেই; **এব**—অবশ্যই; **এতি**—প্রাপ্ত হন; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **সদা**—সর্বদা; **তৎ**—সেই; **ভাব**—ভাব; **ভাবিতঃ**—তন্ময়চিত্ত।

গীতার গান

যে যেই স্মরণ করে জীব অন্তকালে ।
যেভাবে সে ত্যাজে নিজ জড় কলেবরে ॥

সেই সেই ভাবযুক্ত তত্ত্ব লাভ করে ।
হে কৌন্তেয়! থাকি সদা সেই ভাব ঘরে ॥

অনুবাদ

অন্তিমকালে যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাবে ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন।

তাৎপর্য

মৃত্যুর সংকটময় মুহূর্তে কিভাবে জীবের প্রকৃতির পরিবর্তন হয়, সেই কথা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যে মানুষ দেহত্যাগ করবার সময়ে কৃষ্ণচিন্তা করে, সে পরমেশ্বর ভগবানের পরা প্রকৃতি অর্জন করে। কিন্তু এই কথা ঠিক নয় যে, শ্রীকৃষ্ণবিহীন অন্য কিছু চিন্তা করলেও সেই পরা প্রকৃতি অর্জন করা যায়। এই বিষয়টি আমাদের বিশেষ যত্ন সহকারে অনুধাবন করতে হবে। কিভাবে উপযুক্ত মনোভাবে আবিষ্ট হয়ে দেহত্যাগ করা যায়? এক মহান ব্যক্তি হয়েও মৃত্যুর সময় মহারাজ ভরত হরিণের কথা চিন্তা করেছিলেন, তাই তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি হরিণ-শরীর প্রাপ্ত হন। হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও মহারাজ ভরত তাঁর পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তাঁকে পশুর শরীর গ্রহণ করতে হয়েছিল। স্বভাবতই, জীবিত অবস্থায় আমরা যে সমস্ত চিন্তা করে থাকি, সেই অনুযায়ী আমাদের মৃত্যুকালীন চিন্তার উদয় হয়। সুতরাং, এই জীবনই সৃষ্টি করে আমাদের পরবর্তী জীবন। কেউ যদি সর্বক্ষণ শুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবে জীবন যাপন করেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবায় ও চিন্তায় মগ্ন থাকেন, তা হলে তাঁর পক্ষে জীবনের অন্তিমকালে কৃষ্ণচিন্তা করা সম্ভব। সেটিই তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের পরা প্রকৃতিতে স্থানান্তরিত করতে সাহায্য করবে। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবায় মগ্ন হয়ে থাকলে, পরবর্তী জীবনে অপ্রাকৃত শরীর ধারণের সৌভাগ্য অর্জিত হয়। তাঁকে আর জড় দেহ ধারণ করতে হয় না। তাই, **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—এই মহামন্ত্র কীর্তন করাই হচ্ছে জীবনের অন্তিমকালে ভাব পরিবর্তনের সফলতম শ্রেষ্ঠ উপায়।

শ্লোক ৭

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **সর্বেষু**—সব; **কালেষু**—সময়ে; **মাম্**—আমাকে; **অনুস্মর**—স্মরণ করে; **যুধ্য**—যুদ্ধ কর; **চ**—ও; **ময়ি**—আমাতে; **অর্পিত**—সমর্পিত হলে; **মনঃ**—মন; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **মাম্**—আমাকে; **এব**—অবশ্যই; **এষ্যসি**—পাবে; **অসংশয়ঃ**—নিঃসন্দেহে।

গীতার গান

অতএব তুমি সদা আমাকে স্মরিবে ।
কায়মন বুদ্ধি সব আমাকে অর্পিবে ॥
সেভাবে থাকিলে মোরে পাইবে নিশ্চয় ।
আমাতে অর্পিত মন যদি অসংশয় ॥

অনুবাদ

অতএব, হে অর্জুন! সর্বদা আমাকে স্মরণ করে তোমার স্বভাব বিহিত যুদ্ধ কর, তা হলে আমাতে তোমার মন ও বুদ্ধি অর্পিত হবে এবং নিঃসন্দেহে তুমি আমাকেই লাভ করবে।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা জড়-জাগতিক কার্যকলাপে নিয়োজিত প্রতিটি মানুষের পক্ষেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভগবান বলছেন না যে, মানুষকে তার কর্তব্যকর্ম পরিত্যাগ করতে হবে। মানুষ তার নিজের কর্তব্যকর্ম করে যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারে। তার ফলে সে জড়-জাগতিক কলুষতা থেকে মুক্ত হতে পারে এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে তার মন ও বুদ্ধিকে নিয়োজিত করতে পারে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করার ফলে জীব নিঃসন্দেহে পরম ধাম কৃষ্ণলোকে উত্তীর্ণ হবে।

শ্লোক ৮

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা ।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

অভ্যাস—অভ্যাস; **যোগযুক্তেন**—যোগে যুক্ত হয়ে; **চেতসা**—মন ও বুদ্ধির দ্বারা; **ন অন্যগামিনা**—অনন্যগামী; **পরমম্**—পরম; **পুরুষম্**—পুরুষকে; **দিব্যম্**—দিব্য; **যাতি**—প্রাপ্ত হন; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **অনুচিন্তয়ন্**—অনুক্ষণ চিন্তা করে।

গীতার গান

কঠিন নহে ত এই অভ্যাস করিলে ।
মনকে অন্যত্র সদা নাহি যেতে দিলে ॥
হে পার্থ সেভাবে চিন্তি পরম পুরুষে ।
নিশ্চয়ই পাইবে তুমি দেহ অবশেষে ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! অভ্যাস যোগে যুক্ত হয়ে অনন্যগামী চিত্তে যিনি অনুক্ষণ পরম পুরুষের চিন্তা করেন, তিনি অবশ্যই তাঁকেই প্রাপ্ত হবেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে স্মরণ করার গুরুত্ব প্রতিপন্ন করেছেন। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি পুনর্জাগরিত হয়। এভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের নাম সমন্বিত অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ শ্রবণ ও কীর্তন করার মাধ্যমে আমাদের কান, জিভ ও মন ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়। এভাবেই ভগবানের দিব্য নাম আশ্রয় করে তাঁর ধ্যান করা অত্যন্ত সহজ এবং তা করার ফলে আমরা ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারি। *পুরুষম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভোক্তা। জীব যদিও ভগবানের তটস্থা শক্তিজাত, কিন্তু সে জড় কলুষের দ্বারা আচ্ছন্ন। তাই সে নিজেকে ভোক্তা মনে করে, কিন্তু সে কখনই পরম ভোক্তা হতে পারে না। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে যে, নারায়ণ, বাসুদেব আদি বিভিন্ন স্বাংশ প্রকাশ রূপে পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন পরম ভোক্তা।

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে ভগবদ্ভক্ত তাঁর আরাধ্য ভগবানের শ্রীনারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম আদি যে কোন একটি রূপকে নিরন্তর স্মরণ করতে পারেন। এই অনুশীলনের ফলে তাঁর অন্তর কলুষমুক্ত হয়ে পবিত্র হয় এবং জীবনের অন্তিমকালে সতত কীর্তন করার প্রভাবে তিনি ভগবৎ-ধামে স্থানান্তরিত হন। যোগ অনুশীলন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের অন্তঃস্থিত পরমাত্মার ধ্যান করা। তেমনই, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে মন পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণ-কমলে আবিষ্ট হয়। মন চঞ্চল, তাই তাকে জোর করে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় নিয়োজিত করতে হয়।

এই সম্পর্কে শুঁয়াপোকার উদাহরণের অবতারণা করা হয়, যে সর্বক্ষণ প্রজাপতি হওয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে, সেই জীবনেই প্রজাপতিতে রূপান্তিত হয়। সেই রকম, আমরাও যদি সর্বক্ষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করি, তবে আমরাও নিঃসন্দেহে এই জীবনের শেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই মতো চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হব।

শ্লোক ৯

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥

কবিম্—সর্বজ্ঞ; **পুরাণম্**—অনাদি; **অনুশাসিতারম্**—নিয়ন্তা; **অণোঃ**—সূক্ষ্ম থেকে; **অণীয়াংসম্**—সূক্ষ্মতর; **অনুস্মরেৎ**—নিরন্তর স্মরণ করেন; **যঃ**—যিনি; **সর্বস্য**—সব কিছুর; **ধাতারম্**—বিধাতা; **অচিন্ত্য**—অচিন্ত্য; **রূপম্**—রূপ; **আদিত্যবর্ণম্**—সূর্যের মতো জ্যোতির্ময়; **তমসঃ**—অন্ধকারের; **পরস্তাৎ**—অতীত।

গীতার গান

পরম পুরুষ ধ্যান, শুনহ তাহার জ্ঞান,
সর্বজ্ঞ তিনি সে সনাতন ।
নিয়ন্তা সে অতি সূক্ষ্ম, বিধাতা সে অন্তরীক্ষ,
অগোচর জড় বুদ্ধি মন ॥
যে জন স্মরণ করে, নিত্য সেই পুরুষেরে,
আদিত্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ ।
প্রকৃতির পরপারে, যে জানে সে বিধাতারে,
স্বরাট তিনি চিদ্ বিলাস ॥

অনুবাদ

সর্বজ্ঞ, সনাতন, নিয়ন্তা, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, সকলের বিধাতা, জড় বুদ্ধির অতীত, অচিন্ত্য ও পুরুষরূপে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করা উচিত। তিনি সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় এবং এই জড়া প্রকৃতির অতীত।

তাৎপর্য

কিভাবে ভগবানের কথা চিন্তা করতে হয়, সেই কথা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রথম কথা হচ্ছে যে, তিনি নির্বিশেষ বা শূন্য নন। নির্বিশেষ অথবা শূন্যের ধ্যান করা যায় না। সেটি অত্যন্ত কঠিন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করার পন্থা খুবই সহজ এবং এখানে বাস্তব-সম্মত ভাবেই তা বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বপ্রথমে জানতে হবে যে, ভগবান হচ্ছেন 'পুরুষ' বা একজন ব্যক্তি—আমরা পুরুষ রাম ও পুরুষ কৃষ্ণের চিন্তা করি। তাঁকে শ্রীরাম অথবা শ্রীকৃষ্ণ যেভাবেই চিন্তা করি, তাঁর রূপ কেমন, *ভগবদ্গীতার* এই শ্লোকটিতে তারই বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ভগবানকে *কবি* বলা হয়েছে, তার মানে তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব কিছুই জানেন। তিনি হচ্ছেন আদিপুরুষ, কারণ তিনি হচ্ছেন সব কিছুর উৎস, সব কিছুই তাঁর থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তিনি সমস্ত জগতের পরম নিয়ন্তা, পালনকর্তা এবং সমগ্র মানব-সমাজের উপদেষ্টা। তিনি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর। জীবাত্মার আয়তন হচ্ছে কেশের অগ্রভাগের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ, কিন্তু ভগবান এমনই সূক্ষ্ম যে, তিনি সেই জীবাত্মারও অন্তরে প্রবেশ করেন। তাই, তাঁকে সূক্ষ্মতম থেকেও সূক্ষ্মতর বলা হয়। পরমেশ্বর ভগবান রূপে তিনি পরমাণুর মধ্যে প্রবেশ করেন, অণুসদৃশ জীবের অন্তরে প্রবেশ করেন এবং পরমাত্মারূপে তাদের পরিচালিত করেন। যদিও তিনি সূক্ষ্ম, তবুও তিনি সর্বব্যাপ্ত এবং তিনিই সব কিছুর পালনকর্তা। তাঁরই পরিচালনায় জড় জগতের অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রগুলি পরিচালিত হচ্ছে। আমরা প্রায়ই অবাক হয়ে ভাবি যে, কিভাবে এই বিরাট বিরাট গ্রহ-নক্ষত্রগুলি আকাশে ভেসে আছে। এখানে বলা হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে এই সমস্ত বিশাল বিপুলাকৃতি গ্রহ-নক্ষত্রমণ্ডলীকে ধরে রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে *অচিন্ত্য* শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবানের শক্তি আমাদের কল্পনার এবং চিন্তারও অতীত, তাই তা অচিন্ত্য। এই কথা কে অস্বীকার করতে পারে? তিনি সমগ্র জড় জগতে পরিব্যাপ্ত, কিন্তু তবুও তিনি এই জড় জগতের অতীত। এই জড় জগৎ সম্বন্ধেই আমাদের কোন ধারণা নেই এবং অপ্রাকৃত জগতের তুলনায় এই জড় জগৎ অত্যন্ত নগণ্য। তা হলে এই জগতের অতীত সেই অপ্রাকৃত জগতের কথা আমরা কিভাবে চিন্তা করব? *অচিন্ত্য* মানে হচ্ছে, যা এই জড় জগতের অতীত, যা দার্শনিক অনুমান, তর্ক, যুক্তি আদির দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাই যে বুদ্ধিমান তাঁর কর্তব্য হচ্ছে, সব রকমের যুক্তি-তর্ক, জল্পনা-কল্পনা বাদ দিয়ে *বেদ, ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত* আদি শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে, তাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে তার অনুসরণ করা। তা হলেই সেই অপ্রাকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারা যায়।

শ্লোক ১০

প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥

প্রয়াণকালে—মৃত্যুর সময়; **মনসা**—মনের দ্বারা; **অচলেন**—অচঞ্চলভাবে; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **যুক্তঃ**—সংযুক্ত; **যোগবলেন**—যোগশক্তির বলে; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **ভ্রুবোঃ**—ভ্রূযুগল; **মধ্যে**—মধ্যে; **প্রাণম্**—প্রাণবায়ুকে; **আবেশ্য**—স্থাপন করে; **সম্যক্**—সম্পূর্ণরূপে; **সঃ**—তিনি; **তম্**—সেই; **পরম্**—পরম; **পুরুষম্**—পুরুষকে; **উপৈতি**—প্রাপ্ত হন; **দিব্যম্**—দিব্য।

গীতার গান

অচল মনেতে যেবা, প্রয়াণকালেতে কিবা,
ভক্তিযুক্ত হয়ে যোগবলে ।
ভ্রূর মধ্যে রাখি প্রাণ, যদি হয় সে স্মরণ,
দিব্য পুরুষ তাহারে মিলে ॥

অনুবাদ

যিনি মৃত্যুর সময় অচঞ্চল চিত্তে, ভক্তি সহকারে, পূর্ণ যোগশক্তির বলে ভ্রূযুগলের মধ্যে প্রাণবায়ুকে স্থাপন করে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করেন, তিনি অবশ্যই সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মৃত্যুর সময় মনকে ভক্তি সহকারে ভগবানের ধ্যানে একাগ্র করা উচিত। যাঁরা যোগ সাধন করছেন, তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, দুই ভ্রূর মধ্যে 'আজ্ঞা-চক্রে' তাঁদের প্রাণশক্তিকে স্থাপন করতে হবে। এখানে 'ষট্‌চক্র' যোগের মাধ্যমে ধ্যানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শুদ্ধ ভক্ত এই ধরনের যোগাভ্যাস করেন না, কিন্তু যেহেতু তিনি সর্বদাই কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন থাকেন, তাই তিনি মৃত্যুর সময়ে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কৃপায় তাঁকে

স্মরণ করতে পারেন। এই অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে সেই কথার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই শ্লোকে *যোগবলেন* কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, 'ষট্‌চক্র' যোগ বা ভক্তিযোগই হোক না কেন, কোন একটি যোগ অভ্যাস না করলে মৃত্যুর সময়ে এই অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হওয়া যায় না। মৃত্যুর সময় আকস্মিকভাবে ভগবানকে স্মরণ করা যায় না। কোন একটি যোগের অনুশীলন, বিশেষ করে ভক্তিযোগ পদ্ধতির অনুশীলন অবশ্যই করতে হবে। যেহেতু মৃত্যুর সময় মন অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তাই আজীবন যোগ অভ্যাস করার মাধ্যমে ভগবানকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হয়, যাতে সেই চরম মুহূর্তে তাঁকে স্মরণ করা যায়।

শ্লোক ১১

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

যৎ—যাঁকে; **অক্ষরম্**—অবিনাশী; **বেদবিদঃ**—বেদবিৎ; **বদন্তি**—বলেন; **বিশন্তি**—প্রবেশ করেন; **যৎ**—যাতে; **যতয়ঃ**—সন্ন্যাসীগণ; **বীতরাগাঃ**—বিষয়ে আসক্তিশূন্য; **যৎ**—যাঁকে; **ইচ্ছন্তঃ**—ইচ্ছা করে; **ব্রহ্মচর্যম্**—ব্রহ্মচর্য; **চরন্তি**—পালন করেন; **তৎ**—সেই; **তে**—তোমাকে; **পদম্**—পদ; **সংগ্রহেণ**—সংক্ষেপে; **প্রবক্ষ্যে**—বলব।

গীতার গান

বেদজ্ঞানী যে অক্ষর, লাভে হয় তৎপর,
যাহাতে প্রবিষ্ট হয় যতিগণ ।
বীতরাগ ব্রহ্মচারী, সদা আচরণ করি,
সে তথ্য বলি শুন বিবরণ ॥

অনুবাদ

বেদবিৎ পণ্ডিতেরা যাঁকে 'অক্ষর' বলে অভিহিত করেন, বিষয়ে আসক্তিশূন্য সন্ন্যাসীরা যাতে প্রবেশ করেন, ব্রহ্মচারীরা যাঁকে লাভ করার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য পালন করেন, তাঁর কথা আমি সংক্ষেপে তোমাকে বলব।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ষট্‌চক্র যোগাভ্যাসের জন্য অর্জুনকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই যোগাভ্যাসের মাধ্যমে প্রাণবায়ুকে দুই ভ্রূর মাঝখানে স্থাপন করতে হয়। অর্জুন ষট্‌চক্র যোগাভ্যাস জানতেন না বলে মেনে নিয়ে, পরবর্তী শ্লোকগুলিতে পরমেশ্বর তাঁর অভ্যাস পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে ব্যাখ্যা করেছেন যে, ব্রহ্ম যদিও অদ্বয়, তবুও তাঁর বিভিন্ন প্রকাশ ও রূপ আছে। বিশেষত নির্বিশেষবাদীদের কাছে অক্ষর বা ওঁ শব্দ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ এখানে সেই ব্রহ্মের বর্ণনা করেছেন, যাঁর মধ্যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীগণ প্রবেশ করেন।

বৈদিক শিক্ষার রীতি অনুসারে, বিদ্যার্থীদের শুরু থেকেই 'ওঁ' উচ্চারণের শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তাঁরা আচার্যদেবের সান্নিধ্যে থেকে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। এভাবেই তাঁরা ব্রহ্মের দুটি স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হন। শিষ্যের পারমার্থিক উন্নতির জন্য এই অনুশীলন অতি আবশ্যক। আধুনিক যুগে এই রকম ব্রহ্মচারী জীবন যাপন করা একেবারেই অসম্ভব। আধুনিক যুগে সমাজ ব্যবস্থার এমন পরিবর্তন হয়েছে যে, বিদ্যার্থীর জীবনের শুরু থেকে ব্রহ্মচর্য পালন করা সম্ভব নয়। সারা বিশ্বে জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের জন্য অনেক শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে, কিন্তু এমন একটিও শিক্ষাকেন্দ্র কোথাও নেই, যেখানে ব্রহ্মচর্য আচরণ করার শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্রহ্মচর্য আচরণ না করে পারমার্থিক উন্নতি লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচার করে গেছেন যে, বর্তমান কলিযুগে শাস্ত্রবিধান অনুসারে **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—এই মহামন্ত্র কীর্তন করা ছাড়া পরমতত্ত্ব উপলব্ধির আর কোন উপায় নেই।

শ্লোক ১২

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥

সর্বদ্বারাণি—শরীরের সব কয়টি দ্বার; **সংযম্য**—সংযত করে; **মনঃ**—মনকে; **হৃদি**—হৃদয়ে; **নিরুধ্য**—নিরোধ করে; **চ**—ও; **মূর্ধ্নি**—ভ্রূদ্বয়ের মধ্য; **আধায়**—স্থাপন করে; **আত্মনঃ**—আত্মার; **প্রাণম্**—প্রাণবায়ুকে; **আস্থিতঃ**—স্থিত; **যোগধারণাম্**—যোগধারণা।

গীতার গান

সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বার, রুদ্ধ হয়েছে যার,
বিষয়েতে অনাসক্তি নাম ।
মনকে নিরোধ করি, হৃদয়েতে স্থির করি,
যেই জন হয়েছে নিষ্কাম ॥
প্রাণকে ভ্রূর মাঝে, যোগ্য সেই যোগীসাজে,
সমর্থ যোগ ধারণে সেই ।

অনুবাদ

ইন্দ্রিয়ের সব কয়টি দ্বার সংযত করে, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করে এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণ স্থাপন করে যোগে স্থিত হতে হয়।

তাৎপর্য

এখানে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, যোগাভ্যাস করার জন্য সর্বপ্রথমে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির সব কয়টি দ্বার বন্ধ করতে হবে। এই অভ্যাসকে বলা হয় 'প্রত্যাহার', অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্বরণ করা। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণভাবে সংযত করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করার বাসনা দমন করতে হয়। এভাবেই মন তখন হৃদয়ে পরমাত্মায় একাগ্র হয় এবং প্রাণবায়ুর মস্তকে ঊর্ধ্বারোহণ হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই পদ্ধতির বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই যুগে এই প্রকার যোগের অভ্যাস করা বাস্তব-সম্মত নয়। এই যুগের সর্বোত্তম সাধনা হচ্ছে কৃষ্ণভাবনা। ভক্তি সহকারে যিনি তাঁর মনকে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন রাখতে পারেন। তাঁর পক্ষে অবিচলিতভাবে অপ্রাকৃত সমাধিতে স্থিত হওয়া অত্যন্ত সহজ।

শ্লোক ১৩

ওঁ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্ ।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

ওঁ—ওঙ্কার; **ইতি**—এই; **একাক্ষরম্**—এক অক্ষর; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্ম; **ব্যাহরন্**—উচ্চারণ করতে করতে; **মাম্**—আমাকে (কৃষ্ণকে); **অনুস্মরন্**—স্মরণ করে; **যঃ**—যিনি;

প্রয়াতি—প্রয়াণ করেন; ত্যজন্—ত্যাগ করে; দেহম্—দেহ; সঃ—তিনি; যাতি—প্রাপ্ত হন; পরমাম্—পরম; গতিম্—গতি।

গীতার গান

ওঙ্কার অক্ষর ব্রহ্ম, উচ্চারণে সেই ব্রহ্ম,
আমাকে স্মরণ করে যেই ॥
সে যায় শরীর ছাড়ি, বৈকুণ্ঠবিহারী হরি,
সমান লোকেতে হয় বাস ।
সেই সে পরমা গতি, শ্রীহরি চরণে রতি,
ধন্য তার পরমার্থ আশ ॥

অনুবাদ

যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হয়ে পবিত্র ওঙ্কার উচ্চারণ করতে করতে কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি অবশ্যই পরমা গতি লাভ করবেন।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, *ওঁকার*, ব্রহ্ম ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন। ওঁ হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ শব্দব্রহ্ম, কিন্তু হরে কৃষ্ণ নামেও ওঁ নিহিত আছে। এই যুগে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন স্পষ্টভাবে অনুমোদিত হয়েছে। তাই কেউ যদি জীবনের অন্তিমকালে **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তা হলে নিঃসন্দেহে তিনি স্বীয় গুণবৈশিষ্ট্য অনুসারে যে কোন একটি চিন্ময় লোকে পৌঁছবেন। কৃষ্ণভক্তেরা কৃষ্ণলোক বা গোলোক বৃন্দাবনে প্রবেশ করেন। সবিশেষবাদীরা বৈকুণ্ঠলোক নামক পরব্যোমের অসংখ্য গ্রহলোকেও প্রবিষ্ট হন, আর নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতিতে স্থিত হন।

শ্লোক ১৪

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

অনন্যচেতাঃ—একাগ্রচিত্তে; সততম্—নিরন্তর; যঃ—যিনি; মাম্—আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে); স্মরতি—স্মরণ করেন; নিত্যশঃ—নিয়মিতভাবে; তস্য—তাঁর কাছে;

অহম্—আমি; সুলভঃ—সুখলভ্য; পার্থ—হে পৃথাপুত্র; নিত্য—নিত্য; যুক্তস্য—যুক্ত; যোগিনঃ—ভক্তযোগীর পক্ষে।

গীতার গান

যে যোগী অনন্য চিত্ত, আমাকে স্মরয় নিত্য,
দৃঢ়তার সহ অবিরাম ।
তাহার সুলভ আমি, হে পার্থ জানহ তুমি,
নিত্য যোগে তাহার বিশ্রাম ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! যিনি একাগ্রচিত্তে কেবল আমাকেই নিরন্তর স্মরণ করেন, আমি সেই নিত্যযুক্ত ভক্তযোগীর কাছে সুলভ হই।

তাৎপর্য

ভক্তিযোগের মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থেকে শুদ্ধ ভক্তগণ যে চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেন, তা বিশেষভাবে এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে *আর্ত* (দুর্দশাগ্রস্ত), *অর্থার্থী* (জড়-জাগতিক ভোগসন্ধানী), *জিজ্ঞাসু* (জ্ঞান লাভে আগ্রহী) ও *জ্ঞানী* (চিন্তাশীল দার্শনিক)—এই চার রকম ভক্তদের কথা বলা হয়েছে। জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার বিভিন্ন পন্থা—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও হঠযোগের বর্ণনা করা হয়েছে। এই সমস্ত যোগপদ্ধতিতে কিছুটা ভক্তিভাব মিশ্রিত থাকে, কিন্তু এই শ্লোকটিতে জ্ঞান, কর্ম কিংবা হঠযোগের কোনও রকম সংমিশ্রণ ছাড়াই বিশেষ করে বিশুদ্ধ ভক্তিযোগের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। *অনন্যচেতাঃ* শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, শুদ্ধ ভক্তিযোগে ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া আর কিছুই চান না। শুদ্ধ ভক্ত স্বর্গারোহণ, ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হওয়া, অথবা ভব-বন্ধন থেকে মুক্তিও কামনা করেন না। শুদ্ধ ভক্ত কোন কিছুই অভিলাষ করেন না। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে শুদ্ধ ভক্তকে বলা হয়েছে 'নিষ্কাম', অর্থাৎ তাঁর নিজের স্বার্থের জন্য কোন বাসনা থাকে না। তিনিই কেবল পূর্ণ শান্তি লাভ করতে পারেন, যারা সর্বদা স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা করে, তারা কখনই সেই শান্তি লাভ করতে পারে না। জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী অথবা হঠযোগীর প্রত্যেকের নিজ নিজ বাসনা থাকে, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের কেবল পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রসন্ন বিধান করা ছাড়া অন্য

কোন বাসনা থাকে না। তাই ভগবান বলেছেন যে, তাঁর অনন্য ভক্তের কাছে তিনি সুলভ।

শুদ্ধ ভক্তমাত্রই সদাসর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কোনও একটি অপ্রাকৃত রূপের মাধ্যমে তাঁর ভক্তিযুক্ত সেবায় নিয়োজিত থাকেন। শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীনৃসিংহদেবের মতো শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ অংশ-প্রকাশ ও অবতার আছেন এবং কোন ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের এই সব অপ্রাকৃত রূপের যে কোনও একটির প্রতি প্রেমভক্তি সহকারে মনোনিবেশের জন্য বেছে নিতে পারেন। এই প্রকার ভক্তের অন্যান্য যোগ অনুশীলনকারীদের মতো বিভিন্ন প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হতে হয় না। ভক্তিযোগ অত্যন্ত সরল, শুদ্ধ ও সহজসাধ্য। কেবল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে যে কেউই এই যোগসাধনা শুরু করতে পারে। ভগবান সকলেরই প্রতি করুণাময়, তবে পূর্বর্বর্ণিত আলোচনা অনুযায়ী, যাঁরা অনন্যচিত্তে ভক্তি সহকারে তাঁর সেবা করেন, তাঁদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে অনুরক্ত। এই প্রকার ভক্তকে তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। *বেদে* (*কঠ উপনিষদ* ১/২/২৩) বলা হয়েছে, *যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্*—পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আত্মসমর্পণ করে যিনি নিরন্তর তাঁর প্রেমভক্তিতে নিয়োজিত রয়েছেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন। *ভগবদ্গীতাতেও* (১০/১০) বলা হয়েছে, *দদামি বুদ্ধিযোগং তম্*—এই ধরনের ভক্তকে ভগবান পর্যাপ্ত বুদ্ধি দান করেন যাতে তিনি তাঁকে সম্পূর্ণরূপে অবগত হয়ে তাঁর চিন্ময় ধামে প্রবেশ করতে পারেন।

শুদ্ধ ভক্তের একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে যে, তিনি স্থান-কাল বিবেচনা না করে অবিচলিতভাবে সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করেন। তাঁর কাছে কোন বাধাবিঘ্ন আসতে পারে না। তিনি যে কোন অবস্থায়, যে কোন সময়ে ভগবৎ-সেবা করতে পারেন। কেউ কেউ বলেন যে, শ্রীবৃন্দাবনের মতো ধামে অথবা ভগবানের লীলা-ভূমিতেই কেবল ভক্তদের বাস করা উচিত। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত যে কোন জায়গায় থাকতে পারেন এবং তিনি সেই স্থানটি তাঁর শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির প্রভাবেই শ্রীবৃন্দাবনের মতো পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য বলেছিলেন, "হে প্রভু! তুমি যেখানেই থাক না কেন, সেই স্থানই শ্রীবৃন্দাবন।"

সততম্ ও *নিত্যশঃ* কথা দুটির দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, 'সদাসর্বদা', 'নিয়মিতভাবে' অথবা 'প্রতিদিন' শুদ্ধ ভক্ত সর্বক্ষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেন এবং তাঁর শ্রীচরণারবিন্দের ধ্যান করেন। এই সবই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের গুণ এবং এই অনন্য ভক্তির ফলেই ভগবান তাঁদের কাছে এত সুলভ। *গীতায়* ভক্তিযোগকে

শ্রেষ্ঠ যোগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সাধারণত, ভক্তিযোগী পাঁচ প্রকারে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকেন—১) শান্ত-ভক্ত—নিরপেক্ষ উদাসীনভাবে ভগবানের সেবা করেন; ২) দাস্য-ভক্ত—দাস্যভাবে ভগবানের সেবা করেন; ৩) সখ্য-ভক্ত—ভগবানের সখারূপে সেবা করেন; ৪) বাৎসল্য-ভক্ত—পিতা অথবা মাতারূপে ভগবানের সেবা করেন এবং ৫) মাধুর্য-ভক্ত—ভগবানের প্রেয়সীরূপে তাঁর সেবা করেন। এর যে কোন একটিকে অবলম্বন করে শুদ্ধ ভক্ত ভগবৎ-সেবায় অনুক্ষণ নিয়োজিত থাকেন এবং পরমেশ্বর ভগবানকে কখনই ভুলতে পারেন না, আর সেই কারণেই ভগবান তাঁর কাছে সুলভ। শুদ্ধ ভক্ত এক মুহূর্তের জন্যও পরমেশ্বর ভগবানকে ভুলে থাকতে পারেন না, আর তেমনই ভগবানও তাঁর শুদ্ধ ভক্তকে এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে থাকতে পারেন না। **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে** —এই মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে অনায়াসে কৃষ্ণভাবনাময় পদ্ধতির মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অশেষ কৃপা লাভ করা যায়।

শ্লোক ১৫

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥

মাম্—আমাকে; **উপেত্য**—লাভ করে; **পুনঃ**—পুনরায়; **জন্ম**—জন্ম; **দুঃখালয়ম্**—দুঃখালয়; **অশাশ্বতম্**—অনিত্য; **ন**—না; **আপ্নুবন্তি**—প্রাপ্ত হন; **মহাত্মানঃ**—মহাত্মাগণ; **সংসিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; **পরমাম্**—পরম; **গতাঃ**—প্রাপ্ত হয়েছেন।

গীতার গান

আমাকে লাভ করে সে মহাত্মা হয় ।
নহে তার পুনর্জন্ম যেথা দুঃখালয় ॥
অশাশ্বত সংসারেতে নহে তার স্থিতি ।
পরমা গতিতে তার সিদ্ধ অবস্থিতি ॥

অনুবাদ

মহাত্মা, ভক্তিপরায়ণ যোগীগণ আমাকে লাভ করে আর এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কেন না তাঁরা পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন।

তাৎপর্য

যেহেতু এই অনিত্য জড় জগৎ জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিরূপ ক্লেশের দ্বারা জর্জরিত, স্বভাবতই যিনি পরমার্থ সাধন করে কৃষ্ণলোক বা গোলোক বৃন্দাবনে পরম গতি লাভ করেন, তিনি কখনই এই জগতে ফিরে আসতে চান না। পরম ধামের বর্ণনা করে বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, তা হচ্ছে *অব্যক্ত, অক্ষর* ও *পরমা গতি;* অর্থাৎ, সেই গ্রহলোক আমাদের জড় দৃষ্টির অতীত এবং যা বর্ণনারও অতীত, কিন্তু তাই হচ্ছে মহাত্মাদের জীবনের পরম লক্ষ্য। মহাত্মারা আত্ম-উপলব্ধি প্রাপ্ত ভগবদ্ভক্তের কাছ থেকে ভগবৎ-তত্ত্ব আহরণ করেন এবং ক্রমশ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে তাঁদের ভগবদ্ভক্তির উন্নতি সাধন করেন। এভাবেই তাঁরা ভগবৎ-সেবায় এত তন্ময় থাকেন যে, কোনও উচ্চলোকে অথবা পরব্যোমে উত্তীর্ণ হবার কোন রকম বাসনাও তাঁদের থাকে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য ব্যতীত তাঁরা আর কিছুই কামনা করেন না। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম সার্থকতা। এই শ্লোকটিতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষবাদী ভক্তদের কথাই গুরুত্ব সহকারে উল্লিখিত হয়েছে। এই সমস্ত ভক্তেরা কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমে জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করেন। পক্ষান্তরে, তাঁরা হচ্ছেন মহাত্মা।

শ্লোক ১৬

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন ।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

আব্রহ্ম—ব্রহ্মলোক পর্যন্ত; **ভুবনাৎ**—পৃথিবী থেকে; **লোকাঃ**—লোকসমূহ; **পুনঃ**—পুনরায়; **আবর্তিনঃ**—আবর্তনশীল; **অর্জুন**—হে অর্জুন; **মাম্**—আমাকে; **উপেত্য**—প্রাপ্ত হলে; **তু**—কিন্তু; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **পুনর্জন্ম**—পুনর্জন্ম; **ন**—না; **বিদ্যতে**—হয়।

গীতার গান

চতুর্দশ ভুবনেতে যত লোক হয় ।
ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সে নিত্য কেহ নয় ॥
সে সব লোকেতে স্থান গমনাগমন ।
সকল লোকেতে আছে জনম মরণ ॥

ভক্তির আশ্রয় যেবা আমাকে যে পায় ।
কেবল তাহার মাত্র পুনর্জন্ম নয় ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! এই ভুবন থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল অর্থাৎ পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

তাৎপর্য

কর্ম, জ্ঞান, হঠ আদি যোগ সাধনকারী যোগীদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য ধামে প্রবেশ করতে হলে, পরিশেষে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভক্তিযোগ অনুশীলন করার মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই দিব্য ধামে একবার প্রবেশ করলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। এই জড় জগতের সর্বোচ্চ লোকে অথবা দেবলোকে প্রবেশ করলেও জন্ম-মৃত্যুর চক্রের অধীনেই থাকতে হয়। মর্তবাসীরা যেমন উচ্চলোকে উন্নীত হয়, তেমনই ব্রহ্মলোক, চন্দ্রলোক, ইন্দ্রলোক আদি উচ্চলোকের অধিবাসীরাও এই গ্রহলোকে পতিত হয়। *ছান্দোগ্য উপনিষদে* উল্লিখিত 'পঞ্চাগ্নি-বিদ্যা' নামক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা যে-কেউ ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হতে পারেন, কিন্তু ব্রহ্মলোকে যদি তিনি কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন না করেন, তবে তাঁকে আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। উচ্চতর গ্রহলোকে যাঁরা কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করেন, তাঁরা উত্তরোত্তর উচ্চতর গ্রহলোক প্রাপ্ত হন এবং মহাপ্রলয়ের পর সনাতন চিন্ময় ধামে প্রবেশ করেন। শ্রীধর স্বামী *ভগবদ্গীতার* ভাষ্য রচনায় এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে ।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥

"এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ের পর নিরন্তর কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ব্রহ্মা ও তাঁর ভক্তগণ তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে পরব্যোমস্থিত অপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে এবং বিশেষ বিশেষ চিন্ময় গ্রহলোকে স্থানান্তরিত হন।"

শ্লোক ১৭

সহস্রযুগপর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥

সহস্র—সহস্র; যুগ—চতুর্যুগ; পর্যন্তম্—ব্যাপী; অহঃ—দিন; যৎ—যা; ব্রহ্মণঃ—ব্রহ্মার; বিদুঃ—যাঁরা জানেন; রাত্রিম্—রাত্রি; যুগ—চতুর্যুগ; সহস্রান্তাম্—তেমনই, সহস্র চতুর্যুগের অন্তে; তে—সেই; অহোরাত্র—দিন ও রাত্রির; বিদঃ—তত্ত্ববেত্তা; জনাঃ—মানুষেরা।

গীতার গান

মানুষের সহস্র যে চতুর্যুগ যায় ।
ব্রহ্মার সে একদিন করিয়া গণয় ॥
সেইরূপ একরাত্রি ব্রহ্মার গণন ।
রাত্রিদিন ব্রহ্মার যে করহ মনন ॥

অনুবাদ

মনুষ্য মানের সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং সহস্র চতুর্যুগে তাঁর এক রাত্রি হয়। এভাবেই যাঁরা জানেন, তাঁরা দিবা-রাত্রির তত্ত্ববেত্তা।

তাৎপর্য

জড় ব্রহ্মাণ্ডের স্থায়িত্বকাল সীমিত। এর প্রকাশ হয় কল্পের সৃষ্টিচক্রে। ব্রহ্মার একদিনকে কল্প বলা হয়। এক কল্পে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারটি যুগ এক হাজার বার আবর্তিত হয়। সত্যযুগের লক্ষণ হচ্ছে সদাচার, বুদ্ধিমত্তা ও ধর্ম। সেই যুগে অজ্ঞান ও পাপ প্রায় থাকে না বললেই চলে। এই যুগের স্থায়িত্ব ১৭,২৮,০০০ বছর। ত্রেতাযুগে পাপকর্মের সূচনা হয় এবং এই যুগের স্থায়িত্ব ১২,৯৬,০০০ বছর। দ্বাপর-যুগে ধর্মের অবনতি ঘটে এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়। এই যুগের স্থায়িত্ব ৮,৬৪,০০০ বছর এবং সব শেষে কলিযুগ (গত ৫,০০০ বছর ধরে এই যুগ চলছে)। এই যুগে কলহ, অজ্ঞানতা, অধর্ম ও পাপাচারের প্রাবল্য দেখা যায় এবং যথার্থ ধর্মাচরণ প্রায় লুপ্ত। এই যুগের স্থায়িত্ব প্রায় ৪,৩২,০০০ বছর। কলিযুগে অধর্ম এত বৃদ্ধি পায় যে, এই যুগের শেষে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং কল্কি অবতাররূপে অবতীর্ণ হয়ে অসুরদের বিনাশ করেন এবং তাঁর ভক্তদের পরিত্রাণ করে আর একটি সত্যযুগের সূচনা করেন। তারপর এই প্রক্রিয়া আবার চলতে থাকে। এই চারটি যুগ যখন এক হাজার বার আবর্তিত হয়, তখন ব্রহ্মার একদিন হয় এবং সমপরিমাণ কালে এক রাত্রি হয়। এই রকম দিন ও রাত্রি সমন্বিত বর্ষ অনুসারে ব্রহ্মা একশ বছর বেঁচে থেকে তারপর দেহ ত্যাগ

করেন। এই একশ বছর পৃথিবীর অনুসারে ৩১১,০৪,০০০,০০,০০,০০০ বছরের সমান। এই গণনা অনুসারে ব্রহ্মার আয়ু কল্পনাপ্রসূত ও অক্ষয় বলে মনে হয়, কিন্তু নিত্যতার পরিপ্রেক্ষিতে এর স্থায়িত্ব বিদ্যুৎ চমকের মতো ক্ষণস্থায়ী। অতলান্তিক মহাসাগরের বুদ্বুদের মতো কারণ সমুদ্রে অসংখ্য ব্রহ্মার নিত্য উদয় ও লয় হয়ে চলেছে। ব্রহ্মা ও তাঁর সৃষ্টি জড় ব্রহ্মাণ্ডের অংশ এবং তাই তা নিরন্তর প্রবহমান।

জড় ব্রহ্মাণ্ডে এমন কি ব্রহ্মাও জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির চক্র থেকে মুক্ত নন। তবুও এই জড় জগতের পরিচালনায় তিনি সরাসরিভাবে ভগবানের সেবা করছেন, তাই তিনি সদ্যমুক্তি লাভ করেন। উচ্চ স্তরের সন্ন্যাসীরা ব্রহ্মার বিশিষ্টলোক ব্রহ্মালোক প্রাপ্ত হন, যা হচ্ছে জড় জগতের সর্বোচ্চ গ্রহলোক এবং অন্য সমস্ত স্বর্গীয় গ্রহলোকের বিনাশ হয়ে যাওয়ার পরেও তা বর্তমান থাকে। কিন্তু জড়া প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মালোকের সমস্ত বাসিন্দাদের যথাসময়ে মৃত্যু হয়।

শ্লোক ১৮

**অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥**

অব্যক্তাৎ—অব্যক্ত থেকে; ব্যক্তয়ঃ—জীবসমূহ; সর্বাঃ—সমস্ত; প্রভবন্তি—প্রকাশিত হয়; অহরাগমে—দিনের শুরুতে; রাত্র্যাগমে—রাত্রি সমাগমে; প্রলীয়ন্তে—লীন হয়ে যায়; তত্র—সেখানে; এব—অবশ্যই; অব্যক্ত—অব্যক্ত; সংজ্ঞকে—নামক।

গীতার গান

সেই রাত্রি অবসানে অব্যক্ত হইতে ।
ব্যক্ত হয় এ ত্রিলোক ব্রহ্মার দিনেতে ॥
আবার সে রাত্রিকালে হইবে প্রলয় ।
অব্যক্ত হইতে জন্ম অব্যক্তে মিলায় ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মার দিনের সমাগমে সমস্ত জীব অব্যক্ত থেকে অভিব্যক্ত হয় এবং ব্রহ্মার রাত্রির আগমে তা পুনরায় অব্যক্তে লয় প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ১৯

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥

ভূতগ্রামঃ—জীবসমষ্টি; **সঃ**—সেই; **এব**—অবশ্যই; **অয়ম্**—এই; **ভূত্বা ভূত্বা**—পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে; **প্রলীয়তে**—লয় প্রাপ্ত হয়; **রাত্রি**—রাত্রি; **আগমে**—সমাগমে; **অবশঃ**—আপনা থেকেই; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **প্রভবতি**—প্রকাশিত হয়; **অহঃ**—দিনের বেলা; **আগমে**—আগমনে।

গীতার গান

চরাচর যাহা কিছু সেই উদ্ভব প্রলয় ।
পুনঃ পুনঃ জন্ম আর পুনঃ পুনঃ ক্ষয় ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! সেই ভূতসমূহ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মার রাত্রি সমাগমে লয় প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় দিনের আগমনে তারা আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন জীব যারা এই জড় জগতে থাকবার চেষ্টা করে, তারা বিভিন্ন উচ্চতর গ্রহলোকে উন্নীত হতে পারে এবং তার পরে আবার তাদের এই পৃথিবীগ্রহে পতন হয়। ব্রহ্মার দিবসকালে এই জড় জগতের অভ্যন্তরে ঊর্ধ্ব ও নিম্ন লোকগুলিতে তারা তাদের কার্যকলাপ প্রদর্শন করতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মার রাত্রির আগমনে তারা আবার সকলেই লয় প্রাপ্ত হয়। জড়-জাগতিক কার্যকলাপের জন্য ব্রহ্মার দিবাভাগে তারা বিভিন্ন কলেবর প্রাপ্ত হয় এবং রাত্রে তাদের সেই সমস্ত কলেবরের বিনাশ হয় এবং এই সময়ে জীবসমূহ শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহে একসঙ্গে অবস্থান করে। তারপর ব্রহ্মার দিনের আবির্ভাবে তারা আবার অভিব্যক্ত হয়। *ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে*—দিনের বেলায় তারা প্রকাশিত হয় এবং রাত্রিবেলায় তারা আবার লয় প্রাপ্ত হয়। অন্তিমে, ব্রহ্মার আয়ু যখন শেষ হয়ে যায়, তখন তারা সকলে বিলীন হয়ে যায় এবং কোটি কোটি বছর ধরে অপ্রকাশিত থাকে। তারপর আর একটি কল্পে ব্রহ্মা যখন আবার জন্মগ্রহণ করে, তখন তারা পুনরায় ব্যক্ত হয়। এভাবেই জীব জড় জগতের মোহের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু যে সমস্ত বুদ্ধিমান

ব্যক্তি কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করেন, তাঁরা *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে*—এই মহামন্ত্র কীর্তন করে মানব-জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ভগবৎ-সেবায় নিয়োগ করেন। এভাবেই, এমন কি এই জীবনে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের দিব্য ধামে প্রবেশ করে পুনর্জন্ম থেকে মুক্ত, সচ্চিদানন্দময় জীবন প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ২০

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

পরঃ—শ্রেষ্ঠ; **তস্মাৎ**—সেই; **তু**—কিন্তু; **ভাবঃ**—প্রকৃতি; **অন্যঃ**—অন্য; **অব্যক্তঃ**—অব্যক্ত; **অব্যক্তাৎ**—অব্যক্ত থেকে; **সনাতনঃ**—নিত্য; **যঃ**—যা; **সঃ**—তা; **সর্বেষু**—সমস্ত; **ভূতেষু**—প্রকাশ; **নশ্যৎসু**—বিনষ্ট হলেও; **ন**—না; **বিনশ্যতি**—বিনষ্ট হয়।

গীতার গান

তাহার উপরে যেই ভাবের নির্ণয় ।
সনাতন সেই ধাম অক্ষয় অব্যয় ॥
সকল সৃষ্টির নাশ এ জগতে হয় ।
সনাতন ধাম নহে হইবে প্রলয় ॥

অনুবাদ

কিন্তু আর একটি অব্যক্ত প্রকৃতি রয়েছে, যা নিত্য এবং ব্যক্ত ও অব্যক্ত বস্তুর অতীত। সমস্ত ভূত বিনষ্ট হলেও তা বিনষ্ট হয় না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের পরা বা চিন্ময় শক্তি অপ্রাকৃত ও নিত্য। ব্রহ্মার দিন ও রাত্রে যথাক্রমে ব্যক্ত ও অব্যক্ত হয় যে অপরা প্রকৃতি, তার প্রভাব থেকে তা সম্পূর্ণ মুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের পরা শক্তি গুণগতভাবে জড়া প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। সপ্তম অধ্যায়ে এই পরা ও অপরা প্রকৃতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ২১

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্ ।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥

অব্যক্তঃ—অব্যক্ত; **অক্ষরঃ**—অক্ষর; **ইতি**—এভাবে; **উক্তঃ**—বলা হয়; **তম্**—তাকে; **আহুঃ**—বলে; **পরমাম্**—পরম; **গতিম্**—গতি; **যম্**—যাঁকে; **প্রাপ্য**—পেয়ে; **ন**—না; **নিবর্তন্তে**—ফিরে আসে; **তদ্ধাম**—সেই ধাম; **পরমম্**—পরম; **মম**—আমার।

গীতার গান

সেই সে অব্যক্ত নাম 'অক্ষর' তাহার ।
জীবের সে গতি নাম পরমা যাহার ॥
সে গতি হইলে লাভ না আসে ফিরিয়া ।
আমার সে নিত্য ধাম সংসার জিনিয়া ॥

অনুবাদ

সেই অব্যক্তকে অক্ষর বলে, তাই সমস্ত জীবের পরমা গতি। কেউ যখন সেখানে যায়, তখন আর তাঁকে এই জগতে ফিরে আসতে হয় না। সেটিই হচ্ছে আমার পরম ধাম।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ধামকে *ব্রহ্মসংহিতায়* 'চিন্তামণি ধাম' বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই ধামে সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ধাম গোলোক বৃন্দাবন চিন্তামণি দিয়ে তৈরি প্রাসাদে পরিপূর্ণ। সেখানকার গাছগুলি কল্পতরু, যা ইচ্ছামাত্র আকাঙ্ক্ষিত খাদ্যদ্রব্য দান করে। সেখানকার গাভীগুলি 'সুরভী', যারা অপর্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ দান করে। এই নিত্য ধামে সহস্রশত লক্ষ্মী নিরন্তর অনাদির আদিপুরুষ সর্ব কারণের কারণ শ্রীগোবিন্দের সেবা করছেন। শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর তাঁর বেণুবাদন করেন (*বেণুং ক্বণন্তম্*)। তাঁর দিব্য শ্রীবিগ্রহ ত্রিভুবনকে আকৃষ্ট করে। তাঁর চক্ষুদ্বয় কমলদলের মতো এবং তাঁর শ্রীবিগ্রহের বর্ণ মেঘের মতো ঘনশ্যাম। তাঁর অপূর্ব সুন্দর রূপ কোটি কোটি কন্দর্পকে বিমোহিত করে। তাঁর পরনে পীত বসন, গলায় বনমালা আর মাথায় তাঁর শিখিপুচ্ছ। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময় জগতের সর্বোচ্চ লোকে তাঁর স্বীয় ধাম গোলোক বৃন্দাবন সম্বন্ধে

কেবল একটু আভাস দিয়েছেন। *ব্রহ্মসংহিতাতে* তাঁর বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। বৈদিক শাস্ত্রে (*কঠ উপনিষদ* ১/৩/১১) উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের চিন্ময় ধামের থেকে উত্তম আর কিছুই নেই এবং সেই ধামই হচ্ছে পরম গতি (*পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা পরমা গতিঃ*)। সেই ধাম প্রাপ্ত হলে কেউ আর এই জড় জগতে ফিরে আসে না। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের পরম ধামের মধ্যে কোন ভেদ নেই, তাঁরা সমান চিদ্‌গুণ-সম্পন্ন। দিল্লি থেকে ৯০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত বৃন্দাবন চিৎ-জগতের সর্বোচ্চে গোলোক বৃন্দাবনের প্রতিরূপ। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন, তখন তিনি মথুরা জেলায় ৮৪ বর্গমাইল পরিধি-বিশিষ্ট সেই বৃন্দাবন ধামে তাঁর দিব্য লীলাখেলা করেছিলেন।

শ্লোক ২২

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া ।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥

পুরুষঃ—পরমেশ্বর ভগবান; **সঃ**—তিনি; **পরঃ**—পরম, যাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **ভক্ত্যা**—ভগবদ্ভক্তির দ্বারা; **লভ্যঃ**—লাভ করা যায়; **তু**—কিন্তু; **অনন্যয়া**—অনন্য; **যস্য**—যাঁর; **অন্তঃস্থানি**—মধ্যে; **ভূতানি**—এই সমস্ত জড় প্রকাশ; **যেন**—যাঁর দ্বারা; **সর্বম্**—সমস্ত; **ইদম্**—এই; **ততম্**—পরিব্যাপ্ত।

গীতার গান

পরমপুরুষ সেই নিত্য ধামে বাস ।
হে পার্থ! অনন্য ভক্তি তাহার প্রয়াস ॥
তাঁহারই অন্তরেতে হয় সমস্ত জগত ।
অন্তর্যামী সে পুরুষ সর্বত্র বিস্তৃত ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! সর্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর ভগবানকে অনন্যা ভক্তির মাধ্যমেই কেবল লাভ করা যায়। তিনি যদিও তাঁর ধামে নিত্য বিরাজমান, তবুও সর্বব্যাপ্ত এবং সব কিছু তাঁর মধ্যেই অবস্থিত।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সেই পরম ধাম, যেখান থেকে আর পুনরাগমন হয় না, তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধাম। *ব্রহ্মসংহিতায়* এই পরম ধামকে *আনন্দচিন্ময়রস* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ যেখানে সব কিছুই চিন্ময় আনন্দে পরিপূর্ণ। সেখানে যত রকমের বিচিত্রতার প্রকাশ, তা সবই দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ—কোন কিছুই জড় নয়। এই সমস্ত বৈচিত্র্য পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় আত্মবিস্তার, কারণ সেই ধাম পূর্ণরূপে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিতে অধিষ্ঠিত। সেই কথা সপ্তম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে ভগবান যদিও তাঁর পরম ধামে নিত্য অধিষ্ঠিত, কিন্তু তবুও তাঁর অপরা শক্তির দ্বারা তিনি সর্বব্যাপ্ত। এভাবেই তাঁর পরা ও অপরা শক্তির মাধ্যমে তিনি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, উভয় জগতেই সর্বদাই বিদ্যমান। *যস্যান্তঃস্থানি* কথাটির অর্থ হচ্ছে, তিনি সব কিছুই তাঁর মধ্যে ধারণ করে আছেন—তা সে পরা শক্তিই হোক অথবা অপরা শক্তিই হোক। এই দুই শক্তির দ্বারা ভগবান সর্বব্যাপ্ত।

এখানে *ভক্ত্যা* শব্দটির দ্বারা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কেবল ভক্তির দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের পরম ধামে অথবা অগণিত বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করা সম্ভব। অন্য কোনও পন্থায় সেই পরম ধাম লাভ করা যায় না। *বেদেও* (*গোপাল-তাপনী উপনিষদ* ৩/২) এই পরম ধাম ও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বর্ণনা আছে। *একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণঃ*—সেই পরম ধামে কেবল এক পরম পুরুষোত্তম ভগবান আছেন, যাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ। তিনি পরম করুণাময় বিগ্রহ এবং যদিও তিনি সেখানে এক হয়ে অবস্থান করে আছেন, কিন্তু তিনিই লক্ষ লক্ষ অসংখ্য অংশ-রূপ ধারণ করে বিরাজ করছেন। *বেদে* পরমেশ্বরকে এমন একটি গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যে গাছটি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকেও নানা ধরনের ফল, ফুল বহন করছে এবং এমন সব পাতা সৃষ্টি করে চলেছে, যা নিয়ত বদলে যাচ্ছে। ভগবানের অংশ-প্রকাশ বৈকুণ্ঠলোকগুলির অধিপতি হচ্ছেন চতুর্ভুজধারী এবং তাঁরা পুরুষোত্তম, ত্রিবিক্রম, কেশব, মাধব, অনিরুদ্ধ, হৃষীকেশ, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, শ্রীধর, বাসুদেব, দামোদর, জনার্দন, নারায়ণ, বামন, পদ্মনাভ আদি বিবিধ নামে পরিজ্ঞাত।

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৭) দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, যদিও ভগবান তাঁর পরম ধাম গোলোক বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজমান, তবুও তিনি সর্বব্যাপ্ত, যার ফলে সব কিছুই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়ে চলেছে (*গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ*)। *বেদে* (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/৮) উল্লেখ আছে যে, *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে/*

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ—তাঁর শক্তিসমূহ এতই সুদূরপ্রসারী যে, তারা সুবিন্যস্ত ও ত্রুটিহীনভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই পরিচালনা করে চলেছে, যদিও পরমেশ্বর ভগবান বহু বহু দূরে অবস্থিত।

শ্লোক ২৩

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

যত্র—যে; **কালে**—সময়ে; **তু**—কিন্তু; **অনাবৃত্তিম্**—ফিরে আসে না; **আবৃত্তিম্**—ফিরে আসে; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **যোগিনঃ**—বিভিন্ন প্রকার যোগী; **প্রয়াতাঃ**—মৃত্যু হলে; **যান্তি**—প্রাপ্ত হন; **তম্**—সেই; **কালম্**—কাল; **বক্ষ্যামি**—বলব; **ভরতর্ষভ**—হে ভারতশ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

যে কালেতে অনাবৃত্তি যোগীর সম্ভব ।
বলিতেছি শুন তাহা ভরত ঋষভ ॥

অনুবাদ

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! যে কালে মৃত্যু হলে যোগীরা এই জগতে ফিরে আসেন অথবা ফিরে আসেন না, সেই কালের কথা আমি তোমাকে বলব।

তাৎপর্য

ভগবানের পূর্ণ শরণাগত অনন্য ভক্তগণ কখনও চিন্তা করেন না, তাঁরা কিভাবে ও কখন দেহত্যাগ করবেন। তাঁরা সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের হাতে ছেড়ে দেন এবং তাই তাঁরা অনায়াসে ও অতি আনন্দের সঙ্গে ভগবৎ-ধামে ফিরে যান। কিন্তু যারা অনন্য ভক্ত নয়, যারা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, হঠযোগ আদি অন্যান্য সাধনার উপর নির্ভর করে, তাদের অবশ্যই উপযুক্ত সময়ে দেহত্যাগ করতে হয়, যার ফলে তারা নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে, এই জন্ম-মৃত্যুর সংসারে তাদের আর ফিরে আসতে হবে কি হবে না।

সিদ্ধযোগী এই জড় জগৎ ত্যাগ করবার জন্য উপযুক্ত স্থান ও কাল নির্ণয় করতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি সিদ্ধ না হন, তবে তাঁর সাফল্য নির্ভর করে,

দৈবক্রমে যদি তিনি কোন বিশেষ উপযুক্ত সময়ে তাঁর দেহ ত্যাগ করতে পারেন, তার উপর। যেই উপযুক্ত সময়ে দেহত্যাগ করলে আর ফিরে আসতে হয় না, তা পরবর্তী শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন। আচার্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণের মত অনুসারে, এখানে উল্লিখিত *কাল* শব্দে কালের অধিষ্ঠাতা দেবতাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৪

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ ।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥

অগ্নিঃ—অগ্নি; **জ্যোতিঃ**—জ্যোতি; **অহঃ**—দিন; **শুক্লঃ**—শুক্লপক্ষ; **ষণ্মাসাঃ**—ছয় মাস; **উত্তরায়ণম্**—উত্তরায়ণ; **তত্র**—সেই মার্গে; **প্রয়াতাঃ**—দেহ ত্যাগকারী; **গচ্ছন্তি**—গমন করেন; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মে; **ব্রহ্মবিদঃ**—ব্রহ্মজ্ঞানী; **জনাঃ**—ব্যক্তি।

গীতার গান

ব্রহ্মবিৎ পুরুষ যে জ্যোতি শুভদিনে ।
উত্তরায়ণ কালেতে করিলে প্রয়াণে ॥
ব্রহ্মলাভ হয় তার অনাবৃত্তি গতি ।
কর্মীর জ্ঞানীর সেই সাধারণ মতি ॥

অনুবাদ

ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ অগ্নি, জ্যোতি, শুভদিন, শুক্লপক্ষে ও ছয় মাস উত্তরায়ণ কালে দেহত্যাগ করলে ব্রহ্ম লাভ করেন।

তাৎপর্য

অগ্নি, জ্যোতি, দিন, পক্ষ আদির উল্লেখ থেকে জানা যায় যে, এই সকলের এক-একজন বিশেষ অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন, যাঁরা আত্মার গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করেন। মৃত্যুর সময় মন জীবাত্মাকে নবজীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। দৈবক্রমে অথবা সাধনার প্রভাবে এই শ্লোকে বর্ণিত সময়ে দেহত্যাগ করলে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তম যোগী তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কোন বিশেষ স্থানে, কোন বিশেষ সময়ে দেহত্যাগ করতে পারেন। অন্য কোন মানুষের সেই নিয়ন্ত্রণে সামর্থ্য

নেই। দৈবক্রমে শুভ মুহূর্তে যদি কারও দেহত্যাগ হয়, তবে সে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে পুনরাগমন করবে না, নতুবা অবশ্যই তাকে এই জড় জগতে ফিরে আসতে হবে। কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় শুদ্ধ ভক্ত দৈবক্রমে অথবা স্বেচ্ছায়, শুভ অথবা অশুভ, যে সময়েই দেহত্যাগ করুন না কেন, তাঁর কখনও পুনরাগমনের আশঙ্কা থাকে না।

শ্লোক ২৫

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্ ।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫ ॥

ধূমঃ—ধূম; **রাত্রিঃ**—রাত্রি; **তথা**—ও; **কৃষ্ণঃ**—কৃষ্ণপক্ষ; **ষণ্মাসাঃ**—ছয় মাস; **দক্ষিণায়নম্**—দক্ষিণায়ন; **তত্র**—সেই মার্গে; **চান্দ্রমসম্**—চন্দ্রলোক; **জ্যোতিঃ**—জ্যোতি; **যোগী**—যোগী; **প্রাপ্য**—লাভ করে; **নিবর্ততে**—প্রত্যাবর্তন করেন।

গীতার গান

তারা ইষ্টাপূর্তি কর্মে রাত্রি কৃষ্ণপক্ষে ।
ধূম বা দক্ষিণায়ন চন্দ্র জ্যোতি লক্ষে ॥
মার্গ সেই আশ্রয়েতে পুনরাগমন ।
কর্মযোগী নাহি করে ব্রহ্ম নিরূপণ ॥

অনুবাদ

ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ অথবা দক্ষিণায়নের ছয় মাস কালে দেহত্যাগ করে যোগী চন্দ্রলোকে গমনপূর্বক সুখভোগ করার পর পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রত্যাবর্তন করেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কপিল মুনি উল্লেখ করেছেন যে, পৃথিবীতে যাঁরা সকাম কর্ম ও যজ্ঞ অনুষ্ঠানে দক্ষ, তাঁরা দেহত্যাগ করার পর চন্দ্রলোকে গমন করেন। এই সমস্ত উন্নত আত্মারা সেখানে দেবতাদের গণনা অনুসারে ১০,০০০ বছর বাস করেন এবং সোমরস পান করে জীবন উপভোগ করেন। কিন্তু শেষকালে এক সময় তাঁদের আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, চন্দ্রলোকে অনেক উন্নত স্তরের জীব আছেন, যদিও তাঁরা স্থূল ইন্দ্রিয়গোচর নন।

শ্লোক ২৬

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে ।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

শুক্ল—শুক্ল; **কৃষ্ণে**—কৃষ্ণ; **গতী**—মার্গ; **হি**—অবশ্যই; **এতে**—এই দুই; **জগতঃ**—জগতের; **শাশ্বতে**—বৈদিক; **মতে**—মতে; **একয়া**—একটির দ্বারা; **যাতি**—প্রাপ্ত হয়; **অনাবৃত্তিম্**—অপ্রত্যাবর্তন; **অন্যয়া**—অন্যটির দ্বারা; **আবর্ততে**—প্রত্যাবর্তন করে; **পুনঃ**—পুনরায়।

গীতার গান

অতএব দুই মার্গ শুক্ল কৃষ্ণ নাম ।
শাশ্বত যে দুই পথ হই বর্তমান ॥
শুক্লমার্গে যার গতি তার অনাবৃত্তি ।
কৃষ্ণমার্গে যার গতি সে আবৃত্তি ॥

অনুবাদ

বৈদিক মতে এই জগৎ থেকে দেহত্যাগের দুটি মার্গ রয়েছে—একটি শুক্ল এবং অপরটি কৃষ্ণ। শুক্লমার্গে দেহত্যাগ করলে তাকে আর ফিরে আসতে হয় না, কিন্তু কৃষ্ণমার্গে দেহত্যাগ করলে ফিরে আসতে হয়।

তাৎপর্য

আচার্য বলদেব বিদ্যাভূষণ *ছান্দোগ্য উপনিষদ* (৫/১০/৩-৫) থেকে জড় জগতে গমনাগমনের এই রকমই একটি শ্লোকের বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন। যাঁরা অনন্ত কাল ধরে দার্শনিক জ্ঞান ও সকাম কর্মের অনুশীলন করে আসছেন, তাঁরা নিরন্তর গমনাগমন করছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের শরণাগত হন না বলে তাঁরা যথার্থ মুক্তি লাভ করতে পারেন না।

শ্লোক ২৭

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন ।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন ॥ ২৭ ॥

ন—না; **এতে**—এই দুটি; **সৃতী**—মার্গ; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **জানন্**—জেনে; **যোগী**—ভগবদ্ভক্ত; **মুহ্যতি**—মোহগ্রস্ত; **কশ্চন**—কোন; **তস্মাৎ**—অতএব; **সর্বেষু কালেষু**—সর্বদা; **যোগযুক্তঃ**—কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত; **ভব**—হও; **অর্জুন**—হে অর্জুন।

গীতার গান

কিন্তু পার্থ ভক্ত মোর দুই মার্গ জানি ।
মোহপ্রাপ্ত নাহি হয় ভক্তিযোগ মানি ॥
অতএব হে অর্জুন! মোরে নিত্য স্মর ।
ভক্তিযোগযুক্ত হও কভু না পাসর ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! ভক্তেরা এই দুটি মার্গ সম্বন্ধে অবগত হয়ে কখনও মোহগ্রস্ত হন না। অতএব হে অর্জুন! তুমি ভক্তিযোগ অবলম্বন কর।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ এখানে অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, সংসার ত্যাগ করার জন্য জীবাত্মা এই দুটি মার্গের যে কোন একটা মার্গ গ্রহণ করতে পারে বলে তাঁর চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। ভগবদ্ভক্ত তাঁর প্রয়াণ ইচ্ছাকৃতভাবে হবে, না দৈবক্রমে হবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করেন না। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা। তাঁর জানা উচিত যে, এই দুটি মার্গের যে কোনটিই ক্লেশকর। কৃষ্ণভাবনায় আবিষ্ট হবার শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হওয়া। এর ফলে ভগবৎ-ধাম প্রাপ্তির পথ নিরাপদ, নিশ্চিত ও সরল হয়। এই শ্লোকে *যোগযুক্ত* কথাটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। যিনি দৃঢ়তাপূর্বক যোগ অভ্যাস করেন, তিনি তাঁর সমস্ত কার্যকলাপের মাধ্যমে সর্বদাই কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত থাকেন। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদের উপদেশ হচ্ছে যে, *অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ*—জড় বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত থাকতে হবে এবং সমস্ত কিছু কৃষ্ণভাবনামৃত দ্বারা পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে। এভাবেই 'যুক্তবৈরাগ্য' পন্থার মাধ্যমে অতি সহজে পরম সিদ্ধি লাভ করা যায়। তাই, আত্মার গমন পথের এই সমস্ত বিবরণে ভক্ত কখনই বিচলিত হন না, কারণ তিনি জানেন যে, ভক্তিযোগ সাধন করার ফলে তিনি অবশ্যই ভগবৎ-ধাম প্রাপ্ত হবেন।

শ্লোক ২৮

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্ ।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮ ॥

বেদেষু—বেদপাঠে; **যজ্ঞেষু**—যজ্ঞানুষ্ঠানে; **তপঃসু**—তপস্যায়; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **দানেষু**—দানে; **যৎ**—যে; **পুণ্যফলম্**—পুণ্যফল; **প্রদিষ্টম্**—নির্দেশিত হয়েছে; **অত্যেতি**—অতিক্রম করে; **তৎ সর্বম্**—সেই সমস্ত; **ইদম্**—এই; **বিদিত্বা**—জেনে; **যোগী**—ভক্ত; **পরম্**—পরম; **স্থানম্**—স্থান; **উপৈতি**—প্রাপ্ত হন; **চ**—ও; **আদ্যম্**—আদি।

গীতার গান

বেদাদি শাস্ত্রেতে যাহা, যজ্ঞ তপ দান তাহা,
পুণ্যফল যাহা সে প্রদিষ্ট ।
সে যোগ যে অবলম্বে, পায় তাহা অবিলম্বে,
সম্যক বুঝিয়া নিজ ইষ্ট ॥

অনুবাদ

ভক্তিযোগ অবলম্বন করলে তুমি কোন ফলেই বঞ্চিত হবে না। বেদপাঠ, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, তপস্যা, দান আদি যত প্রকার জ্ঞান ও কর্ম আছে, সেই সমুদয়ের যে ফল, তা তুমি ভক্তিযোগ দ্বারা লাভ করে আদি ও পরম ধাম প্রাপ্ত হও।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি কৃষ্ণভাবনামৃত ও ভক্তিযোগের বিশেষ বর্ণনা সমন্বিত সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ের সারমর্ম। শ্রীগুরুদেবের তত্ত্বাবধানে *বেদ* অধ্যয়ন ও তপশ্চর্যার অনুশীলন করা অত্যন্ত আবশ্যক। বৈদিক প্রথা অনুসারে ব্রহ্মচারীকে গুরুগৃহে থেকে অনুগত ভৃত্যের মতো গুরুদেবের সেবা করতে হয় এবং তাকে গুরুদেবের জন্য দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করতে হয়। শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞানুসারেই কেবল সে ভোজন করে, এবং যদি কোনদিন গুরুদেব তাকে ভোজনে না ডাকেন, তা হলে সেই দিন সে উপবাসী থাকে। এগুলি ব্রহ্মচর্য-ব্রতের কয়েকটি বৈদিক সিদ্ধান্ত।

পাঁচ বৎসর থেকে কুড়ি বৎসর পর্যন্ত গুরুর তত্ত্বাবধানে *বেদ* অধ্যয়ন করার পর ব্রহ্মচারী শিক্ষার্থী পরম চরিত্রবান মানুষ হতে সক্ষম হন। *বেদ* অধ্যয়ন করার উদ্দেশ্য আরাম-কেদারায় উপবেশনরত মনোধর্মীদের মনোরঞ্জন করা নয়, তার উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন করা। এই প্রশিক্ষণের পরে ব্রহ্মচারী গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে বিবাহ করতে পারেন। গৃহস্থাশ্রমেও তাঁকে নানা রকম যজ্ঞানুষ্ঠান করতে হয়, যাতে তিনি অধিকতর সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে পরমার্থ সাধনে সচেষ্ট হন। *ভগবদ্গীতার* বর্ণনা অনুযায়ী দেশ, কাল ও পাত্র বিচারে এবং সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের পার্থক্য নির্ণয় করে যথোপযুক্তভাবে দানধ্যান করাও তাঁর অবশ্য কর্তব্য। তারপর গৃহস্থাশ্রম থেকে নিবৃত্ত হয়ে বানপ্রস্থ গ্রহণ করে বনবাসী হয়ে বল্কল ধারণ করে ক্ষৌরকর্ম পরিহার করে তাকে নানা রকম তপশ্চর্যার অনুশীলন করতে হয়। এভাবেই ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সবশেষে সন্ন্যাস আশ্রমের বিধি-বিধান পালন করে জীবনের পরম সিদ্ধির স্তরে উন্নীত হতে হয়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্বর্গলোকে উন্নীত হন এবং তার পরে আরও উন্নতি সাধন করার পরে পরব্যোমে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি অথবা বৈকুণ্ঠলোকে বা কৃষ্ণলোকে পরম মুক্তি লাভ করেন। বৈদিক সাহিত্যে এই পথের দিগ্‌দর্শন দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের সৌন্দর্য এতই অনুপম যে, কেবল ভগবানকে ভক্তি করার একটিমাত্র সাধনার মাধ্যমেই এই সমস্ত আশ্রম এবং বৈদিক কর্মকাণ্ডের সমস্ত আচার অনুষ্ঠান অতিক্রম করা যায়।

ইদং বিদিত্বা শব্দ দুটির দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, *ভগবদ্গীতার* এই অধ্যায় ও সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়েছেন, তা পুঁথিগত বিদ্যা বা জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে বোঝবার চেষ্টা করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করে তাঁর কাছ থেকে এর তত্ত্ব শ্রবণের মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা উচিত। সপ্তম অধ্যায় থেকে শুরু করে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত *ভগবদ্গীতার* সারমর্ম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথম ছয়টি অধ্যায় এবং শেষের ছয়টি অধ্যায় যেন মাঝের ছয়টি অধ্যায়কে আবৃত করে রেখেছে—যেগুলি বিশেষভাবে স্বয়ং পরমেশ্বর দ্বারা সংরক্ষিত হয়েছে। যদি কোন ভাগ্যবান ভক্তসঙ্গে *ভগবদ্গীতার*, বিশেষ করে মাঝখানের এই ছয়টি অধ্যায়ের তত্ত্ব যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তা হলে তাঁর জীবন সমস্ত তপ, যজ্ঞ, দান, ধ্যান, মনোধর্ম আদির ঊর্ধ্বে দিব্য কীর্তির দ্বারা গৌরবান্বিত হয়, কেন না শুধুমাত্র কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমেই তিনি এই সব রকম কর্মেরই সুফল অর্জন করতে পারেন।

ভগবদ্গীতার প্রতি যাঁর কিছুমাত্র বিশ্বাস আছে, তাঁর পক্ষে কোনও ভক্তজনের কাছ থেকেই *ভগবদ্গীতার* শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। কারণ, চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, *ভগবদ্গীতার* তত্ত্বজ্ঞান কেবল ভক্তজনই উপলব্ধি করতে পারেন, অন্য কেউ যথাযথভাবে *ভগবদ্গীতার* উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না। সুতরাং, মনোধর্মীদের কাছ থেকে *ভগবদ্গীতার* ব্যাখ্যা না শুনে কোনও কৃষ্ণভক্তের কাছে তা শোনা উচিত। এটিই হচ্ছে শ্রদ্ধার লক্ষণ। কেউ যখন কোনও ভক্তের সন্ধান করতে থাকে, এবং অবশেষে ভক্তের সান্নিধ্য লাভ করতে সক্ষম হয়, তখনই তার পক্ষে যথাযথভাবে *ভগবদ্গীতার* অধ্যয়ন ও উপলব্ধির সার্থক প্রচেষ্টার সূচনা হয়। সাধুসঙ্গের প্রভাবেই ভগবৎ-সেবায় প্রবৃত্তি জন্মায়। এই ভগবৎ-সেবার ফলে শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, লীলা, পরিকর আদি হৃদয়ে স্ফুরিত হয় এবং এই সকল বিষয়ে সমস্ত সংশয় সম্পূর্ণরূপে দূর হয়। এভাবেই সমস্ত সংশয় দূর হলে অধ্যয়নে মনোনিবেশ হয় তখন *ভগবদ্গীতা* অধ্যয়ন করে আস্বাদন করা যায় এবং কৃষ্ণভাবনার প্রতি অনুরাগ ও ভাবের উদয় হয়। আরও উন্নত স্তরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ণ প্রেমানুরাগের উদয় হয়। এই পরম সিদ্ধির স্তরে ভক্ত চিদাকাশে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের ধাম গোলোক বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হন, যেখানে তিনি চিন্ময় শাশ্বত আনন্দ লাভ করেন।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—পরমতত্ত্ব লাভ বিষয়ক 'অক্ষরব্রহ্ম-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়

রাজগুহ্য-যোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ইদম্**—এই; **তু**—কিন্তু; **তে**—তোমাকে; **গুহ্যতমম্**—অতি গোপনীয়; **প্রবক্ষ্যামি**—বলছি; **অনসূয়বে**—নির্মৎসর; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **বিজ্ঞান**—উপলব্ধ জ্ঞান; **সহিতম্**—সহ; **যৎ**—যা; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **মোক্ষ্যসে**—মুক্ত হবে; **অশুভাৎ**—দুঃখময় সংসার বন্ধন থেকে।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

এবার হে অর্জুন শুন অসূয়া রহিত।
এই এক গুহ্যতম কহি তব হিত ॥
ইহা হয় জ্ঞান আর বিজ্ঞানসম্মত।
জানিলে সে মুক্ত হয় সর্ব অশুভত ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে অর্জুন! তুমি নির্মৎসর বলে তোমাকে আমি পরম বিজ্ঞান সমন্বিত সবচেয়ে গোপনীয় জ্ঞান উপদেশ করছি। সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে তুমি দুঃখময় সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হও।

তাৎপর্য

ভক্ত যতই ভগবানের কথা শ্রবণ করে, ততই তাঁর অন্তরে দিব্য জ্ঞানের প্রকাশ হয়। এই শ্রবণ পদ্ধতির মহিমা বর্ণনা করে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—"ভগবানের কথা দিব্য শক্তিতে পূর্ণ এবং এই দিব্য শক্তি উপলব্ধি করা যায় যদি ভক্তদের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের কথা আলোচিত হয়। মনোধর্মী জল্পনাকারী অথবা কেতাবি বিদ্যায় পণ্ডিতদের সঙ্গ করলে এই বিজ্ঞান কখনও লাভ করা যায় না, কেন না এই দিব্য জ্ঞান উপলব্ধি সঞ্জাত।"

ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদাই ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। ভগবান কৃষ্ণভাবনাময় প্রতিটি জীবের মনোভাব ও আন্তরিকতা জানেন এবং ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ-বিষয়ক বিজ্ঞানতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার বুদ্ধিমত্তা প্রদান করেন। কৃষ্ণ-বিষয়ক আলোচনা অলৌকিক শক্তিশালী। যদি কোন সৌভাগ্যবান জীব এই সৎসঙ্গ লাভ করেন এবং জ্ঞান লাভে যত্নশীল হন, তখন তিনি নিশ্চিতভাবে পারমার্থিক উপলব্ধির পথে অবশ্যই উন্নতি সাধন করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সেবায় অর্জুনকে উত্তরোত্তর উন্নত স্তরে উত্তীর্ণ হতে উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে এই নবম অধ্যায়ে সেই রহস্যের বর্ণনা করেছেন, যা পূর্ববর্ণিত তত্ত্বসমূহ থেকে অনেক বেশি গূঢ় ও গোপনীয়।

ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায় হচ্ছে গ্রন্থটির মোটামুটি প্রস্তাবনা-স্বরূপ; দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের পারমার্থিক জ্ঞানকে গুহ্য বলা হয়েছে। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ের বিষয় ভক্তিযোগের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত এবং যেহেতু তার প্রভাবে কৃষ্ণভাবনা বিকশিত হয়, তাই তাকে গুহ্যতর বলা হয়েছে। কিন্তু নবম অধ্যায়ে কেবল শুদ্ধ ভক্তির বর্ণনা করা হয়েছে, তাই এই অধ্যায়টি হচ্ছে গুহ্যতম। যিনি শ্রীকৃষ্ণের এই পরম গুহ্যতম তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত, তিনি স্বাভাবিকভাবে অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত। তাই, জড় জগতে অবস্থানকালেও তাঁর কোন রকম জড়-জাগতিক জ্বালাযন্ত্রণা থাকে না। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে বলা হয়েছে, যিনি ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় উৎকণ্ঠিত থাকেন, তিনি সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি মুক্ত। তেমনই, *ভগবদ্গীতার* দশম অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাব যে, যিনি এভাবেই নিয়োজিত, তিনিই হচ্ছেন মুক্ত পুরুষ।

নবম অধ্যায়ের এই প্রথম শ্লোকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। *ইদং জ্ঞানম্* ('এই জ্ঞান') কথাটির অর্থ শুদ্ধ ভক্তিযোগ, যা হচ্ছে নববিধা ভক্তি—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন। ভক্তিযোগের এই নয়টি অঙ্গের অনুশীলনের ফলে চিন্ময় চেতনায় বা কৃষ্ণভাবনায় উন্নীত হওয়া যায়। এভাবেই জড়-জাগতিক কলুষ থেকে হৃদয় শুদ্ধ হলে এই কৃষ্ণ-তত্ত্ববিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারা যায়। জীবাত্মা যে জড় সত্তা নয়, শুধু এই উপলব্ধিটুকুই যথেষ্ট নয়। এর মাধ্যমে কেবল পারমার্থিক উপলব্ধির সূচনাই হতে পারে। কিন্তু জীবের দৈহিক ক্রিয়াকলাপ এবং যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, তিনি দেহটি নন, তাঁর ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে কি ভেদ, সেটি জানা আবশ্যক।

সপ্তম অধ্যায়ে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ঐশ্বর্যপূর্ণ শক্তিমত্তা, তাঁর বিবিধ শক্তি, পরা ও অপরা প্রকৃতি এবং এই সমস্ত জড়-জাগতিক সৃষ্টির বর্ণনা করা হয়েছে। এখন এই নবম অধ্যায়ে ভগবানের মহিমা বর্ণিত হচ্ছে।

এই শ্লোকে *অনসূয়বে* সংস্কৃত কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণত *গীতার* ব্যাখ্যাকারেরা উচ্চ শিক্ষিত হলেও তাঁরা সকলেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। এমন কি বড় বড় পণ্ডিতেরাও *ভগবদ্গীতার* অত্যন্ত অশুদ্ধ ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের ভাষ্য অর্থহীন, কারণ তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। *ভগবদ্গীতার* যথার্থ ব্যাখ্যা কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তই করতে পারেন। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি কখনই *ভগবদ্গীতার* ব্যাখ্যা করতে পারে না অথবা কৃষ্ণতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে পারে না। কৃষ্ণতত্ত্ব না জেনে যারা তাঁর চরিত্রের সমালোচনা করে, তারা বাস্তবিকই মূঢ়। তাই, অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে সেই সমস্ত ভাষ্য বর্জন করাই কল্যাণকর। যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে শুদ্ধ, দিব্য পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান বলে জানেন, তাঁর পক্ষে এই অধ্যায়গুলি হবে পরম কল্যাণকর।

শ্লোক ২

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

রাজবিদ্যা—সমস্ত বিদ্যার রাজা; **রাজগুহ্যম্**—গোপনীয় জ্ঞানসমূহের রাজা; **পবিত্রম্**—পবিত্র; **ইদম্**—এই; **উত্তমম্**—উত্তম; **প্রত্যক্ষ**—প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা; **অবগমম্**—উপলব্ধ হয়; **ধর্ম্যম্**—ধর্ম; **সুসুখম্**—অত্যন্ত সুখদায়ক; **কর্তুম্**—অনুষ্ঠান করতে; **অব্যয়ম্**—অব্যয়।

গীতার গান

রাজবিদ্যা এই জ্ঞান রাজগুহ্য কহে ।
পবিত্র উত্তম তাহা সাধারণ নহে ॥
যাহার সাধনে হয় প্রত্যক্ষানুভব ।
সুসুখ সে ধর্ম হয় অব্যয় বৈভব ॥

অনুবাদ

এই জ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজা, সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব থেকেও গুহ্যতর, অতি পবিত্র এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা আত্ম-উপলব্ধি প্রদান করে বলে প্রকৃত ধর্ম। এই জ্ঞান অব্যয় এবং সুখসাধ্য।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার এই অধ্যায়টিকে রাজবিদ্যা বলা হয়েছে, কারণ পূর্ববর্ণিত সমস্ত মত ও দর্শনের সারমর্ম এই অধ্যায়ে প্রতিপাদন করা হয়েছে। ভারতবর্ষের প্রধান দার্শনিকদের মধ্যে রয়েছেন গৌতম, কণাদ, কপিল, যাজ্ঞবল্ক্য, শাণ্ডিল্য, বৈশ্বানর এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে *বেদান্ত-সূত্রের* রচয়িতা ব্যাসদেব। সুতরাং দর্শন অথবা দিব্য জ্ঞানে ভারত অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এখানে ভগবান বলেছেন যে, নবম অধ্যায়ে বর্ণিত তত্ত্বজ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজা এবং *বেদ* অধ্যয়ন ও বিভিন্ন দর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের সারতত্ত্ব। এই তত্ত্বজ্ঞান পরম গুহ্য, কারণ এই জ্ঞানের মাধ্যমে আত্মা ও দেহের পার্থক্য উপলব্ধি করা যায় এবং এই রাজবিদ্যার চরম পরিণতি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি।

সাধারণত, মানুষ এই রাজবিদ্যা শিক্ষা লাভ করে না; তাদের শিক্ষা কেবল বাহ্যিক জ্ঞানের মধ্যেই সীমিত। জাগতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে, মানুষ রাজনীতি, সমাজনীতি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, গণিত শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, যন্ত্র-বিজ্ঞান আদি বিভিন্ন বিভাগে সাধারণত শিক্ষা লাভ করে। সমগ্র বিশ্বে এই জ্ঞান অর্জনের বিভিন্ন বিভাগ ও বহু বিশ্ববিদ্যালয় আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এমন কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নেই, যেখানে চিন্ময় আত্মার তত্ত্ববিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। অথচ এই দেহে আত্মার মাহাত্ম্যই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আত্মাবিহীন দেহ মৃত। কিন্তু তবুও প্রাণের আধার এই আত্মাকে উপেক্ষা করে কেবল জড় দেহটির আবশ্যকতাগুলির উপরেই মানুষ গুরুত্ব আরোপ করে চলেছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, বিশেষ করে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আত্মতত্ত্বের মাহাত্ম্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ের শুরুতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, এই জড় দেহটি নশ্বর কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর (*অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ*)। দেহের থেকে আত্মা ভিন্ন এবং আত্মা অপরিবর্তনীয়, অবিনশ্বর ও সনাতন—এই মৌলিক উপলব্ধি হচ্ছে জ্ঞানের গুহ্য তত্ত্ব। কিন্তু এর মাধ্যমে আত্মার সম্বন্ধে কোন ইতিবাচক সংবাদ প্রদান করে না। কখনও কখনও মানুষ মনে করে যে, দেহ থেকে আত্মা ভিন্ন এবং দেহান্তর হলে অথবা দেহ থেকে মুক্তি লাভ হলে, আত্মা শূন্যে লীন হয়ে গিয়ে তার সত্তা হারিয়ে ফেলে এবং নির্বিশেষ হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। এটি কিভাবে সম্ভব যে, দেহে অবস্থিত অত্যন্ত সক্রিয় যে আত্মা, তা দেহ থেকে মুক্ত হওয়ার পর নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়? আত্মা নিত্য সক্রিয় থাকে। আত্মা যদি নিত্য হয়, তা হলে তার সক্রিয়তাও নিত্য এবং ভগবৎ-ধামে তার ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞানরাজ্যের গুহ্যতম অংশ। আত্মার এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে এখানে রাজবিদ্যা অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে পরম গুহ্যতম বলা হয়েছে।

এই জ্ঞান হচ্ছে সমস্ত কার্যকলাপের পরম বিশুদ্ধ রূপ। সেই কথা বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। *পদ্ম পুরাণে* মানুষের পাপকর্মের বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং পাপের পর পাপকর্মের পরিণাম দেখানো হয়েছে। যারা সকাম কর্মে নিয়োজিত, তারা পাপ-কর্মফলের বিভিন্ন স্তরে আবদ্ধ। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, যখন কোন বৃক্ষের বীজ রোপণ করা হয়, সেটি তৎক্ষণাৎ একটি বৃক্ষে পরিণত হয় না; তার জন্য কিছু সময় লাগে। সর্বপ্রথমে তা একটি চারা গাছে অঙ্কুরিত হয়, তারপর একটি গাছের রূপ ধারণ করে পল্লবিত হয় এবং ফুলে-ফলে শোভিত হয়। এভাবেই তা যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাকে যে রোপণ করেছিল, সে তার ফল ও ফুল উপভোগ করে। সেই রকম, মানুষের পাপকর্মের বীজেরও ফল প্রাপ্ত হতে সময় লাগে। কর্মফলের বিভিন্ন স্তর আছে। পাপকর্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়ার পরেও তার কর্তাকে সেই পাপকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। অনেক পাপকর্ম এখনও বীজরূপে রয়েছে, অনেক পাপের ফল দুঃখ-দুর্দশারূপে ফল প্রাপ্ত হয়েছে, যা আমরা এখনও ভোগ করছি।

সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টবিংশতি শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যে ব্যক্তি সমস্ত পাপকর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হয়েছেন এবং জড়-জাগতিক সংসারের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে সৎকর্ম-পরায়ণ হয়েছেন, তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হন। পক্ষান্তরে বলা যায়, যিনি ভক্তিযোগে

ভগবানের সেবা করছেন, তিনি ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণরূপে পাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন। এই কথা *পদ্ম পুরাণে* প্রতিপন্ন হয়েছে—

অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখম্ ।
ক্রমেণৈব প্রলীয়েত বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাম্ ॥

ভক্তি সহকারে যাঁরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবা করছেন, তাঁদের প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও বীজত্ব সমস্ত পাপকর্মের ফলই ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং ভগবদ্ভক্তিতে অত্যন্ত প্রবল পাপ নাশকারী শক্তি আছে। এই কারণে তাকে *পবিত্রম্ উত্তমম্* অর্থাৎ পরম পবিত্র বলা হয়। *উত্তমম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে অপ্রাকৃত। *তমস্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে এই জড় জগৎ অথবা অন্ধকার এবং *উত্তম* শব্দের অর্থ হচ্ছে জড় কার্যকলাপের অতীত। ভক্তিমূলক কার্যকলাপকে কখনই জড়-জাগতিক বলে মনে করা উচিত নয়। যদিও আপাত দৃষ্টিতে কখনও কখনও মনে হতে পারে যে, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত সাধারণ মানুষের মতোই কর্তব্যকর্ম করে চলেছে। ভক্তিযোগ সম্বন্ধে অবগত তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ জানেন যে, ভক্তের কাজকর্ম কখনই জড়-জাগতিক কাজকর্ম নয়। তাঁর সমস্ত কাজকর্মই জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত চিন্ময় এবং ভক্তিভাবময়।

এমন কথাও বলা হয়ে থাকে যে, ভগবদ্ভক্তির সাধন এতই উৎকৃষ্ট যে, তার পরিণাম সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ করা যায়। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, শ্রীকৃষ্ণের নাম সমন্বিত মহামন্ত্র—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে** অপরাধমুক্ত হয়ে কীর্তন করার ফলে সকলেরই যথাসময়ে অপ্রাকৃত আনন্দানুভূতি হয়, যার ফলে মানুষ অতি শীঘ্রই জড়-জাগতিক সমস্ত কলুষ থেকে পূর্ণরূপে পবিত্র হয়। এটি বাস্তবিকই দেখা গেছে। অধিকন্তু, কেবলমাত্র শ্রবণ করাই নয়, সেই সঙ্গে যদি কেউ কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযোগের কথা প্রচার করে অথবা কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচারের কাজকর্মে সহযোগিতা করে, তবে সেও উত্তরোত্তর পারমার্থিক উন্নতি অনুভব করে। পারমার্থিক জীবনের এই উন্নতি কোন প্রকার পূর্বার্জিত শিক্ষা বা যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না। এই পথ স্বরূপত এতই পবিত্র যে, তার অনুগামী হওয়া মাত্রই মানুষ আপনা থেকেই পবিত্র হয়ে ওঠে।

বেদান্ত-সূত্রে (৩/২/২৬) এই সিদ্ধান্তের নিরূপণ করা হয়েছে—*প্রকাশশ্চ কর্মণ্যভ্যাসাৎ*। "ভক্তিযোগ এত শক্তিশালী যে, তার অনুশীলন করার ফলে নিঃসন্দেহে দিব্য জ্ঞান লাভ করা যায়।" এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা যায় নারদ মুনির পূর্বজীবনে। ত্রিভুবনখ্যাত ভগবদ্ভক্ত দেবর্ষি নারদ পূর্বজন্মে এক দাসীর পুত্র ছিলেন।

তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা ছিল না অথবা কৌলীন্যও ছিল না। কিন্তু তাঁর মা যখন মহাভাগবতদের সেবা করেছিলেন, তখন তিনিও তাঁদের সেবাপরায়ণ হতেন এবং কখনও কখনও তাঁর মায়ের অনুপস্থিতিতে তিনি নিজেই সেই মহাভাগবতদের সেবা করতেন। নারদ মুনি নিজেই বলেছেন—

উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ
সকৃৎস্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ ।
এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতস-
স্তদ্ধর্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের (১/৫/২৫) এই শ্লোকটিতে নারদ মুনি তাঁর শিষ্য শ্রীব্যাসদেবকে তাঁর পূর্বজন্মের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, পূর্বজন্মে বাল্যকালে চাতুর্মাস্যের সময় তিনি কয়েকজন মহাভাগবতের সেবা করেছিলেন। যার ফলে তিনি তাঁদের অন্তরঙ্গ সঙ্গ লাভ করেন। তাঁদের অনুগ্রহক্রমে তিনি তাঁদের ভিক্ষাপাত্র সংলগ্ন উচ্ছিষ্ট অন্ন একবার মাত্র ভোজন করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁর পাপ দূর হয় এবং চিত্ত মার্জিত হয়। তখন তাঁর হৃদয় সেই মহাভাগবতদের মতো নির্মল হয় এবং তাতে পরমেশ্বরের আরাধনায় রুচি জাগ্রত হয়। সেই মহাভাগবতেরা শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে নিরন্তর ভগবদ্ভক্তির রসাস্বাদন করতেন। সেই রুচির উন্মেষ হওয়ার ফলে নারদও শ্রবণ ও কীর্তনে অত্যন্ত উৎসাহিত হন। নারদ মুনি তাই আরও বলেছেন—

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা-
মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেহনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রুচিঃ ॥

সাধুসঙ্গের প্রভাবে নারদ ভগবানের মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনে রুচি লাভ করেন এবং তাঁর হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির প্রতি তীব্র আসক্তি জন্মায়। তাই, *বেদান্ত-সূত্রে* উল্লেখ করা হয়েছে, *প্রকাশশ্চ কর্মণ্যভ্যাসাৎ*—ভগবদ্ভক্তিতে অনন্য নিষ্ঠা হলে ভক্তের হৃদয়ে পূর্ণরূপে সকল প্রকার ভগবৎ-তত্ত্বের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ হয় এবং তখন তিনি সব কিছু হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। একেই বলা হয় 'প্রত্যক্ষ' অনুভূতি।

এই শ্লোকে *ধর্ম্যম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'ধর্মের পথ'। নারদ মুনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে এক দাসীপুত্র, তাই তিনি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পাননি। তিনি কেবল তাঁর মাকে সাহায্য করতেন এবং সৌভাগ্যক্রমে তাঁর মা ভগবদ্ভক্তের

সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। শিশু নারদও সেই সুযোগ পেয়েছিলেন এবং কেবল সাধুসঙ্গের প্রভাবেই তিনি সমস্ত ধর্মের পরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে যে, সমস্ত ধর্ম আচরণের পরম লক্ষ্য হচ্ছে ভক্তিযোগ (*স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে*)। ধর্মপরায়ণ লোকেরা সাধারণত জানে না যে, ধর্মাচরণের চরম সার্থকতা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি লাভ করা। অষ্টম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটিতে (*বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব*) আমরা ইতিমধ্যেই সেই সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। সাধারণত আত্ম-উপলব্ধি করতে হলে বৈদিক জ্ঞানের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু এখানে, যদিও নারদ কখনও কোন গুরুদেবের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যাননি এবং বৈদিক সিদ্ধান্তে শিক্ষিত হতে পারেননি, তবুও তিনি বৈদিক জ্ঞান অনুশীলনে পরম সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই ভক্তিপথ এতই শক্তিশালী যে, নিয়মিতভাবে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান না করেও পরম সিদ্ধি লাভ করা যায়। এটি কি করে সম্ভব? বৈদিক সাহিত্যে সেই সম্বন্ধে প্রতিপন্ন হয়েছে—*আচার্যবান্ পুরুষো বেদ*। মহান আচার্যদের সঙ্গ লাভ করার ফলে অশিক্ষিত ও বৈদিক জ্ঞানে সম্পূর্ণ অজ্ঞ মানুষও আত্ম-উপলব্ধির উপযোগী জ্ঞান সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন।

ভক্তিযোগের পথ অত্যন্ত সুখসাধ্য (*সুসুখম্*)। কেন? ভক্তিযোগের অঙ্গ হচ্ছে *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*, সুতরাং ভগবানের নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ, কীর্তন অথবা প্রামাণিক আচার্যদের দিব্যজ্ঞান সমন্বিত দার্শনিক প্রবচন শোনার মাধ্যমে ভক্তিযোগ সাধিত হয়। শুধু বসে বসেই শিক্ষা লাভ করা যায় এবং তারপর ভগবানের সুস্বাদু প্রসাদ আস্বাদন করা যায়। যে-কোন অবস্থায় ভক্তিযোগ অত্যন্ত আনন্দদায়ক। পরম দারিদ্র্যের মধ্যেও ভক্তিযোগ সাধন করা যায়। ভগবান বলেছেন, *পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্*—তিনি ভক্তের নিবেদিত সব কিছুই গ্রহণ করতে প্রস্তুত এবং তা যা-ই হোক না কেন তাতে কিছু মনে করেন না। পত্র, পুষ্প, ফল, জল আদি পৃথিবীর সর্বত্রই পাওয়া যায় এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যে কেউ ভগবানকে তা প্রেমভক্তি সহকারে নিবেদন করতে পারে। ভক্তি সহকারে ভগবানকে যা কিছু অর্পণ করা হয়, তা-ই তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন। ইতিহাসে এর অনেক উদাহরণ আছে। ভগবানের চরণে অর্পিত তুলসীর সৌরভ শুধুমাত্র ঘ্রাণ করে সনৎকুমার আদি মহর্ষিরা মহাভাগবতে পরিণত হন। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, ভক্তির পন্থা অতি উত্তম এবং অত্যন্ত সুখসাধ্য। ভগবানকে আমরা যা কিছুই নিবেদন করি না কেন, তিনি কেবল আমাদের ভালবাসাটাই গ্রহণ করেন।

এখানে ভক্তিযোগকে শাশ্বত নিত্য বলা হয়েছে। এই ভক্তি মায়াবাদীদের মতবাদকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত করে। মায়াবাদীরা কখনও কখনও নামমাত্র ভক্তি অনুশীলন করে এবং মুক্তি লাভ না করা পর্যন্ত তার আচরণ করতে থাকে, কিন্তু

সব শেষে যখন তারা মুক্ত হয়, তখন ভক্তি ত্যাগ করে 'ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যায়'। অত্যন্ত স্বার্থপরায়ণ এই ভক্তিকে শুদ্ধ ভক্তি বলা যায় না। যথার্থ ভক্তিযোগের অনুশীলন এমন কি মুক্তির পরেও পূর্ববৎ চলতে থাকে। ভক্ত যখন ভগবৎ-ধামে ফিরে যান, তখন তিনি সেখানেও ভগবৎ-সেবায় মগ্ন থাকেন। ভক্ত কখনই ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন না।

ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, যথার্থ ভক্তিযোগের শুরু হয় মুক্তি লাভের পরে। মুক্তির পরে কেউ যখন ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখনই তাঁর ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন শুরু হয় (*সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্*)। স্বাধীনভাবে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ অথবা অন্য যে কোন যোগ অনুষ্ঠান করলেও পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় না। এই সব যৌগিক পদ্ধতির সাহায্যে ভক্তিযোগের পথে মানুষ কিছুটা অগ্রসর হতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির স্তরে উপনীত না হলে পুরুষোত্তম ভগবান যে কি, কেউ তা বুঝতে পারে না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* এই কথা প্রতিপন্ন করাও হয়েছে যে, ভক্তিযোগ সাধন করার ফলে, বিশেষত মহাভাগবতদের মুখারবিন্দ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবত* অথবা *ভগবদ্গীতা* শ্রবণ করলে কৃষ্ণতত্ত্ব বা ভগবৎ-তত্ত্ব জানা যায়। *এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ*। হৃদয় যখন সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্তি ও অনর্থ থেকে মুক্ত হয়, তখন মানুষ বুঝতে পারে ভগবান কি। এভাবেই ভগবদ্ভক্তি বা কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা হচ্ছে সমস্ত বিদ্যার রাজা এবং সমস্ত গুহ্যতত্ত্বের রাজা। এটি হচ্ছে পরম বিশুদ্ধ ধর্ম এবং আনন্দের সঙ্গে অনায়াসে এর অনুশীলন করা চলে। তাই, এই পন্থা গ্রহণ করা মানুষের অবশ্যই কর্তব্য।

শ্লোক ৩

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥

অশ্রদ্দধানাঃ—শ্রদ্ধাহীন; **পুরুষাঃ**—ব্যক্তিরা; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **অস্য**—এই; **পরন্তপ**—হে পরন্তপ; **অপ্রাপ্য**—না পেয়ে; **মাম্**—আমাকে; **নিবর্তন্তে**—ফিরে আসে; **মৃত্যু**—মৃত্যুর; **সংসার**—সংসার; **বর্ত্মনি**—পথে।

গীতার গান

যাহার সে শ্রদ্ধা নাই ওহে পরন্তপ ।
এই ধর্ম বিজ্ঞানেতে বৃথা জপতপ ॥

সে আমাকে নাহি পায় জানিহ নিশ্চয় ।
মৃত্যু সংসারের পথে নিরন্তর রয় ॥

অনুবাদ

হে পরন্তপ! এই ভগবদ্ভক্তিতে যাদের শ্রদ্ধা উদিত হয়নি, তারা আমাকে লাভ করতে পারে না। তাই, তারা এই জড় জগতে জন্ম-মৃত্যুর পথে ফিরে আসে।

তাৎপর্য

শ্রদ্ধাহীন মানুষের পক্ষে ভক্তিযোগ সাধন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব; এটি হচ্ছে এই শ্লোকের তাৎপর্য। সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধার উদয় হয়। কিন্তু কিছু মানুষ এতই হতভাগ্য যে, মহাপুরুষদের মুখারবিন্দ থেকে *বেদের* সমস্ত প্রমাণ শ্রবণ করার পরেও তাদের হৃদয়ে ভগবানের প্রতি বিশ্বাসের উদয় হয় না। সন্দেহান্বিত হওয়ার ফলে তারা ভক্তিযোগে স্থির থাকতে পারে না। তাই, কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করবার জন্য শ্রদ্ধাই হচ্ছে সবচেয়ে মহত্ত্বপূর্ণ অঙ্গ। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* বলা হয়েছে যে, শ্রদ্ধা হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে দৃঢ় বিশ্বাস, অর্থাৎ শুধুমাত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার দ্বারা মানুষ সব রকমের সার্থকতা অর্জন করতে পারে। একেই বলা হয় প্রকৃত বিশ্বাস। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (৪/৩১/১৪) বলা হয়েছে—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥

"গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন তার শাখা-প্রশাখা ও পল্লবাদি আপনা থেকেই পুষ্ট হয়, উদরকে খাদ্য দিলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রসন্ন হয়, তেমনই চিন্ময় ভগবৎ-সেবা করার ফলে সমস্ত দেবতা ও জীব আপনা থেকেই সন্তুষ্ট হয়।" সুতরাং, *ভগবদ্গীতা* অধ্যয়ন করে অবিলম্বে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত যে, অন্য সমস্ত কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই হচ্ছে কর্তব্য। জীবনের এই দর্শনের প্রতি বিশ্বাসই হচ্ছে যথার্থ শ্রদ্ধা। আর এই শ্রদ্ধাই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত।

এখন, সেই বিশ্বাসের উন্নতি সাধন করাই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার পন্থা। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত মানুষকে তিন প্রকারে ভাগ করা যায়। সর্বনিম্ন তৃতীয় স্তরে যারা আছে, তাদের কোনই বিশ্বাস নেই। এমন কি যদিও তারা আনুষ্ঠানিকভাবে ভগবদ্ভক্তি

অনুশীলনে নিযুক্ত থাকে, তবুও তারা পরম সার্থকতার স্তর অর্জন করতে পারে না। এদের অধিকাংশই কিছুকাল পরে হয়ত ভক্তিমার্গ থেকে স্খলিত হয়। তারা কিছু কালের জন্য ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত থাকতে পারে, কিন্তু পূর্ণ শ্রদ্ধা না থাকার ফলে তাদের পক্ষে অধিককাল কৃষ্ণভাবনায় নিযুক্ত থাকা অত্যন্ত কঠিন। আমাদের প্রচারকার্যে আমরা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছি যে, কিছু লোক গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন শুরু করে এবং তাদের আর্থিক অবস্থা কিছুটা ভাল হলে তারা এই পন্থা পরিত্যাগ করে আবার পুরানো জীবনধারা গ্রহণ করে। কেবলমাত্র শ্রদ্ধার দ্বারাই মানুষ কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করতে পারে। শ্রদ্ধার উন্নতি সাধন সম্বন্ধে বলা যায়, ভক্তি সম্বন্ধীয় শাস্ত্রগ্রন্থে যিনি পারদর্শী এবং যিনি দৃঢ় শ্রদ্ধার স্তর লাভ করেছেন, তাঁকে কৃষ্ণভাবনায় প্রথম শ্রেণীর মানুষ বা উত্তম অধিকারী বলা হয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যম অধিকারী হচ্ছেন তিনি, যিনি শাস্ত্রজ্ঞানে ততটা পারদর্শী নন, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, কৃষ্ণভক্তিই হচ্ছে সর্বোত্তম মার্গ এবং তাই দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি এই মার্গ অনুসরণ করেন। এভাবেই মধ্যম অধিকারী কনিষ্ঠ অধিকারীর থেকে উত্তম। কনিষ্ঠ অধিকারীর যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞান ও দৃঢ় শ্রদ্ধা এই দুইয়েরই অভাব। কিন্তু তাঁরা সাধুসঙ্গ ও নিষ্কপট সহকারে ভক্তিমার্গ অবলম্বন করেন। কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে কনিষ্ঠ অধিকারীর পতন হতে পারে, কিন্তু কেউ যখন মধ্যম অধিকারীতে স্থিত হন, তিনি তখন পতিত হন না এবং কৃষ্ণভাবনায় উত্তম অধিকারীর পতনের কখনও সম্ভাবনাই থাকে না। উত্তম অধিকারী নিশ্চিতভাবে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করে অবশেষে সুফল প্রাপ্ত হন। কনিষ্ঠ অধিকারীর যদিও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের উপযোগিতা সম্পর্কে বিশ্বাস জেগেছে, কিন্তু সে *শ্রীমদ্ভাগবত* ও *ভগবদ্গীতা* আদি শাস্ত্রের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ করেনি। কখনও কখনও কৃষ্ণভাবনামৃতের এই কনিষ্ঠ অধিকারীদের কর্মযোগ অথবা জ্ঞানযোগের প্রতি কিছুটা প্রবণতা থাকে এবং কখনও কখনও তারা ভক্তিমার্গ থেকে বিচলিত হয়ে পড়ে; কিন্তু কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ আদির সংক্রমণ থেকে মুক্ত হওয়ার পর তারা কৃষ্ণভাবনায় মধ্যম অথবা উত্তম অধিকারীতে পরিণত হতে পারে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* কৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধার তিনটি স্তরের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* একাদশ স্কন্ধে প্রথম শ্রেণীর আসক্তি, দ্বিতীয় শ্রেণীর আসক্তি ও তৃতীয় শ্রেণীর আসক্তির কথাও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কৃষ্ণকথা তথা ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্বের কথা শ্রবণ করা সত্ত্বেও যাদের শ্রদ্ধার উদয় হয় না এবং যারা কেবল সেগুলিকে স্তুতিমাত্র বলে মনে করে, তাদের কাছে এই পথ অত্যন্ত দুর্গম বলে

প্রতিভাত হয়, এমন কি যদিও তারা তথাকথিতভাবে ভক্তিযোগে তৎপর আছে বলে মনে হয়। তাদের পক্ষে সিদ্ধি লাভ করার কোনই আশা নেই। এভাবেই আমরা দেখতে পাই যে, ভক্তিযোগ সাধনে শ্রদ্ধা অত্যন্ত দরকারি।

শ্লোক ৪

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

ময়া—আমার দ্বারা; **ততম্**—ব্যাপ্ত; **ইদম্**—এই; **সর্বম্**—সমস্ত; **জগৎ**—বিশ্ব; **অব্যক্তমূর্তিনা**—অব্যক্তরূপে; **মৎস্থানি**—আমাতে অবস্থিত; **সর্বভূতানি**—সমস্ত জীব; **ন**—না; **চ**—ও; **অহম্**—আমি; **তেষু**—তাতে; **অবস্থিতঃ**—অবস্থিত।

গীতার গান

অব্যক্ত যে নির্বিশেষ আমারই রূপ ।
জগৎ ব্যাপিয়া থাকি অনির্দিষ্ট রূপ ॥
আমাতে জগৎ সব না আমি তাহাতে ।
পরিণাম হয় তাহা আমার শক্তিতে ॥

অনুবাদ

অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই।

তাৎপর্য

স্থূল ও জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় না। কথিত আছে যে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

(*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব* ২/২৩৪)

জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, লীলা আদি উপলব্ধি করা যায় না। সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে যিনি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সাধন করেন, তাঁর নিকট তিনি

প্রকাশিত হন। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বলা হয়েছে, *প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তি-বিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি*—পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীগোবিন্দের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমভক্তি বিকাশ সাধন করার ফলে অন্তরে ও বাইরে তাঁকে সর্বদা দর্শন করা যায়। তাই, তিনি সকলের কাছে প্রকট নন। এখানে বলা হয়েছে, যদিও তিনি সর্বব্যাপ্ত, সর্বত্র দৃশ্য, তবুও তিনি জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গোচরীভূত নন। এখানে *অব্যক্তমূর্তিনা* কথাটির দ্বারা সেই কথাই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, যদিও আমরা তাঁকে দেখতে পাই না, তবুও সব কিছু তাঁকেই আশ্রয় করে আছে। সপ্তম অধ্যায়ে আমরা যে আলোচনা করেছি, সেই অনুসারে সমস্ত মহাজাগতিক সৃষ্টি ভগবানের উৎকৃষ্ট চিন্ময় শক্তি ও নিকৃষ্ট জড় শক্তির সমন্বয় মাত্র। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে সূর্যকিরণের বিস্তারের মতো ভগবানের শক্তি সম্পূর্ণ সৃষ্টিতে বিস্তারিত এবং সব কিছুই সেই শক্তির আশ্রয়ে বিদ্যমান।

কিন্তু তা বলে এই সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে, ভগবান যেহেতু সর্বব্যাপ্ত, তাই তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সত্তা হারিয়ে ফেলেছেন। এই যুক্তিকে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করবার জন্য ভগবান বলেছেন, "আমি সর্বব্যাপক এবং সব কিছুই আমাকে আশ্রয় করে আছে, কিন্তু তবুও আমি সব কিছু থেকে স্বতন্ত্র।" উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, রাজা যেমন তাঁর প্রশাসনের অধীশ্বর বা প্রশাসন তাঁর একটি শক্তির প্রকাশ; বিবিধ প্রশাসনিক বিভাগে তাঁর বিভিন্ন শক্তি এবং প্রতিটি বিভাগ তাঁর ক্ষমতার উপর আশ্রিত। কিন্তু তবুও তিনি স্বয়ং প্রতিটি বিভাগে ব্যক্তিগতভাবে বর্তমান থাকেন না। এটি অবশ্য একটি স্থূল উদাহরণ। সেই রকম, যা কিছু আমরা দেখি এবং জড় জগতে ও চিন্ময় জগতে যত সৃষ্টি আছে, সব কিছুই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শক্তিকে আশ্রয় করে বর্তমান। ভগবানের বিভিন্ন শক্তির প্রসারণের ফলে সৃষ্টির উদ্ভব হয় এবং *ভগবদ্গীতাতে* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নম্*—তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিনিধির দ্বারা বা বিভিন্ন শক্তির পরিব্যাপ্তির দ্বারা তিনি সর্বত্রই বিদ্যমান।

শ্লোক ৫

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

ন—না; **চ**—ও; **মৎস্থানি**—আমাতে স্থিত; **ভূতানি**—সমগ্র সৃষ্টি; **পশ্য**—দেখ; **মে**—আমার; **যোগমৈশ্বরম্**—অচিন্ত্য যোগশক্তি; **ভূতভৃৎ**—সমস্ত জীবের ধারক;

ন—না; চ—ও; ভূতস্থঃ—জড় সৃষ্টির মধ্যে; মম—আমার; আত্মা—স্বরূপ; ভূতভাবনঃ—সমগ্র জগতের উৎস।

গীতার গান

আমার শক্তিতে থাকে ভিন্ন আমা হতে ।
যোগৈশ্বর্য সেই মোর বুঝ ভাল মতে ॥
ভর্তা সকল ভূতের নহি সে ভূতস্থ ।
ভূতভৃৎ নাম মোর ভূতাদি তটস্থ ॥

অনুবাদ

যদিও সব কিছুই আমারই সৃষ্ট, তবুও তারা আমাতে অবস্থিত নয়। আমার যোগৈশ্বর্য দর্শন কর! যদিও আমি সমস্ত জীবের ধারক এবং যদিও আমি সর্বব্যাপ্ত, তবুও আমি এই জড় সৃষ্টির অন্তর্গত নই, কেন না আমি নিজেই সমস্ত সৃষ্টির উৎস।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে বলেছেন যে, সব কিছু তাঁকে আশ্রয় করে আছে (*মৎস্থানি সর্বভূতানি*)। ভগবানের এই উক্তির ভ্রান্ত অর্থ করা উচিত নয়। এই জড় সৃষ্টির পালন-পোষণের ব্যাপারে ভগবানের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। কখনও কখনও ছবিতে দেখি যে, গ্রীক পুরাণের অ্যাটলাস নামে এক অতিকায় পুরুষ তার কাঁধে পৃথিবী ধারণ করে আছে। তাকে দেখে মনে হয় এই বিশাল পৃথিবী গ্রহটির ভার বহন করে সে অত্যন্ত ক্লান্ত। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেভাবে ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করেন না। তিনি বলেছেন, যদিও সব কিছু তাঁকে আশ্রয় করে আছে, তবুও তিনি তাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গ্রহমণ্ডলী মহাকাশে ভাসছে এবং এই মহাকাশ হচ্ছে ভগবানের শক্তি। কিন্তু তিনি মহাকাশ থেকে ভিন্ন। তিনি স্বতন্ত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাই ভগবান বলেছেন, "তারা যদিও আমার অচিন্ত্য শক্তিতে অবস্থান করে, কিন্তু তবুও পরমেশ্বর ভগবানরূপে আমি তাদের থেকে স্বতন্ত্র।" এটিই হচ্ছে ভগবানের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য।

নিরুক্তি নামে বৈদিক অভিধানে বলা হয়েছে যে, *যুজ্যতেঽনেন দুর্ঘটেষু কার্যেষু*—"ভগবান তাঁর বিচিত্র শক্তির প্রভাবে অদ্ভুত, অচিন্ত্য লীলা পরিবেশন করেন।" তিনি বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন পুরুষ এবং তাঁর সংকল্পই হচ্ছে বাস্তব সত্য। এভাবেই পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা উচিত। আমরা অনেক কিছুই করার ইচ্ছা করতে পারি, কিন্তু তাদের বাস্তবে রূপদান করতে গেলে আমাদের নানা রকমের প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হতে হয় এবং অনেক সময় আমাদের ইচ্ছানুসারে তা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন কোন কিছু করতে চান, তখন তাঁর সংকল্প মাত্রই সমস্ত কিছু এত সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয় যে, তা কল্পনাও করা যায় না। ভগবান এই সত্যের ব্যাখ্যা করে বলেছেন—যদিও তিনি সম্পূর্ণ সৃষ্টির ধারক ও প্রতিপালক, কিন্তু তবুও তিনি তা স্পর্শও করেন না। কেবলমাত্র তাঁর পরম বলবতী ইচ্ছা শক্তির দ্বারাই সম্পূর্ণ সৃষ্টির সৃজন, ধারণ, পালন ও সংহার সাধিত হয়। আমাদের জড় মন ও স্বয়ং আমি, এর মধ্যে ভেদ আছে, কিন্তু ভগবানের মন ও স্বয়ং তিনি সর্বদাই অভিন্ন, কারণ তিনি হচ্ছেন পরম চৈতন্য। যুগপৎভাবে ভগবান সব কিছুর মধ্যে বিদ্যমান; তবুও সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না কিভাবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সব কিছুর মধ্যে বিদ্যমান। ভগবান এই সৃষ্টির থেকে ভিন্ন, তবুও সব কিছুই তাঁকে আশ্রয় করে আছে। এই অচিন্ত্য সত্যকে এখানে *যোগমৈশ্বরম্* অর্থাৎ ভগবানের যোগশক্তি বলা হয়েছে।

শ্লোক ৬

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্ ।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

যথা—যেমন; **আকাশস্থিতঃ**—আকাশে অবস্থিত; **নিত্যম্**—সর্বদা; **বায়ুঃ**—বায়ু; **সর্বত্রগঃ**—সর্বত্র বিচরণশীল; **মহান্**—মহান; তথা—তেমনই; **সর্বাণি**—সমস্ত; ভূতানি—জীবসমূহ; **মৎস্থানি**—আমাতে অবস্থিত; **ইতি**—এভাবে; **উপধারয়**—উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর।

গীতার গান

আকাশ আর যে বায়ু সেরূপ তুলনা ।
আকাশ পৃথক হতে বায়ুর চালনা ॥
আকাশ সর্বত্র ব্যাপ্ত বায়ু যথা থাকে ।
তথা সর্বভূত স্থিত থাকে যে আমাতে ॥

অনুবাদ

অবগত হও যে, মহান বায়ু যেমন সর্বত্র বিচরণশীল হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা আকাশে অবস্থান করে, তেমনই সমস্ত সৃষ্ট জীব আমাতে অবস্থান করে।

তাৎপর্য

এই বিশাল জড় জগৎ কিভাবে ভগবানকে আশ্রয় করে আছে, এই সত্য সাধারণ মানুষের কাছে অচিন্তনীয়। তাই, আমাদের বোঝাবার জন্য ভগবান এখানে এই উদাহরণের অবতারণা করেছেন। এই সৃষ্টিতে, আমাদের কল্পনায় আকাশ হচ্ছে সবচেয়ে বড়। আর সেই আকাশের মধ্যে বাতাস হচ্ছে মহাজগতের সবচেয়ে বিশাল এক অভিপ্রকাশ। সেই বাতাসের চলাচল থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয় অন্য সব কিছুর চলাচল। কিন্তু এই মহান বায়ু অত বিশাল হলেও আকাশের মধ্যেই তার অবস্থান; বাতাস তো আকাশের বাইরে নয়। তেমনই, চমকপ্রদ সমস্ত সৃষ্টি ভগবানেরই ইচ্ছার প্রভাবে বিদ্যমান এবং সেই সমস্ত পূর্ণরূপে তাঁরই ইচ্ছার অধীন। যেমন আমরা সাধারণত বলে থাকি, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া একটি পাতাও নড়ে না। এভাবেই সব কিছুই তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে সাধিত হয়—তাঁরই ইচ্ছায় সব কিছুর সৃষ্টি হচ্ছে, সব কিছুর পালন হচ্ছে এবং সব কিছুর বিনাশ হচ্ছে। কিন্তু তবুও তিনি সব কিছুর থেকে পৃথক, যেমন আকাশ সব সময়ই বায়ুমণ্ডলের ক্রিয়াকলাপ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে বিরাজ করে।

উপনিষদে বলা হয়েছে, *যদ্‌ভীষা বাতঃ পবতে*—"ভগবানের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়।" (*তৈত্তিরীয় উপনিষদ* ২/৮/১)। *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* (৩/৮/৯) বলা হয়েছে—*এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ*। "পরমেশ্বর ভগবানের পরম আজ্ঞার ফলে চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য বৃহৎ গ্রহমণ্ডলী তাদের কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে।" *ব্রহ্মসংহিতাতেও* (৫/৫২) বলা হয়েছে—

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

এখানে সূর্যের ভ্রমণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তাপ ও আলো বিকিরণকারী অনন্ত শক্তিসম্পন্ন সূর্য ভগবানের একটি চক্ষুবিশেষ। শ্রীগোবিন্দের আজ্ঞা ও ইচ্ছা

অনুসারে তিনি তাঁর কক্ষপথে পরিভ্রমণ করেন। সুতরাং, বৈদিক শাস্ত্র থেকে প্রমাণিত হয় যে, অতি অদ্ভুত ও মহানরূপে প্রতিভাত হয় যে জড় সৃষ্টি, তা পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানেরই নিয়ন্ত্রণাধীন। এই অধ্যায়ে পরবর্তী শ্লোকগুলিতে এই তথ্যের বিশদ বর্ণনা করা হবে।

শ্লোক ৭

সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্ ।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

সর্বভূতানি—সমগ্র সৃষ্টি; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **প্রকৃতিম্**—প্রকৃতি; **যান্তি**—প্রবেশ করে; **মামিকাম্**—আমার; **কল্পক্ষয়ে**—কল্পের অবসানে; **পুনঃ**—পুনরায়; **তানি**—তাদের সকলকে; **কল্পাদৌ**—কল্পের শুরুতে; **বিসৃজামি**—সৃষ্টি করি; **অহম্**—আমি।

গীতার গান

প্রকৃতির লয় হলে বিশ্রাম আমাতে ।
কল্পারম্ভে হয় সৃষ্টি পুনঃ আমা হতে ॥
প্রলয়ের পরে থাকি আমি যে ঈশ্বর ।
সৃষ্টাসৃষ্ট যাহা কিছু আমার কিঙ্কর ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! কল্পান্তে সমস্ত জড় সৃষ্টি আমারই প্রকৃতিতে প্রবেশ করে এবং পুনরায় কল্পারম্ভে প্রকৃতির দ্বারা আমি তাদের সৃষ্টি করি।

তাৎপর্য

এই জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পূর্ণরূপে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। 'কল্পের অবসানে' মানে ব্রহ্মার মৃত্যু হলে। ব্রহ্মার আয়ু একশ বছর। তাঁর একদিন পৃথিবীর ৪৩০,০০,০০,০০০ বছরের সমান। তাঁর রাত্রির স্থায়িত্বও সম পরিমাণ। তাঁর এক মাস এই রকম ত্রিশ দিন ও রাত্রির সমন্বয়। এই রকম বারোটি মাসে তাঁর এক বৎসর হয়। এই রকম একশ বছর পরে ব্রহ্মার যখন মৃত্যু হয়, তখন প্রলয় হয়। এর অর্থ হচ্ছে ভগবানের দ্বারা অভিব্যক্ত শক্তি পুনরায় তাঁরই মধ্যে লয় হয়ে যায়। তার পরে আবার যখন

জড় জগতের সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, তখন তাঁর ইচ্ছানুসারে তা সম্পন্ন হয়। *বহু স্যাম্*—"এক হলেও আমি বহুরূপ ধারণ করব।" এটি হচ্ছে বৈদিক সূত্র (*ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৬/২/৩)। তিনি নিজেকে এই মায়াশক্তিতে বিস্তার করেন এবং তার ফলে সমস্ত জড় জগৎ পুনরায় প্রকট হয়।

শ্লোক ৮

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ ॥

প্রকৃতিম্—জড়া প্রকৃতি; **স্বাম্**—আমার নিজের; **অবষ্টভ্য**—আশ্রয় করে; **বিসৃজামি**—সৃষ্টি করি; **পুনঃ পুনঃ**—বার বার; **ভূতগ্রামম্**—সমগ্র জড় সৃষ্টি; **ইমম্**—এই; **কৃৎস্নম্**—সমগ্র; **অবশম্**—আপনা থেকে; **প্রকৃতেঃ**—প্রকৃতির; **বশাৎ**—বশে।

গীতার গান

আমার প্রকৃতি দ্বারা সৃজি পুনঃ পুনঃ ।
প্রকৃতির বশে হয় যত ভূতগ্রাম ॥

অনুবাদ

এই জগৎ আমারই প্রকৃতির অধীন। তা প্রকৃতির বশে অবশ হয়ে আমার ইচ্ছার দ্বারা পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হয় এবং আমারই ইচ্ছায় অন্তকালে বিনষ্ট হয়।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎ ভগবানেরই অপরা বা নিকৃষ্ট শক্তির অভিব্যক্ত। সেই কথা পূর্বেই কয়েকবার বর্ণনা করা হয়েছে। সৃষ্টির সময় জড়া শক্তি মহৎ-তত্ত্বরূপে পরিণত হয় এবং প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু তাতে প্রবেশ করেন। তিনি কারণ সমুদ্রে শায়িত থাকেন এবং তাঁর নিঃশ্বাসের ফলে কারণ সমুদ্রে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং সেই প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে তিনি আবার গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করেন। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। তিনি নিজেকে আবার ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রকাশিত করেন এবং সেই বিষ্ণু সর্বভূতে প্রবিষ্ট হন—এমন কি অতি ক্ষুদ্র পরমাণুতেও প্রবেশ করেন। সেই তত্ত্ব এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনি সব কিছুর মধ্যে প্রবেশ করেন।

এখন, জীবদের সম্পর্কে যা সংঘটিত হতে থাকে তা হচ্ছে, সেগুলিকে জড়া প্রকৃতির গর্ভে সঞ্চারিত করা হয় এবং তাদের অতীতের কর্ম অনুসারে তারা বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এভাবেই এই জড় জগতের কার্যকলাপ শুরু হয়। সৃষ্টির একেবারে শুরু থেকেই বিভিন্ন প্রজাতির জীবদের কার্যকলাপ শুরু হয়ে যায়। এমন নয় যে, সব কিছুই বিবর্তিত হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই একই সময়ে বিভিন্ন প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ, পশু, পাখি—সমস্তই একই সঙ্গে সৃষ্ট হয়েছে, কারণ পূর্ব কল্পের প্রলয়ের সময় জীবদের যার যেমন বাসনা ছিল, সেভাবেই তারা আবার অভিব্যক্ত হয়েছে। এখানে *অবশম্* শব্দটির দ্বারা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এই প্রক্রিয়াতে জীবদের কিছুই করার সামর্থ্য থাকে না। পূর্ব সৃষ্টিকালের মধ্যে তাদের পূর্ব জীবনে তাদের সত্তার যে অবস্থা ছিল, ঠিক সেভাবেই তারা আবার অভিব্যক্ত হয় এবং এ সবই সাধিত হয় শুধুমাত্র পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই। এটিই হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি এবং বিভিন্ন জীব-প্রজাতি সৃষ্টি করার পরে তাদের সঙ্গে তাঁর কোন সংস্পর্শ থাকে না। বিভিন্ন জীবের কর্মবাসনা পূর্ণ করবার জন্যই জড় জগতের সৃষ্টি হয় এবং তাই ভগবান এই জড় জগতের সঙ্গে লিপ্ত হন না।

শ্লোক ৯

ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু ॥ ৯ ॥

ন—না; **চ**—ও; **মাম্**—আমাকে; **তানি**—সেই সমস্ত; **কর্মাণি**—কর্ম; **নিবধ্নন্তি**—বন্ধন করে; **ধনঞ্জয়**—হে ধনঞ্জয়; **উদাসীনবৎ**—উদাসীনের ন্যায়; **আসীনম্**—অবস্থিত; **অসক্তম্**—আসক্তি রহিত; **তেষু**—সেই সমস্ত; **কর্মসু**—কর্মে।

গীতার গান

কিন্তু ধনঞ্জয় তুমি বুঝিবে নিশ্চয় ।
প্রকৃতির কার্যে কভু আমি লিপ্ত নয় ॥
উদাসীন আমি সেই প্রকৃতির কার্যে ।
আসক্তি নহে ত মোর প্রকৃতি বিধার্যে ॥

অনুবাদ

হে ধনঞ্জয়! সেই সমস্ত কর্ম আমাকে আবদ্ধ করতে পারে না। আমি সেই সমস্ত কর্মে অনাসক্ত ও উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত থাকি।

তাৎপর্য

এই সম্বন্ধে এটি মনে করা উচিত নয় যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান নিষ্ক্রিয়। তাঁর চিন্ময় জগতে তিনি নিত্য সক্রিয় হয়ে রয়েছেন। *ব্রহ্মসংহিতাতে* (৫/৬) বলা হয়েছে, *আত্মারামস্য তস্যাস্তি প্রকৃত্যা ন সমাগমঃ*—"তিনি তাঁর শাশ্বত, আনন্দময় ও চিন্ময় রসাত্মক লীলায় নিত্য তৎপর, কিন্তু এই জড় জগতের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে তাঁর কোন সংসর্গ নেই।" সমস্ত জড়-জাগতিক ক্রিয়াগুলি তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। ভগবান তাঁর সৃষ্ট জগতের সমস্ত জড়-জাগতিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি নিত্য উদাসীন থাকেন। এখানে *উদাসীনবৎ* কথাটির মাধ্যমে তাঁর উদাসীনতার বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও জাগতিক কার্যকলাপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সব কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে, তবুও তিনি যেন উদাসীন হয়ে অবস্থান করেন। এই সম্বন্ধে হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত ন্যায়াধীশের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। তাঁর আজ্ঞায় কত ঘটনা ঘটে চলে—কারও প্রাণদণ্ড হয়, কারও কারাবাস হয়, কেউ আবার অসীম সম্পদ-সম্পত্তি লাভ করে, কিন্তু তবুও তিনি নিরপেক্ষভাবে উদাসীন হয়ে থাকেন। সেই সমস্ত লাভ-ক্ষতির সঙ্গে তাঁর কোনই সম্পর্ক নেই। ঠিক সেই রকমভাবে, যদিও জড় জগতের প্রতিটি ব্যাপারেই ভগবানের হাত থাকে, তবুও তিনি সব কিছুর থেকেই নিত্য উদাসীন। *বেদান্ত-সূত্রে* (২/১/৩৪) বলা হয়েছে, *বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন*—তিনি এই জড় জগতের দ্বন্দ্বের মধ্যে অবস্থান করেন না। তিনি এই সব জড়-জাগতিক দ্বন্দ্বের অতীত। এই জগতের সৃষ্টি এবং বিনাশেও তাঁর কোন আসক্তি নেই। পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে জীব ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির দেহ ধারণ করে এবং ভগবান তাতে কোন রকম হস্তক্ষেপ করেন না।

শ্লোক ১০

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥ ১০ ॥

ময়া—আমার; **অধ্যক্ষেণ**—অধ্যক্ষতার দ্বারা; **প্রকৃতিঃ**—জড়া প্রকৃতি; **সূয়তে**—প্রকাশ করে; **স**—সহ; **চরাচরম্**—স্থাবর ও জঙ্গম; **হেতুনা**—কারণে; **অনেন**—এই; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **জগৎ**—জগৎ; **বিপরিবর্ততে**—পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত হয়।

গীতার গান

ইঙ্গিত মাত্র সে মোর জড়াকার্য করে ।
চরাচর যত কিছু প্রসবে সবারে ॥
জগৎ পরিবর্তন হয় সেই সে কারণ ।
পুনঃ পুনঃ হয় যত জনম মরণ ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা জড়া প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, প্রাকৃত জগতের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকলেও ভগবান হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা। পরমেশ্বরের পরম ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে এই জড় জগতের প্রকাশ হয়, কিন্তু তার পরিচালনা করেন জড়া প্রকৃতি। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতাতে* বলেছেন যে, বিভিন্ন যোনি থেকে উদ্ভূত সমস্ত জীব-প্রজাতির তিনিই হচ্ছেন পিতা। মাতার গর্ভে বীজ প্রদান করে পিতা সন্তান উৎপাদন করেন, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে জড়া প্রকৃতির গর্ভে সমস্ত জীবকে সঞ্চারিত করেন এবং এই সমস্ত জীব তাদের পূর্ব কর্মবাসনা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও যোনি প্রাপ্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত জীবেরা যদিও ভগবানের দৃষ্টিপাতের ফলে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তাদের পূর্ব কর্মবাসনা অনুসারে তারা ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং, ভগবান স্বয়ং এই প্রাকৃত সৃষ্টির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নন। শুধুমাত্র তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলেই জড়া প্রকৃতি ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে এবং তার ফলে তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ সৃষ্টির অভিব্যক্তি হয়। যেহেতু ভগবান মায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন নিঃসন্দেহে সেটিও তাঁর একটি কার্যকলাপ, কিন্তু জড় জগতের সৃষ্টির অভিব্যক্তির সঙ্গে তাঁর কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই। *স্মৃতি* শাস্ত্রে এই সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে—কারও সামনে যখন একটি সুবাসিত ফুল থাকে, তখন সেই ফুলের সৌরভ ও তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও সেই ফুলটি পরস্পর থেকে পৃথক। জড় জগৎ এবং ভগবানের মধ্যেও এই রকমেরই সম্বন্ধ রয়েছে। এই জড় জগতে তাঁর কিছু করার নেই, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিপাত ও আদেশের মাধ্যমে তিনি এই জগৎ

সৃষ্টি করেন। এর মর্মার্থ হচ্ছে, ভগবানের পরিচালনা ব্যতীত জড়া প্রকৃতি কিছুই করতে পারে না, তবুও সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ থেকে পরমেশ্বর ভগবান অনাসক্ত।

শ্লোক ১১

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

অবজানন্তি—অবজ্ঞা করে; **মাম্**—আমাকে; **মূঢ়াঃ**—মূঢ় ব্যক্তিরা; **মানুষীম্**—মনুষ্যরূপে; **তনুম্**—শরীর; **আশ্রিতম্**—ধারণ করে; **পরম্**—পরম; **ভাবম্**—তত্ত্ব; **অজানন্তঃ**—না জেনে; **মম**—আমার; **ভূত**—সব কিছুর; **মহেশ্বরম্**—পরম ঈশ্বর।

গীতার গান

আমার মনুষ্যাকার বিগ্রহ দেখিয়া ।
মূঢ় লোক নাহি বুঝে অবজ্ঞা করিয়া ॥
আমি মহেশ্বর এই জগৎ সংসারে ।
আমার পরম ভাব কে বুঝিতে পারে ॥

অনুবাদ

আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হই, তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয় এবং তারা আমাকে সর্বভূতের মহেশ্বর বলে জানে না।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা থেকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, নররূপে অবতরণ করলেও পরম পুরুষোত্তম ভগবান সাধারণ মানুষ নন। সমস্ত সৃষ্টির সৃজন, পালন ও সংহারকর্তা পরমেশ্বর ভগবান কখনই একজন মানুষ হতে পারেন না। কিন্তু তবুও অনেক মূঢ় লোক মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন শক্তিশালী মানুষ মাত্র এবং তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান। *ব্রহ্মসংহিতাতে* তাঁর বর্ণনা করে বলা হয়েছে, *ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ*—তিনি হচ্ছেন পরম ঈশ্বর।

সৃষ্টিতে একাধিক ঈশ্বর বা নিয়ন্তা রয়েছেন এবং তাঁদের এক জনের থেকে আর একজনকে শ্রেয় বলে মনে হয়। জড় জগতেও সাধারণত প্রতিটি প্রশাসনে কোনও সচিব, সচিবের উপরে মন্ত্রী এবং সেই মন্ত্রীর উপরে রাষ্ট্রপতি শাসন করেন। এঁরা সকলেই নিয়ন্তা, কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকেই আবার কারও না কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। *ব্রহ্মসংহিতাতে* বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা। জড় ও চিন্ময় এই উভয় জগতে নিঃসন্দেহে অনেক নিয়ন্তা আছেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা (*ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ*) এবং তাঁর শ্রীবিগ্রহ হচ্ছে সচ্চিদানন্দঘন, অর্থাৎ অপ্রাকৃত।

পূর্ব শ্লোকগুলিতে বর্ণিত সমস্ত অদ্ভুত কার্যকলাপ সম্পাদন করা জড়-জাগতিক কলেবর-বিশিষ্ট মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়। যদিও তিনি একজন সাধারণ মানুষ নন, কিন্তু তবুও মূঢ় লোকেরা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তাঁকে অবজ্ঞা করে। তাঁর শ্রীবিগ্রহকে এখানে *মানুষীম্* বলা হয়েছে, কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি একজন রাজনীতিজ্ঞ ও অর্জুনের সখারূপে মানুষের মতো লীলা করেছিলেন। বিভিন্নভাবে তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো লীলা করলেও তাঁর রূপ হচ্ছে *সচ্চিদানন্দবিগ্রহ*—শাশ্বত আনন্দ এবং জ্ঞানে পরিপূর্ণ। বৈদিক শাস্ত্রেও সেই কথা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। *সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়*—"আমি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণতি জানাই, যাঁর রূপ সচ্চিদানন্দময়।" (*গোপালতাপনী উপনিষদ* ১/১) বৈদিক শাস্ত্রে আরও অনেক বিবরণ আছে। তমেকং *গোবিন্দম্*—"তুমি হচ্ছ ইন্দ্রিয়সমূহের ও গাভীদের আনন্দ বর্ধনকারী গোবিন্দ।" *সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্*—"আর তোমার রূপ হচ্ছে শাশ্বত, জ্ঞানময় ও আনন্দময়।" (*গোপালতাপনী উপনিষদ* ১/৩৫)

শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ জ্ঞানময়, আনন্দময় এই সমস্ত অপ্রাকৃত গুণাবলী সমন্বিত হওয়া সত্ত্বেও *ভগবদ্গীতার* অনেক তথাকথিত পণ্ডিত ব্যক্তিরা ও ব্যাখ্যাকারেরা শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ বলে অবজ্ঞা করে। পূর্ব জন্মের পুণ্যকর্মের ফলে এই ধরনের পণ্ডিত ব্যক্তি অসাধারণ প্রতিভাবান হতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা তার জ্ঞানের স্বল্পতারই পরিচায়ক। তাই তাকে মূঢ় বলা হয়েছে, কারণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লীলাসমূহ এবং তাঁর শক্তির বৈচিত্র্য সম্বন্ধে যারা অজ্ঞ, তারাই তাঁকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। এই ধরনের মূঢ় লোকেরা জানে না যে, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ পূর্ণ জ্ঞান ও আনন্দের প্রতীক, তিনিই হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির অধীশ্বর এবং তিনি যে কোন জীবকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত অপ্রাকৃত গুণসমূহের কথা না জানার ফলে এই ধরনের মূঢ় লোকেরা তাঁকে উপহাস করে।

এই সমস্ত মূঢ় লোকেরা এটিও জানে না যে, এই জড় জগতে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অবতরণ হচ্ছে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির একটি প্রকাশ। তিনি হচ্ছেন মায়াশক্তির অধীশ্বর। যে কথা পূর্বে কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে (*মম মায়া দুরত্যয়া*), সেই অনুযায়ী তিনি ঘোষণা করছেন যে, অতি প্রবল মায়াশক্তি সর্বতোভাবে তাঁর অধীন, তাই তাঁর চরণারবিন্দের শরণাগত হওয়ার ফলে যে কোনও জীব এই মায়ার নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার ফলে যদি বদ্ধ জীব মায়াশক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে, তা হলে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন, পালন ও সংহারের পরিচালক স্বয়ং সেই পরমেশ্বর ভগবান কি করে আমাদের মতো জড় দেহধারী হতে পারেন? অতএব শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই প্রকার ধারণা সম্পূর্ণ মূঢ়তাপূর্ণ। মূর্খেরা এটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না যে, সাধারণ মানুষের রূপবিশিষ্ট পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু থেকে শুরু করে বিরাট বিশ্বরূপ পর্যন্ত সব কিছুরই নিয়ন্তা হতে পারেন। বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম তাদের ধারণার অতীত, তাই তারা কল্পনা করতে পারে না যে, তাঁর নরাকার শ্রীবিগ্রহ কিভাবে এক সঙ্গে অসীম ও অতি ক্ষুদ্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। বস্তুতপক্ষে ভগবান এই অসীম ও সসীমকে নিয়ন্ত্রণ করা সত্ত্বেও তিনি এই সৃষ্টির অভিপ্রকাশ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে থাকেন। এটিই তাঁর *যোগমৈশ্বরম্* অর্থাৎ অচিন্ত্য দিব্য শক্তি। যদিও মূঢ় লোকেরা কল্পনা করতে পারে না কিভাবে নররূপেই শ্রীকৃষ্ণ অসীম ও সসীমকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না, কারণ তিনি জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তাই তিনি তাঁর শ্রীচরণারবিন্দে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করে কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ হন।

শ্রীকৃষ্ণের নররূপে অবতার সম্বন্ধে সবিশেষবাদী ও নির্বিশেষবাদীদের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রামাণ্য শাস্ত্র *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতের* শরণাপন্ন হই, তা হলে আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবান। এই ধরাধামে নররূপে অবতরণ করলেও তিনি সামান্য মানুষ নন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে যখন শৌনক মুনির নেতৃত্বে ঋষিরা শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে প্রশ্নাদি করেছিলেন, তখন তাঁরা বলেছিলেন—

কৃতবান্ কিল কর্মাণি সহ রামেণ কেশবঃ ।
অতিমর্ত্যানি ভগবান্ গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ ॥

"পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতা বলরামের সঙ্গে মনুষ্যরূপে লীলাবিলাস করেছেন এবং এভাবেই তাঁর স্বরূপ গোপন রেখে তিনি বহু অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পাদন করেছেন।" (ভাঃ ১/১/২০) পরমেশ্বরের নররূপ অবতার মূঢ়দের কাছে বিড়ম্বনা-স্বরূপ। পৃথিবীতে অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করেন, তা কোন সাধারণ মানুষ করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর পিতা ও মাতা বসুদেব ও দেবকীর সমক্ষে সর্বপ্রথম আবির্ভূত হন, তখন তিনি চতুর্ভুজ রূপ নিয়ে প্রকট হয়েছিলেন। কিন্তু মাতা-পিতার বাৎসল্য প্রেমময়ী প্রার্থনায় তিনি একটি সাধারণ শিশুর রূপ ধারণ করেন। *ভাগবতে* (১০/৩/৪৬) বলা হয়েছে, *বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ*—তিনি একটি সাধারণ শিশু, একটি সাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। এখন, আবার এখানে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষরূপে প্রকট হওয়া তাঁর চিন্ময় শ্রীবিগ্রহের এক মধুর বিলাস। *ভগবদ্গীতার* একাদশ অধ্যায়েও বর্ণনা করা হয়েছে যে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ রূপ দেখবার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন (*তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন*)। এই চতুর্ভুজ রূপ প্রকাশের পর, অর্জুনের প্রার্থনায় শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁর আদি মনুষ্যরূপ (*মানুষং রূপম্*) ধারণ করেছিলেন। ভগবানের এই বিবিধ রূপ-বৈচিত্র্য সাধারণ মানুষের সাধ্য নয়।

কিছু লোক যারা মায়াবাদের দ্বারা কলুষিত হওয়ার ফলে শ্রীকৃষ্ণকে উপহাস করে, তারা শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ বলে প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে *শ্রীমদ্ভাগবতের* (৩/২৯/২১) এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করে। *অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা*—"আমি সর্বদা সমস্ত জীবের মধ্যে পরমাত্মারূপে অবস্থান করি।" শ্রীকৃষ্ণকে উপহাসকারী অনধিকারী ব্যক্তিদের মনোকল্পিত ব্যাখ্যার অনুসরণ না করে এই শ্লোকের তাৎপর্য শ্রীল জীব গোস্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আদি বৈষ্ণব আচার্যদের ব্যাখ্যা অনুসারে বুঝতে চেষ্টা করা উচিত। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীব গোস্বামী বলেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই, যে প্রাকৃত ভক্ত কেবল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ভগবানের অর্চামূর্তির পরিচর্যায় ব্যস্ত, কিন্তু অন্যান্য জীবদের সম্মান দিতে জানে না, তার অর্চাপূজা ব্যর্থ। তিন শ্রেণীর ভগবদ্ভক্তদের মধ্যে প্রাকৃত ভক্তেরা সবচেয়ে কনিষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত। সে অন্য ভক্তদের উপেক্ষা করে মন্দিরের অর্চা-বিগ্রহের প্রতি একাগ্র হয়ে থাকে। সুতরাং, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের সাবধান বাণী হচ্ছে যে, এই প্রকার মনোবৃত্তি সংশোধন করা আবশ্যক। ভক্তের দেখা উচিত যে, যেহেতু পরমাত্মারূপে

শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান থাকেন, তাই প্রতিটি জীব হচ্ছে ভগবানের মন্দির। ভগবানের মন্দিরকে যেভাবে অভিবাদন করা হয়, তেমনই পরমাত্মার মন্দিরস্বরূপ প্রতিটি প্রাণীকে যথোচিত সম্মান করা উচিত। প্রত্যেককেই যথোচিত শ্রদ্ধা জানানো উচিত এবং কখনই কাউকে অবহেলা করা উচিত নয়।

অনেক নির্বিশেষবাদী আছে, যারা মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অর্চনা করাকে উপহাস করে। তারা তর্ক করে যে, ঈশ্বর সর্বব্যাপক, অতএব মন্দিরে পূজা করে তাঁকে সীমিত করা হবে কেন? কিন্তু ভগবান যদি সর্বব্যাপক হন, তা হলে কি তিনি মন্দিরে অথবা অর্চা-বিগ্রহে নেই? সবিশেষবাদী এবং নির্বিশেষবাদীরা যদিও এভাবেই আবহমান কাল তর্ক করে থাকে, কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় শুদ্ধ ভক্ত যথার্থই জানেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষোত্তম হলেও তিনি সর্বব্যাপক। *ব্রহ্মসংহিতাতেও* সেই কথা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। তাঁর পরম ধাম গোলোক বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর বিবিধ শক্তির প্রভাবে এবং তাঁর অংশ-কলার প্রকাশের মাধ্যমে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সৃষ্টির সর্বত্র বিরাজমান।

শ্লোক ১২

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥

মোঘাশাঃ—ব্যর্থ আশা; **মোঘকর্মাণঃ**—নিষ্ফল কর্ম; **মোঘজ্ঞানাঃ**—বিফল জ্ঞান; **বিচেতসঃ**—মোহাচ্ছন্ন; **রাক্ষসীম্**—রাক্ষসী; **আসুরীম্**—আসুরী; **চ**—এবং; **এব**—অবশ্যই; **প্রকৃতিম্**—প্রকৃতি; **মোহিনীম্**—মোহকারী; **শ্রিতাঃ**—আশ্রয় গ্রহণ করে।

গীতার গান

আমাকে অবজ্ঞা তাই ব্যর্থ সব আশা ।
বিফল করম তার জ্ঞানের জিজ্ঞাসা ॥
যাহার আসুরী ভাব রাক্ষস স্বভাব ।
ছাড়ে মোরে মানে শুধু প্রকৃতি বৈভব ॥
প্রকৃতি মোহিনীমূর্তি তারে জারি মারে ।
মায়াময় মূর্তি বলে তাহারা আমারে ॥

অনুবাদ

এভাবেই যারা মোহাচ্ছন্ন হয়েছে, তারা রাক্ষসী ও আসুরী ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেই মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় তাদের মুক্তি লাভের আশা, তাদের সকাম কর্ম এবং জ্ঞানের প্রয়াস সমস্তই ব্যর্থ হয়।

তাৎপর্য

অনেক ভক্ত আছে, যারা নিজেদের কৃষ্ণভাবনাময় ও ভক্তিযোগে যুক্ত বলে মনে করে, কিন্তু তারা অন্তরে পরম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে পরমতত্ত্ব বলে স্বীকার করে না। তারা কোন দিনই ভক্তিযোগের ফলস্বরূপ ভগবৎ-ধাম প্রাপ্ত হতে পারে না। তেমনই, যারা সকাম পুণ্যকর্মে নিয়োজিত এবং যারা পরিশেষে এই জড় বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের আশা করছে, তারা কোনটিতেই সফল হবে না; কারণ তারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপহাস করে। পক্ষান্তরে, যে সমস্ত মানুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করে, তারা আসুরিক ভাবাপন্ন কিংবা নাস্তিক। *ভগবদ্‌গীতার* সপ্তম অধ্যায়ে তাই বলা হয়েছে যে, এই ধরনের আসুরিক ভাবাপন্ন দুষ্ট লোকেরা কখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয় না। তাই, পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য তারা মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, সাধারণ জীব ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা মনে করে যে, তাদের মনুষ্যদেহ এখন মায়ার দ্বারা আবৃত হয়ে আছে, কিন্তু যখন কেউ তার দেহ থেকে মুক্ত হবে, তখন তার ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। মোহগ্রস্ত চিন্তাধারার ফলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এক হওয়ার এই যে প্রচেষ্টা তা কোন দিনই সফল হবে না। পারমার্থিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ধরনের নাস্তিক্য ও আসুরিক অনুশীলন সর্বদাই নিষ্ফল হয়। এটিই হচ্ছে এই শ্লোকের নির্দেশ। এই ধরনের লোকদের দ্বারা *বেদান্ত-সূত্র* ও *উপনিষদ* আদি বৈদিক শাস্ত্র থেকে জ্ঞান অনুশীলন চিরকালই নিষ্ফল ও ব্যর্থ হয়।

সুতরাং, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা মহা অপরাধ। যারা তা করে তারা অবশ্যই বিভ্রান্ত, কারণ তারা শ্রীকৃষ্ণের শাশ্বত রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। *বৃহদ্‌বিষ্ণুস্মৃতিতে* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—

যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
স সর্বস্মাদ্ বহিষ্কার্যঃ শ্রৌতস্মার্তবিধানতঃ ॥
মুখং তস্যাবলোক্যাপি সচেলং স্নানমাচরেৎ ।

"যে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহকে প্রাকৃত দেহ বলে মনে করে, তাকে *শ্রুতি* ও *স্মৃতি* শাস্ত্রের সমস্ত বিধান থেকে বহিষ্কৃত করা উচিত এবং ঘটনাক্রমে যদি কখনও তার মুখদর্শন ঘটে, তা হলে সেই পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ গঙ্গাস্নান করা উচিত।" পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তারাই উপহাস করে, যারা তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। তাদের নিয়তি হচ্ছে জন্ম-জন্মান্তর ধরে নিশ্চিতভাবে বারবার আসুরিক ও নিরীশ্বরবাদী যোনিতে জন্মগ্রহণ করা। তাদের প্রকৃত জ্ঞান চিরকালই মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকবে, যার ফলে তারা উত্তরোত্তর সৃষ্টিরাজ্যের সবচেয়ে তমসাময় অধম যোনিতেই পতিত হবে।

শ্লোক ১৩

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

মহাত্মানঃ—মহাত্মাগণ; **তু**—কিন্তু; **মাম্**—আমাকে; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **দৈবীম্**—দৈবী; **প্রকৃতিম্**—প্রকৃতি; **আশ্রিতাঃ**—আশ্রয় করে; **ভজন্তি**—ভজনা করেন; **অনন্যমনসঃ**—অনন্যমনা হয়ে; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **ভূত**—সৃষ্টির; **আদিম্**—আদি; **অব্যয়ম্**—অব্যয়।

গীতার গান

কিন্তু যেবা মহাত্মা সে আরাধ্য-প্রকৃতি ।
আশ্রয় লইয়া করে ভজন সঙ্গতি ॥
অনন্য মনেতে করে বিশুদ্ধ ভজন ।
সমস্ত ভূতের আদি আমাকে তখন ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! মোহমুক্ত মহাত্মাগণ আমার দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করেন। তাঁরা আমাকে সর্বভূতের আদি ও অব্যয় জেনে অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে যথার্থ মহাত্মার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। মহাত্মার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে যে, তিনি সর্বদাই দিব্য প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি কখনই

জড়া প্রকৃতির অধীনে থাকেন না। আর তা কিভাবে সম্ভব? সপ্তম অধ্যায়ে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে—যিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েছেন, তিনি অবিলম্বে জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হন। এটিই হচ্ছে যোগ্যতা। মানুষ যখনই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, তৎক্ষণাৎ তিনি মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হন। এটিই হচ্ছে মুক্তি লাভ করার প্রাথমিক সূত্র। যেহেতু জীবসত্তা ভগবানের তটস্থা শক্তি, তাই জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে চিন্ময় প্রকৃতির আশ্রয় লাভ করে। চিন্ময় প্রকৃতির পথ-নির্দেশকেই বলা হয় *দৈবী প্রকৃতি*। সুতরাং, এভাবেই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শরণাগত হওয়ার ফলে কেউ যখন উন্নত হন, তখন তিনি মহাত্মার পর্যায়ে উন্নীত হন।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কোন কিছুর দিকেই মহাত্মা তাঁর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করেন না, কারণ তিনি খুব ভালভাবেই জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন আদি পরম পুরুষ, তিনিই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ। এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। এই চিত্তবৃত্তির উন্মেষ হয় অন্য মহাত্মাদের বা শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ লাভ করার ফলে। শুদ্ধ ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য রূপের প্রতি, এমন কি চতুর্ভুজ মহাবিষ্ণুর প্রতিও আকৃষ্ট হন না। তাঁরা কেবল শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ রূপেই অনুরক্ত থাকেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোনও বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হন না, এমন কি অন্য কোন দেবতা বা মানুষের প্রতিও তাঁদের কোনও রকম আসক্তি থাকে না। এই ধরনের কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। তাঁরা একটানা কৃষ্ণভাবনাময় ভগবৎ-সেবায় নিত্য তন্ময় হয়ে থাকেন।

শ্লোক ১৪

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

সততম্—নিরন্তর; **কীর্তয়ন্তঃ**—কীর্তন করে; **মাম্**—আমাকে; **যতন্তঃ**—যত্নশীল হয়ে; **চ**—ও; **দৃঢ়ব্রতাঃ**—দৃঢ়ব্রত; **নমস্যন্তঃ**—নমস্কার করে; **চ**—ও; **মাম্**—আমাকে; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **নিত্যযুক্ত্যাঃ**—নিরন্তর যুক্ত হয়ে; **উপাসতে**—উপাসনা করে।

গীতার গান

লক্ষণ সে মহাত্মার হয় বিলক্ষণ ।
মহিমা আমার করে সতত কীর্তন ॥
আমার মহিমা জন্য সর্ব কর্মে রত ।
সকল বিষয়ে যত হও দৃঢ়ব্রত ॥
ভক্তির যাজন আর প্রণাম বিজ্ঞপ্তি ।
নিত্যসেবা উপাসনা আমাকেই প্রাপ্তি ॥

অনুবাদ

দৃঢ়ব্রত ও যত্নশীল হয়ে, সর্বদা আমার মহিমা কীর্তন করে এবং আমাকে প্রণাম করে, এই সমস্ত মহাত্মারা নিরন্তর যুক্ত হয়ে ভক্তি সহকারে আমার উপাসনা করে।

তাৎপর্য

কোন সাধারণ মানুষকে একটি ছাপ মেরে মহাত্মা বানানো যায় না। মহাত্মার স্বরূপ এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাত্মা সর্বদাই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তনে মগ্ন থাকেন। তাঁর আর অন্য কোন কাজই থাকে না। তিনি নিরন্তর পরমেশ্বরের মহিমা প্রচারে নিয়োজিত থাকেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, মহাত্মা কখনই নির্বিশেষবাদী হন না। মহিমা কীর্তনের অর্থ হচ্ছে, ভগবানের ধাম, ভগবানের নাম, ভগবানের রূপ, ভগবানের গুণ ও ভগবানের অদ্ভুত চরিত্রের লীলাসমূহ কীর্তন করা। এই সমস্ত বিষয় সর্বদাই কীর্তনীয়; তাই যথার্থ মহাত্মা সর্বদাই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি অনুরক্ত থাকেন।

ভগবানের নির্বিশেষ রূপ ব্রহ্মজ্যোতির প্রতি যে আসক্ত, তাকে *ভগবদ্গীতায়* মহাত্মা বলে বর্ণনা করা হয়নি। এই ধরনের মানুষকে পরবর্তী শ্লোকে অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহাত্মা সর্বদাই ভগবদ্ভক্তির নানা রকম কার্যকলাপে মগ্ন থাকেন, তিনি বিষ্ণুতত্ত্বের শ্রবণ ও কীর্তন করেন এবং কখনই দেব-দেবী বা কোন মানুষের মহিমা কীর্তন করেন না। সেটিই হচ্ছে ভক্তি—*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ* এবং *স্মরণম্* অর্থাৎ তাঁকে সর্বদা স্মরণ করা। এই প্রকার মহাত্মা পাঁচটি দিব্য রসের যে কোন একটির দ্বারা ভগবানের সঙ্গে অন্তিমকালে নিত্যযুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর। সেই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য তিনি

কায়মনোবাক্যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত থাকেন। সেটিকে বলা হয় পূর্ণ কৃষ্ণভাবনামৃত।

ভক্তিযোগের কতগুলি ক্রিয়া অবশ্য পালনীয়, যেমন একাদশী, জন্মাষ্টমী আদি পুণ্যতিথিতে উপবাস করা। এই সমস্ত বিধি-বিধান মহান আচার্যদের দ্বারা তাঁদের জন্য নির্দেশিত হয়েছে, যাঁরা চিন্ময় জগতে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করার প্রকৃত প্রয়াসী। মহাত্মারা এই সমস্ত বিধি-বিধান কঠোরভাবে পালন করেন। তাই, তাঁরা অবধারিতভাবে তাঁদের বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই ভক্তিযোগ কেবল সহজসাধ্যই নয়, তা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সম্পাদন করা যায়। এর জন্য কোন কঠোর তপস্যা বা কৃচ্ছ্রসাধনের প্রয়োজন হয় না। সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে গৃহস্থ, সন্ন্যাসী অথবা ব্রহ্মচারীরূপে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যে কোনও অবস্থায় পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ভক্তি সাধন করার মাধ্যমে যথার্থ মহাত্মায় পরিণত হওয়া যায়।

শ্লোক ১৫

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে ।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

জ্ঞানযজ্ঞেন—জ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা; **চ**—ও; **অপি**—অবশ্যই; **অন্যে**—অন্যেরা; যজন্তঃ—যজন করে; **মাম্**—আমাকে; **উপাসতে**—উপাসনা করেন; **একত্বেন**—অভেদ চিন্তার দ্বারা; **পৃথক্ত্বেন**—পৃথক চিন্তার দ্বারা; **বহুধা**—বহু প্রকারে; বিশ্বতোমুখম্—বিশ্বরূপের।

গীতার গান

যারা শুদ্ধ ভক্ত নহে কিন্তু মোরে ভজে ।
জ্ঞান যজ্ঞ করি তারা তিনভাবে মজে ॥
অহংগ্রহ উপাসনা একত্ব সে নাম ।
পৃথকত্বে উপাসনা প্রতীকোপাসন ॥
বিশ্বরূপ উপাসনা অনির্দিষ্ট রূপ ।
নিরাকার ভাব কিংবা ভাবে বহুরূপ ॥

অনুবাদ

অন্য কেউ কেউ জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা অভেদ চিন্তাপূর্বক, কেউ কেউ বহুরূপে প্রকাশিত ভেদ চিন্তাপূর্বক এবং অন্য কেউ আমার বিশ্বরূপের উপাসনা করেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পূর্ববর্তী শ্লোকসমূহের সারমর্ম ব্যক্ত হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত যে অনন্য ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই জানেন না, তিনি হচ্ছেন মহাত্মা। কিন্তু এমনও কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা যথার্থ মহাত্মা না হলেও বিভিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন। সেই রকম কিছু ভক্তের মধ্যে আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এদের থেকে আরও নিম্নস্তরের উপাসক আছে এবং এরা তিন ভাগে বিভক্ত (১) অহংগ্রহ উপাসক—যে নিজেকে ভগবানের অভেদ মনে করে নিজের উপাসনা করে, (২) প্রতীকোপাসক—যে কল্পনাপ্রসূত কোন একরূপে ভগবানের উপাসনা করে এবং (৩) বিশ্বরূপোপাসক—যে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বিশ্বরূপকে স্বীকার করে তাঁর উপাসনা করে। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে যারা নিজেদেরকে ভগবান বলে মনে করে নিজেদের উপাসনা করে, তাদের বলা হয় অদ্বৈতবাদী। এরাই হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের ভগবৎ উপাসক এবং এদেরই প্রাধান্য বেশি। এই প্রকার লোকেরা নিজেদের পরমেশ্বর বলে মনে করে নিজেদেরই উপাসনা করে। এটিও এক রকমের ঈশ্বর উপাসনা, কারণ এর মাধ্যমে তারা জানতে পারে যে, তাদের জড় দেহটি তাদের স্বরূপ নয়, তাদের স্বরূপ হচ্ছে চিন্ময় আত্মা। এদের মধ্যে অন্ততপক্ষে এই বিবেকের উন্মেষ হয়। সাধারণত নির্বিশেষবাদীরা এভাবেই ভগবানের উপাসনা করে থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত মানুষেরা হচ্ছে দেবোপাসক। তারা তাদের কল্পনাপ্রসূত যে কোন একটি রূপকে ভগবানের রূপ বলে মনে করে। আর তৃতীয় শ্রেণীতে যারা রয়েছে, তারা এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্তি বিশ্বরূপের অতীত আর কোনও কিছুকে চিন্তা করতে পারে না। তাই, তারা ভগবানের বিশ্বরূপকে পরমতত্ত্ব বলে মনে করে সেটির আরাধনায় তৎপর হয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটি ভগবানেরই একটি রূপ।

শ্লোক ১৬

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬ ॥

অহম্—আমি; **ক্রতুঃ**—অগ্নিষ্টোম আদি শ্রৌত যজ্ঞ; **অহম্**—আমি; **যজ্ঞঃ**—স্মার্ত যজ্ঞ; **স্বধা**—শ্রাদ্ধ আদি কর্ম; **অহম্**—আমি; **অহম্**—আমি; **ঔষধম্**—রোগ নিবারক ভেষজ; **মন্ত্রঃ**—মন্ত্র; **অহম্**—আমি; **অহম্**—আমি; **এব**—অবশ্যই; **আজ্যম্**—ঘৃত; **অহম্**—আমি; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **অহম্**—আমি; **হুতম্**—হোমক্রিয়া।

গীতার গান

আমিহি সে স্মার্তযজ্ঞে শ্রৌত বৈশ্যদেব ।
আমিহি সে স্বধা মন্ত্র ঔষধ বিভেদ ॥
আমিহি সে অগ্নি হোম ঘৃতাদি সামগ্রী ।
আমি পিতা আমি মাতা অথবা বিধাতৃ ॥

অনুবাদ

আমি অগ্নিষ্টোম আদি শ্রৌত যজ্ঞ, আমি বৈশ্বদেব আদি স্মার্ত যজ্ঞ, আমি পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি কর্ম, আমি রোগ নিবারক ভেষজ, আমি মন্ত্র, আমি হোমের ঘৃত, আমি অগ্নি এবং আমিই হোমক্রিয়া।

তাৎপর্য

'জ্যোতিষ্টোম' নামক যজ্ঞ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ এবং স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে তিনি 'মহাযজ্ঞ'। পিতৃলোককে অর্পণ করা হয় যে স্বধা বা ঘৃতরূপী ঔষধ, তাও শ্রীকৃষ্ণেরই একটি রূপ। এই ক্রিয়াতে উচ্চারিত মন্ত্রও হচ্ছে কৃষ্ণ। যজ্ঞে যে সমস্ত দুগ্ধজাত পদার্থ আহুতি দেওয়া হয়, তাও শ্রীকৃষ্ণ। অগ্নিকেও শ্রীকৃষ্ণ বলা হয়েছে, কারণ পঞ্চমহাভূতের একটি তত্ত্ব হওয়ার ফলে তাও শ্রীকৃষ্ণেরই ভিন্ন শক্তি। অর্থাৎ, বৈদিক কর্মকাণ্ডে প্রতিপাদিত বিবিধ যজ্ঞের সমষ্টিও হচ্ছে কৃষ্ণ। প্রকারান্তরে এটি জানা উচিত যে, যে মানুষ কৃষ্ণভক্তিতে নিষ্ঠাবান, তিনি ইতিমধ্যেই সমস্ত বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন।

শ্লোক ১৭

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।
বেদ্যং পবিত্রম্ ওঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥

পিতা—পিতা; অহম্—আমি; অস্য—এই; জগতঃ—জগতের; মাতা—মাতা; ধাতা—বিধাতা; পিতামহঃ—পিতামহ; বেদ্যম্—জ্ঞেয় বস্তু; পবিত্রম্— শোধনকারী; ওঙ্কারঃ—ওঙ্কার; ঋক্—ঋগ্বেদ; সাম—সামবেদ; যজুঃ—যজুর্বেদ; এব—অবশ্যই; চ—এবং।

গীতার গান

আমি পিতামহ বেদ্য পবিত্র ওঙ্কার ।
আমি ঋক্ আমি সাম যজু কিংবা আর ॥

অনুবাদ

আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা ও পিতামহ। আমি জ্ঞেয় বস্তু, শোধনকারী ও ওঙ্কার। আমিই ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের শক্তির বিবিধ ক্রিয়ার ফলেই চরাচরের সমস্ত সৃষ্টির অভিব্যক্তি হয়। সংসারে আমরা বিভিন্ন জীবের সঙ্গে নানা রকম আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন করি; এই সমস্ত জীব বস্তুতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। কিন্তু প্রকৃতির সৃষ্টির অধীনে, তাদের কেউ কেউ আমাদের পিতা, মাতা, পিতামহ, সৃষ্টিকর্তা আদিরূপে প্রতিভাত হন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ ব্যতীত আর কিছুই নন। এভাবেই আমাদের মাতা, পিতারূপে প্রতিভাত হয় যে সমস্ত জীবসত্তা, তাঁরাও শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই নন। এই শ্লোকে *ধাতা* শব্দের অর্থ হচ্ছে 'সৃষ্টিকর্তা'। আমাদের পিতা-মাতা যে কেবল শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ তাই নন, পরন্তু সৃষ্টিকর্তা, পিতামহী ও পিতামহ প্রমুখ সকলেই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের অপরিহার্য অংশ হবার ফলে বস্তুতপক্ষে প্রতিটি জীবই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। তাই, সম্পূর্ণ *বেদের* একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। *বেদের* মাধ্যমে আমরা যা কিছু জানতে চাই, তা ক্রমশ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-তত্ত্বের দিকেই আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলে। যে তত্ত্বজ্ঞান আমাদের অন্তরকে কলুষমুক্ত করতে সাহায্য করে, তা বিশেষরূপে শ্রীকৃষ্ণ। তেমনই, যে মানুষ সম্পূর্ণরূপে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান জানবার প্রয়াসী, সেও শ্রীকৃষ্ণেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সেই কারণে শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। সমস্ত বৈদিক মন্ত্রগুলির মধ্যে ওঁ শব্দটিকে বলা হয় 'প্রণব' এবং সেটি হচ্ছে অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ, তাই সেটিও শ্রীকৃষ্ণ। আর যেহেতু *ঋক্, সাম, যজুঃ* ও *অথর্ব*—এই চার *বেদের* সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে 'প্রণব' বা *ওঙ্কার* হচ্ছে অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তাই বুঝতে হবে সেটিও শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ১৮

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

গতিঃ—গতি; ভর্তা—পতি; প্রভুঃ—নিয়ন্তা; সাক্ষী—সাক্ষী; নিবাসঃ—নিবাস; শরণম্—রক্ষাকর্তা; সুহৃৎ—সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু; প্রভবঃ—সৃষ্টি; প্রলয়ঃ—প্রলয়; স্থানম্—স্থিতি; নিধানম্—আশ্রয়; বীজম্—বীজ; অব্যয়ম্—অবিনাশী।

গীতার গান

আমি গতি আমি ভর্তা মোরে সাক্ষী কর ।
আমি সে শরণ্যধাম প্রভব প্রলয় ॥

অনুবাদ

আমি সকলের গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ ও সুহৃৎ। আমিই উৎপত্তি, নাশ, স্থিতি, আশ্রয় ও অব্যয় বীজ।

তাৎপর্য

গতি শব্দে এখানে গন্তব্যস্থানকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে আমরা যেতে চাই। কিন্তু সকলেরই পরম গতি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। যদিও সাধারণ মানুষ এই কথা জানে না। যারা শ্রীকৃষ্ণকে জানে না, তারা নিশ্চিতরূপে পথভ্রষ্ট। তাদের তথাকথিত উন্নতির পথে প্রগতি প্রকৃতপক্ষে অসম্পূর্ণ অথবা ভ্রমাত্মক। অনেক মানুষ আছে, যারা বিভিন্ন দেব-দেবীকে তাদের পরম লক্ষ্য বলে মনে করে এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের পূজা করার ফলে তারা চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, ইন্দ্রলোক, মহর্লোক আদি উচ্চতর গ্রহলোক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা রচিত এই সমস্ত গ্রহলোকগুলি যুগপৎভাবে কৃষ্ণ আবার কৃষ্ণ নয়। শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তির প্রকাশ হওয়ায়, এই সমস্ত গ্রহলোকও শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি কৃষ্ণতত্ত্ব উপলব্ধির পথে এক পদক্ষেপ অগ্রসর হতে সাহায্য করে মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন শক্তির সমীপবর্তী হওয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরোক্ষভাবে অগ্রসর হওয়ার মতো। তাই, সময় ও সামর্থ্যের ব্যর্থ অপব্যয় না করে প্রত্যক্ষরূপে শ্রীকৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হওয়া বিধেয়, তার ফলে সময় ও শক্তি বাঁচানো যায়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, যদি কোন বাড়িতে উঠবার জন্য লিফ্‌ট থাকে, তা হলে অনর্থক সিঁড়ি দিয়ে কেউ উঠবে

কেন? সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের শক্তিকে আশ্রয় করে আছে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় ব্যতীত কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা, কারণ সব কিছু তাঁরই অধীন এবং তাঁরই শক্তিকে আশ্রয় করে সব কিছু বিদ্যমান। সমস্ত জীবের অন্তর্যামীরূপে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম সাক্ষী। আমাদের নিবাস, দেশ, গ্রহলোক আদি যেখানে আমরা বসবাস করি তাও শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম আশ্রয় ও গতি। তাই আমাদের সুরক্ষার জন্য অথবা দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণের জন্য তাঁরই শরণাগত হওয়া উচিত। যখনই আমরা সুরক্ষার প্রয়োজন বোধ করব, আমাদের জানতে হবে যে, কোনও জীবশক্তিকেই আশ্রয় বলে মানতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম জীবসত্তা। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সৃষ্টির উৎস অথবা পরম পিতা, তাই শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা অন্য কেউ সুহৃদ হতে পারে না, অন্য কেউ হিতৈষী হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সৃষ্টির আদি কারণ এবং প্রলয়ান্তে পরম আশ্রয়। তাই, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ।

শ্লোক ১৯

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্নাম্যুৎসৃজামি চ ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ॥ ১৯ ॥

তপামি—তাপ প্রদান করি; **অহম্**—আমি; **অহম্**—আমি; **বর্ষম্**—বৃষ্টি; **নিগৃহ্নামি**—আকর্ষণ করি; **উৎসৃজামি**—বর্ষণ করি; **চ**—এবং; **অমৃতম্**—অমৃত; **চ**—এবং; **এব**—অবশ্যই; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **চ**—এবং; **সৎ**—চেতন; **অসৎ**—জড় বস্তু; **চ**—এবং; **অহম্**—আমি; **অর্জুন**—হে অর্জুন।

গীতার গান

আমি সে উৎপত্তি স্থিতি বীজ অব্যয় ।
আমি বৃষ্টি আমি মেঘ আমি মৃত্যুময় ॥
আমি সে অমৃততত্ত্ব শুন হে অর্জুন ।
সদসদ্ যাহা কিছু আমি বিশ্বরূপ ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! আমি তাপ প্রদান করি এবং আমি বৃষ্টি বর্ষণ করি ও আকর্ষণ করি। আমি অমৃত এবং আমি মৃত্যু। জড় ও চেতন বস্তু উভয়ই আমার মধ্যে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিবিধ শক্তি বিদ্যুৎ ও সূর্যের মাধ্যমে তাপ ও আলোক বিকিরণ করেন। গ্রীষ্ম ঋতুতে তিনি বৃষ্টিকে আকাশ থেকে পড়তে দেন না, আবার বর্ষা ঋতুতে তিনি অবিরাম প্রচণ্ড বৃষ্টি বর্ষণ করেন। যে শক্তি আমাদের আয়ুকে পরিবর্ধিত করে আমাদের বাঁচিয়ে রাখে তাও শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি। জীবনের অন্তেও শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যুরূপে আমাদের সামনে উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণের এই বিভিন্ন শক্তির বিশ্লেষণ করার ফলে আমরা প্রতিপন্ন করতে পারি যে, তাঁর দৃষ্টিতে জড় ও চেতনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, অথবা পক্ষান্তরে, জড় ও চেতন উভয়ই তাঁর প্রকাশ। তাই, কৃষ্ণভাবনার অতি উন্নত স্তরে এই রকম পার্থক্য সৃষ্টি করা উচিত নয়। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত যিনি উত্তম অধিকারী, তিনি সর্বত্র সব কিছুতেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পান।

যেহেতু জড় ও চেতন উভয় শ্রীকৃষ্ণ, তাই সমস্ত জড় উপাদানে সংঘটিত বিশাল বিশ্বরূপও হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। মুরলীধর শ্যামসুন্দর রূপে তাঁর যে বৃন্দাবনলীলা, সেটি তাঁর পরম মাধুর্যময় ভগবৎ-লীলা।

শ্লোক ২০

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকম্
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥

ত্রৈবিদ্যাঃ—ত্রিবেদজ্ঞগণ; **মাম্**—আমাকে; **সোমপাঃ**—সোমরস পানকারী; **পূত**—পবিত্র; **পাপাঃ**—পাপ; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞের দ্বারা; **ইষ্ট্বা**—পূজা করে; **স্বর্গতিম্**—স্বর্গে গমন; **প্রার্থয়ন্তে**—প্রার্থনা করেন; **তে**—তাঁরা; **পুণ্যম্**—পুণ্য; **আসাদ্য**—লাভ করে; **সুরেন্দ্র**—ইন্দ্র; **লোকম্**—লোক; **অশ্নন্তি**—ভোগ করেন; **দিব্যান্**—দিব্য; **দিবি**—স্বর্গে; **দেবভোগান্**—দেবতাদের ভোগসমূহ।

গীতার গান

কর্মকাণ্ড বেদ ত্রয়, সাধনে যে পূর্ণ হয়,
সোমরস পানে পাপ ক্ষয় ॥

যজ্ঞ মোর উপাসনা, যেবা করে সে সাধনা,
স্বর্গসুখ প্রার্থনা সে করে ॥
পুণ্যের ফলেতে সেই, সুরেন্দ্র লোকেতে যায়,
দিব্যসুখ ভোগ সেথা করে ।

অনুবাদ

ত্রিবেদজ্ঞগণ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমাকে আরাধনা করে যজ্ঞাবশিষ্ট সোমরস পান করে পাপমুক্ত হন এবং স্বর্গে গমন প্রার্থনা করেন। তাঁরা পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ ইন্দ্রলোক লাভ করে দেবভোগ্য দিব্য স্বর্গসুখ উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

ত্রৈবিদ্যাঃ বলতে সাম, যজুঃ ও ঋক্ নামক তিনটি *বেদকে* বুঝায়। যে ব্রাহ্মণ এই তিনটি *বেদ* অধ্যয়ন করেছেন, তাঁকে বলা হয় ত্রিবেদী। যাঁরা এই তিনটি *বেদ* থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাঁরা মনুষ্য-সমাজে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। দুর্ভাগ্যবশত, *বেদের* অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরা বৈদিক জ্ঞানের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন না। তাই, শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে ঘোষণা করেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন ত্রিবেদীদের পরম লক্ষ্য। যথার্থ ত্রিবেদী শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের শরণাগত হন এবং তাঁর প্রীতি উৎপাদনের জন্য বিশুদ্ধ ভক্তিযোগে নিয়োজিত থাকেন। এই ভক্তিযোগ শুরু হয় হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন ও সেই সঙ্গে কৃষ্ণতত্ত্ব জানবার প্রচেষ্টা করার মাধ্যমে। দুর্ভাগ্যবশত যে সমস্ত মানুষ কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে *বেদ* অধ্যয়ন করে, তারা ইন্দ্র, চন্দ্র আদি দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়। এই প্রকার প্রচেষ্টার দ্বারা এই ধরনের দেবোপাসকেরা নিঃসন্দেহে প্রকৃতির নিকৃষ্ট গুণের দোষ থেকে শুদ্ধ হয়ে স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপলোক আদি উচ্চলোক প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত স্বর্গলোকে একবার অধিষ্ঠিত হলে এই জগতের থেকে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করা সম্ভব হয়।

শ্লোক ২১

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি ।

এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

তে—তাঁরা; তম্—সেই; ভুক্ত্বা—ভোগ করে; স্বর্গলোকম্—স্বর্গলোক; বিশালম্—বিশাল; ক্ষীণে—ক্ষীণ হলে; পুণ্যে—পুণ্যফল; মর্ত্যলোকম্—মর্ত্যলোকে; বিশন্তি—অধঃপতিত হন; এবম্—এভাবে; ত্রয়ী—তিন বেদের; ধর্মম্—ধর্ম; অনুপ্রপন্না—অনুষ্ঠান-পরায়ণ; গতাগতম্—জন্ম ও মৃত্যু; কামকামাঃ—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষী; লভন্তে—লাভ করেন।

গীতার গান

বিশাল সে স্বর্গসুখ, ভুলে যায় জড় দুঃখ,
ক্রমে ক্রমে তার পুণ্য হরে ॥
ত্রয়ী ধর্ম কর্মকাণ্ড, পয়োমুখ বিষভাণ্ড,
অমৃত ভাবিয়া যেবা খায় ।
গতাগতি কামলাভ, জন্মে জন্মে মহাতাপ,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥

অনুবাদ

তাঁরা সেই বিপুল স্বর্গসুখ উপভোগ করে পুণ্য ক্ষয় হলে মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন। এভাবেই ত্রিবেদোক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান করে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষী মানুষেরা সংসারে কেবলমাত্র বারংবার জন্ম-মৃত্যু লাভ করে থাকেন।

তাৎপর্য

স্বর্গলোকে উন্নীত হবার ফলে জীব তথাকথিত দীর্ঘ জীবন ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির শ্রেষ্ঠ সুযোগ-সুবিধা লাভ করে, কিন্তু তারা চিরকাল সেখানে থাকতে পারে না। পুণ্যকর্মফল শেষ হয়ে যাওয়ার পর তাকে আবার এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। *বেদান্ত-সূত্রে* নির্দেশিত পূর্ণজ্ঞান (*জন্মাদ্যস্য যতঃ*) যে প্রাপ্ত হয়নি, অথবা যে সর্ব কারণের পরম কারণ শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বগতভাবে জানতে পারেনি, সে মানব-জীবনের পরম লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে। সে কখনও স্বর্গলোকে উত্তীর্ণ হয় এবং তার পরে আবার এই মর্ত্যলোকে নেমে আসে, যেন সে নাগরদোলায় বসে কখনও উপরের দিকে কখনও নীচের দিকে পাক খেতে থাকে। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে,

যেখানে একবার ফিরে গেলে আর নীচে নেমে আসতে হয় না, সেই চিন্ময় জগতে উন্নীত না হয়ে, সে কেবলমাত্র উচ্চ ও নিম্নলোকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তন করতে থাকে। তাই, মানুষের উচিত চিন্ময় জগৎ প্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা করা, যার ফলে সচ্চিদানন্দময় নিত্য জীবন লাভ করা যায় এবং আর কখনও এই দুঃখময় জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

শ্লোক ২২

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

অনন্যাঃ—অনন্য; **চিন্তয়ন্তঃ**—চিন্তা করতে করতে; **মাম্**—আমাকে; **যে**—যে; **জনাঃ**—ব্যক্তিগণ; **পর্যুপাসতে**—যথাযথভাবে আরাধনা করেন; **তেষাম্**—তাঁদের; **নিত্য**—সর্বদা; **অভিযুক্তানাম্**—ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত; **যোগক্ষেমম্**—অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি এবং প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ; **বহামি**—বহন করি; **অহম্**—আমি।

গীতার গান

কিন্তু যে অনন্যভাবে মোরে চিন্তা করে ।
একান্ত হইয়া শুধু আমাকে যে স্মরে ॥
সেই নিত্যযুক্ত ভক্ত আমার সে প্রিয় ।
যে সুখ চাহয়ে সেই হয় মোর দেয় ॥
আমি তার যোগক্ষেম বহি লই যাই ।
আমা বিনা অন্য তার কোন চিন্তা নাই ॥

অনুবাদ

অনন্যচিত্তে আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে, পরিপূর্ণ ভক্তি সহকারে যাঁরা সর্বদাই আমার উপাসনা করেন, তাঁদের সমস্ত অপ্রাপ্ত বস্তু আমি বহন করি এবং তাঁদের প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ করি।

তাৎপর্য

যিনি কৃষ্ণভাবনা ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারেন না, তিনি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন, পাদসেবন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনের দ্বারা নবধা ভক্তিপরায়ণ হয়ে চব্বিশ ঘণ্টা শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ ছাড়া অন্য কিছু করেন না। ভক্তির এই সমস্ত ক্রিয়া পরম মঙ্গলময় এবং পারমার্থিক শক্তিসম্পন্ন, যার ফলে ভক্ত আত্ম-উপলব্ধিতে পূর্ণতা লাভ করতে পারেন। তখন তাঁর একমাত্র অভিলাষ হয় ভগবানের সঙ্গ লাভ করা। এই প্রকার ভক্ত অনায়াসে নিঃসন্দেহে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করেন। একে বলা হয় *যোগ*। ভগবানের কৃপার ফলে এই ধরনের ভক্তদের আর কখনও এই জড়-জাগতিক বদ্ধ জীবনে ফিরে আসতে হয় না। *ক্ষেম* কথাটির অর্থ হচ্ছে ভগবানের কৃপাময় সংরক্ষণ। যোগের দ্বারা কৃষ্ণভাবনা লাভ করতে ভগবান ভক্তকে সহায়তা করেন এবং তিনি পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হলে ভগবান তাঁকে দুঃখময় বদ্ধ জীবনে পতিত হবার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করেন।

শ্লোক ২৩

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥ ২৩ ॥

যে—যারা; **অপি**—ও; **অন্য**—অন্য; **দেবতা**—দেবতা; **ভক্তাঃ**—ভক্তেরা; **যজন্তে**—পূজা করে; **শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ**—শ্রদ্ধা সহকারে; **তে**—তারা; **অপি**—ও; **মাম্ এব**—আমাকেই; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **যজন্তি**—পূজা করে; **অবিধিপূর্বকম্**—অবিধিপূর্বক।

গীতার গান

ইতর দেবতা যেবা পূজে শ্রদ্ধা করি ।
সেও আমাকে পূজে বিধি ধর্ম ছাড়ি ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! যারা অন্য দেবতাদের ভক্ত এবং শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের পূজা করে, প্রকৃতপক্ষে তারা অবিধিপূর্বক আমারই পূজা করে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "যারা দেবতাদের উপাসনা করে, তারা অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন, যদিও এই ধরনের উপাসনা পরোক্ষভাবে আমারই উপাসনা।" উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়,

গাছের গোড়ায় জল দেওয়ার পরিবর্তে কেউ যদি তার ডালপালায় জল দিতে থাকে, তবে সেটি সে করে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাবে অথবা সাধারণ নিয়মনীতি পালন না করার ফলে। তেমনই, দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সেবা করার উপায় হচ্ছে উদরে খাদ্য প্রদান করা। সুতরাং বলা যেতে পারে, দেবতারা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের সার্বভৌম প্রশাসনের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন পদাধিকারী শাসক ও সঞ্চালক। প্রজার কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের আইন পালন করা, কর্মচারীর অথবা সঞ্চালকদের কল্পিত বিধান পালন করা কখনই তার কর্তব্য নয়। তেমনই, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে কেবল পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা। ভগবানের আরাধনা করার ফলে তাঁর কর্মচারী-স্বরূপ বিভিন্ন দেবতারাও আপনা থেকেই তুষ্ট হন। শাসক ও সঞ্চালকেরা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে নিয়োজিত থাকেন এবং তাঁদের উৎকোচ দেওয়া অবৈধ। সেটিই এখানে *অবিধিপূর্বকম্* বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণ অনাবশ্যক দেবোপাসনা কখনই অনুমোদন করেন না।

শ্লোক ২৪

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

অহম্—আমি; **হি**—নিশ্চয়ই; **সর্ব**—সমস্ত; **যজ্ঞানাম্**—যজ্ঞের; **ভোক্তা**—ভোক্তা; **চ**—এবং; **প্রভুঃ**—প্রভু; **এব**—ও; **চ**—এবং; **ন**—না; **তু**—কিন্তু; **মাম্**—আমাকে; **অভিজানন্তি**—জানে; **তত্ত্বেন**—স্বরূপত; **অতঃ**—অতএব; **চ্যবন্তি**—অধঃপতিত হয়; **তে**—তারা।

গীতার গান

সর্ব যজ্ঞেশ্বর আমি প্রভু আর ভোক্তা ।
সে কথা বুঝে না যারা নহে তত্ত্ববেত্তা ॥
অতএব তত্ত্বজ্ঞান হইতে বিচ্যুত ।
প্রতীকোপাসনা সেই তাত্ত্বিক বিস্মৃত ॥

অনুবাদ

আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু। কিন্তু যারা আমার চিন্ময় স্বরূপ জানে না, তারা আবার সংসার সমুদ্রে অধঃপতিত হয়।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, *বেদে* নানা রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার বিধান দেওয়া আছে, কিন্তু সেই সমস্ত যজ্ঞের যথার্থ উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। *যজ্ঞ* শব্দের অর্থ হচ্ছে বিষ্ণু। *ভগবদ্গীতার* তৃতীয় অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যজ্ঞ বা বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করার জন্যই কেবল কর্ম করা উচিত। বর্ণাশ্রম-ধর্ম নামক মানব-সভ্যতার পূর্ণতা প্রাপ্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষ্ণুকে তুষ্ট করা। তাই, শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে বলেছেন, "সমস্ত যজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা হচ্ছি আমি, কারণ আমি হচ্ছি পরম প্রভু।" তবু অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা এই সত্যকে উপলব্ধি করতে না পেরে সাময়িক লাভের জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা করে। তাই, তারা সংসার সমুদ্রে পতিত হয় এবং জীবনের যথার্থ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। কিন্তু যদি কারও জাগতিক বাসনা পূর্ণ করার অভিলাষ থাকে, তার বরং ভগবানের কাছে তা প্রার্থনা করা অধিক শ্রেয়স্কর (যদিও তা শুদ্ধ ভক্তি নয়) এবং এভাবেই সে তার বাঞ্ছিত ফল লাভ করবে।

শ্লোক ২৫

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ২৫ ॥

যান্তি—প্রাপ্ত হন; **দেবব্রতাঃ**—দেবতাদের উপাসক; **দেবান্**—দেবতাদের; **পিতৄন্**—পূর্ব-পুরুষদের; **যান্তি**—লাভ করেন; **পিতৃব্রতাঃ**—পিতৃপুরুষদের উপাসকগণ; **ভূতানি**—ভূত-প্রেতদের; **যান্তি**—লাভ করেন; **ভূতেজ্যাঃ**—ভূত-প্রেত আদির উপাসকগণ; **যান্তি**—লাভ করেন; **মৎ**—আমার; **যাজিনঃ**—ভক্তগণ; **অপি**—কিন্তু; **মাম্**—আমাকে।

গীতার গান

ইতর দেবতা যাজী যায় দেবলোকে ।
পিতৃলোক উপাসক যায় পিতৃলোকে ॥
ভূতপ্রেত উপাসক ভূতলোকে যায় ।
আমাকে ভজন করে আমাকেই পায় ॥
আমার পূজন হয় সকলে সম্ভব ।
দরিদ্র হলেও নহে অপেক্ষা বৈভব ॥

অনুবাদ

দেবতাদের উপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হবেন; পিতৃপুরুষদের উপাসকেরা পিতৃলোক লাভ করেন; ভূত-প্রেত আদির উপাসকেরা ভূতলোক লাভ করেন; এবং আমার উপাসকেরা আমাকেই লাভ করেন।

তাৎপর্য

যদি কোন মানুষ চন্দ্র, সূর্য আদি গ্রহলোকে যেতে চায়, তা হলে তার লক্ষ্য অনুসারে বিশেষ বৈদিক বিধান পালন করার ফলে সেখানে সে যেতে পারে। এই সমস্ত বিধান *বেদের* 'দর্শ-পৌর্ণমাসী' নামক কর্মকাণ্ডীয় বিভাগে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে স্বর্গলোকের অধিপতি দেবতাদের উপাসনা করার বিধান দেওয়া হয়েছে। সেই রকম বিহিত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে পিতৃলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। তেমনই, আবার প্রেতলোকে গিয়ে যক্ষ, রক্ষ অথবা পিশাচ যোনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। পিশাচ উপাসনাকে জাদুবিদ্যা বা তিমির ইন্দ্রজাল বলা হয়। অনেক মানুষ আছে, যারা এই জাদুবিদ্যার অনুষ্ঠান করে এবং তারা মনে করে যে, এটি পারমার্থিক অনুষ্ঠান, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি সম্পূর্ণ জড়-জাগতিক কার্যকলাপ। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানের উপাসক শুদ্ধ ভক্ত নিঃসন্দেহে বৈকুণ্ঠলোক বা কৃষ্ণলোক প্রাপ্ত হন। এই গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকের মাধ্যমে এটি অত্যন্ত সরলভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, যদি দেব-উপাসনা করার ফলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, পিতাদের পূজা করার ফলে পিতৃলোক প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং পিশাচ উপাসনা করার ফলে প্রেতলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তা হলে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কেন কৃষ্ণলোক বা বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হবেন না? দুর্ভাগ্যবশত, অধিকাংশ মানুষই শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবিষ্ণুর এই অলৌকিক ধাম সম্বন্ধে অবগত নয় এবং ধামতত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হবার ফলে তারা বারবার সংসারে পতিত হয়। এমন কি নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতি থেকেও অধঃপতিত হয়। তাই, কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সমস্ত মানব-সমাজে এই পরম কল্যাণকারী জ্ঞান মুক্ত হস্তে বিতরণ করছে যে, কেবল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে মানুষ এই জীবন সার্থক করে তার যথার্থ আবাস ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে পারে।

শ্লোক ২৬

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

পত্রম্—পত্র; **পুষ্পম্**—ফুল; **ফলম্**—ফল; **তোয়ম্**—জল; **যঃ**—যিনি; **মে**—আমাকে; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **প্রযচ্ছতি**—প্রদান করেন; **তৎ**—তা; **অহম্**—আমি; **ভক্ত্যুপহৃতম্**—ভক্তি সহকারে নিবেদিত; **অশ্নামি**—গ্রহণ করি; **প্রযতাত্মনঃ**—আমার ভক্তি প্রভাবে বিশুদ্ধচিত্ত সেই ব্যক্তির।

গীতার গান

পত্র পুষ্প ফল জল ভক্ত মোরে দেয় ।
ভক্তির কারণ সেই গ্রহণীয় হয় ॥
যত্ন করি মোর ভক্ত যাহা কিছু দেয় ।
সন্তুষ্ট হইয়া লই ভক্তির প্রভায় ॥
নিরপেক্ষ ভক্ত তুমি এ মোর নিশ্চয় ।
তোমার যে কার্যক্রম সব ভক্তি হয় ॥

অনুবাদ

যে বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।

তাৎপর্য

বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময় সেবায় নিয়োজিত হয়ে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া আবশ্যক। তার ফলে শাশ্বত সুখের জন্য চিরস্থায়ী আনন্দময় ভগবৎ-ধাম লাভ করা যায়। এই প্রকার বিস্ময়কর ফল লাভ করার পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ এবং এমন কি অত্যন্ত দরিদ্রতম ব্যক্তিও কোন রকম যোগ্যতা ছাড়াই এর অনুশীলন করতে পারে। এটি লাভ করার পক্ষে একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া। কার কি পদমর্যাদা অথবা তার স্থিতি কি, তাতে কিছু আসে যায় না। পন্থাটি এতই সহজ যে, অকৃত্রিম প্রেমভক্তি সহকারে এমন কি একটি পত্র অথবা একটু জল অথবা ফল পরমেশ্বর ভগবানকে অর্পণ করা যেতে পারে এবং ভগবান তা গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হবেন। তাই, কৃষ্ণভাবনামৃত থেকে কেউই বাদ পড়তে পারে না, কারণ এটি অতি সহজসাধ্য ও সর্বজনীন। অত্যন্ত এই সরল পন্থার দ্বারা সচ্চিদানন্দময় জীবনের পরম পূর্ণতা লাভ করতে এমন কোন মূঢ় আছে যে, সে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করতে চায় না? কৃষ্ণ কেবল প্রেমভক্তি চান, অন্য কিছু নয়। কৃষ্ণ তাঁর শুদ্ধ ভক্ত থেকে এমন কি একটি পত্রও গ্রহণ

করেন। তিনি অভক্তের কাছ থেকে কোন রকমের নৈবেদ্য গ্রহণ করেন না। তাঁর কারও কাছ থেকে কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি হচ্ছেন স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু তবুও প্রীতি ও ভালবাসার বিনিময়ে তিনি তাঁর ভক্তের নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। কৃষ্ণভাবনায় বিকাশ সাধন করাই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি। কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করার একমাত্র উপায় যে ভক্তি, সেই কথাটিকে জোর দিয়ে ঘোষণা করবার জন্য *ভক্তি* শব্দটি এই শ্লোকে দুইবার উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য কোন উপায়ে, যেমন কেউ যদি ব্রাহ্মণ হয়, শিক্ষিত পণ্ডিত হয়, ধন-বিত্তশালী হয় অথবা বড় দার্শনিক হয়, তবুও তারা কৃষ্ণকে কোন কিছু নৈবেদ্য গ্রহণ করাতে অনুপ্রাণিত করতে পারে না। ভক্তির মৌলিক বিধান ব্যতীত কারও কাছ থেকে কোন কিছুই গ্রহণ করাতে ভগবানকে কেউই অনুপ্রাণিত করতে পারে না। ভক্তি হচ্ছে অহৈতুকী। পন্থাটি হচ্ছে শাশ্বত। এটি পরম-তত্ত্বের প্রতি প্রত্যক্ষ সেবা সম্পাদন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্বেই প্রতিপন্ন করেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন একমাত্র ভোক্তা, আদিপুরুষ ও সমস্ত যজ্ঞের পরম লক্ষ্য। এই শ্লোকে তিনি বলেছেন, কি ধরনের যজ্ঞ তাঁর প্রীতি উৎপাদন করে। যদি কেউ হৃদয়কে নির্মল করার জন্য এবং জীবনের পরম প্রয়োজন—প্রেমময়ী ভগবৎ-সেবা প্রাপ্ত হবার জন্য ভক্তিযোগে নিয়োজিত হবার অভিলাষী হয়, তা হলে তাকে জানতে হবে ভগবান তার কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন, তিনি তাঁকে কেবল সেই জিনিসগুলিই অর্পণ করেন, যা তাঁর প্রিয়। তিনি কখনও অবাঞ্ছিত অথবা প্রতিকূল বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করেন না। তাই মাছ, মাংস, ডিম আদি কখনই শ্রীকৃষ্ণের ভোগের যোগ্য নয়। যদি শ্রীকৃষ্ণ চাইতেন যে, এই সমস্ত দ্রব্যগুলি তাঁকে অর্পণ করা হোক, তা হলে তিনি সেই কথা বলতেন। কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি বলেছেন যে, পাতা, ফল, ফুল ও জল আদি দ্রব্যই যেন কেবল তাঁকে অর্পণ করা হয়। এই প্রকার ভোগ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, "আমি সেগুলি গ্রহণ করব।" তাই, আমাদের বুঝা উচিত যে, তিনি মাছ, মাংস, ডিম আদি কখনই গ্রহণ করেন না। শাক-সবজি, অন্ন, ফল, দুধ ও জল মানুষের উপযুক্ত আহার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে সেই বিধান দিয়ে গেছেন। এই সমস্ত সাত্ত্বিক সামগ্রী ব্যতীত আমরা যদি অন্য কিছু আহার করি, তবে তা কখনই শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে তাঁর প্রসাদরূপে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, তিনি কখনই তা গ্রহণ করেন না। অতএব, যদি আমরা মাছ, মাংস আদি নিষিদ্ধ পদার্থ ভগবানকে অর্পণ করি, তা হলে তা প্রেমময়ী ভগবদ্ভক্তির প্রতিকূল আচরণ করা হবে।

তৃতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন যে, কেবলমাত্র যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নই হচ্ছে শুদ্ধ, তাই যে সমস্ত মানুষ পারমার্থিক উন্নতি এবং মায়া বন্ধন থেকে মুক্তির অভিলাষী, তাদের পক্ষে এই অন্নই হচ্ছে আহার্য। ভগবানকে উৎসর্গ না করে যারা খাদ্য আহার করে, ভগবান সেই একই শ্লোকে বলেছেন যে, তারা তাদের পাপ ভক্ষণ করে। পক্ষান্তরে, তাদের প্রতিটি গ্রাস তাদেরকে মায়াজালের বন্ধনে আবদ্ধ করে। কিন্তু কেউ যদি শাক-সবজির ব্যঞ্জন বানিয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতি অথবা অর্চা-বিগ্রহকে তা নিবেদন করে বন্দনাপূর্বক সেই সামান্য নৈবেদ্য গ্রহণ করার প্রার্থনা করে, তবে তার জীবনে উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হয়, দেহ শুদ্ধ হয় এবং মস্তিষ্কের কোষগুলি সূক্ষ্ম হয়, যার ফলে পবিত্র নির্মল চিন্তা করা সম্ভব হয়। তবে সব সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই সমস্ত ভোগ যেন প্রেমভক্তি সহকারে নিবেদন করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু সমস্ত সৃষ্টির সব কিছুর একমাত্র অধিকারী, তাই আমাদের উৎসর্গীকৃত ভোগ গ্রহণ করার কোন আবশ্যকতা তাঁর নেই, কিন্তু তবুও আমরা যখন তাঁর প্রীতি উৎপাদন করবার জন্য তাঁকে নৈবেদ্য অর্পণ করি, তখন তিনি তা গ্রহণ করেন। আর ভোগ তৈরি করা এবং নিবেদন করার গুরুত্বপূর্ণ বিচার হচ্ছে, তা করা উচিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তি সহকারে।

নির্বিশেষবাদী দার্শনিকেরা যারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে মনে করে যে, পরমতত্ত্ব ইন্দ্রিয়বিহীন, *ভগবদ্গীতার* এই শ্লোকটি তাদের বোধগম্য হয় না। তাদের কাছে এটি কেবল রূপক অলঙ্কার মাত্র, অথবা তারা এটিকে *গীতার* প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণ যে একজন সাধারণ মানুষ, তার প্রমাণ বলে মনে করে। কিন্তু যথার্থ সত্য হচ্ছে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিব্য ইন্দ্রিয়সম্পন্ন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, তাঁর প্রতিটি ইন্দ্রিয় অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে সক্ষম। সেটিই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে অদ্বয় পরমতত্ত্ব বলার অর্থ। তিনি যদি ইন্দ্রিয়বিহীন হতেন, তা হলে তাঁকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ বলা হত না। সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনি দৃষ্টিপাত করার মাধ্যমে জড়া প্রকৃতির গর্ভে জীবদের প্রেরণ করেন। তেমনই ভোগ অর্পণ করে ভক্ত যখন প্রেমময়ী প্রার্থনার দ্বারা ভগবানকে তা নিবেদন করেন, ভগবান তখন তা শুনতে পান এবং তিনি তখন তা গ্রহণ করেন। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, তিনি হচ্ছেন পরমতত্ত্ব, তাই তাঁর শ্রবণ করা, ভোজন করা এবং স্বাদ আস্বাদন করার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। ভক্তই কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা অনুসারে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করে থাকেন। অর্থাৎ, তিনি ভগবানের বর্ণনার কদর্থ করেন না, তাই তিনি জানেন যে, অদ্বয় পরমতত্ত্ব ভোগ আহার করেন এবং তার ফলে তিনি আনন্দ উপভোগ করেন।

শ্লোক ২৭

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥

যৎ—যা; **করোষি**—তুমি কর; **যৎ**—যা; **অশ্নাসি**—তুমি খাও; **যৎ**—যা; **জুহোষি**—হোম কর; **দদাসি**—দান কর; **যৎ**—যা; **যৎ**—যা; **তপস্যসি**—তপস্যা কর; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **তৎ**—তা; **কুরুষ্ব**—কর; **মৎ**—আমাকে; **অর্পণম্**—সমর্পণ।

গীতার গান

অতএব কর যাহা ভোগ যজ্ঞ তপ ।
অর্পণ করহ তুমি আমাকে সে সব ॥

অনুবাদ

হে কৌন্তেয়! তুমি যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর, সেই সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।

তাৎপর্য

প্রতিটি মানুষেরই প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, তার জীবনকে এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে কোন অবস্থাতেই সে শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে না যায়। দেহ ও আত্মাকে একই সঙ্গে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য সকলকেই কর্ম করতে হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ এখানে আদেশ দিয়েছেন, সমস্ত কর্ম যেন কেবল তাঁর জন্যই করা হয়। জীবন ধারণের জন্য সকলকেই কিছু আহার করতে হয়; অতএব সমস্ত খাদ্যদ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে তাঁর প্রসাদ গ্রহণ করা উচিত। প্রত্যেক সভ্য মানুষেরই কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করতে হয়; অতএব শ্রীকৃষ্ণ আদেশ দিয়েছেন, "এই সব কিছুই আমার জন্য কর," এবং একে বলা হয় অর্চন। সকলেরই কিছু না কিছু দান করার প্রবৃত্তি আছে; শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন, "আমাকে দান কর।" এর তাৎপর্য হচ্ছে যে, সমস্ত সঞ্চিত ধন কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের জন্য উৎসর্গ করা উচিত। আজকাল ধ্যানযোগ পদ্ধতির প্রতি মানুষের অভিরুচি উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। কিন্তু এই যুগের পক্ষে তা বাস্তবসম্মত নয়। কিন্তু যে মানুষ জপমালায় হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে করতে চব্বিশ ঘণ্টা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন থাকার অভ্যাস করেন, তিনি নিশ্চিতরূপে পরম যোগী। সেই কথা *ভগবদ্গীতার* ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

শ্লোক ২৮

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

শুভ—মঙ্গলজনক; **অশুভ**—অমঙ্গলজনক; **ফলৈঃ**—ফলবিশিষ্ট; **এবম্**—এভাবে; **মোক্ষ্যসে**—মুক্ত হবে; **কর্ম**—কর্ম; **বন্ধনৈঃ**—বন্ধন হতে; **সন্ন্যাস**—সন্ন্যাস; **যোগ**—যোগ; **যুক্তাত্মা**—যুক্তচিত্ত; **বিমুক্তঃ**—মুক্ত; **মাম্**—আমাকে; **উপৈষ্যসি**—প্রাপ্ত হবে।

গীতার গান

শুভাশুভ ফল যাহা হয় তাহা দ্বারা ।
তাহার বন্ধন হতে মুক্ত তুমি সারা ॥
সেই সে সন্ন্যাসযোগ করিতে যুয়ায় ।
যাহার ফলেতে লোক মোরে প্রাপ্ত হয় ॥

অনুবাদ

এভাবেই আমাতে সমস্ত কর্ম অর্পণ দ্বারা শুভ ও অশুভ ফলবিশিষ্ট কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। এভাবেই সন্ন্যাস যোগে যুক্ত হয়ে তুমি মুক্ত হবে এবং আমাকেই প্রাপ্ত হবে।

তাৎপর্য

যিনি গুরুদেবের নির্দেশে কৃষ্ণভাবনাময় কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁকে যুক্ত বলা হয়। একে পরিভাষায় বলা হয় 'যুক্তবৈরাগ্য'। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ এই অবস্থাকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

(*ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব* ২/২৫৫)

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, যতক্ষণ আমরা এই সংসারে আছি, ততক্ষণ আমাদের কর্ম করতেই হবে; আমরা কখনই কাজ না করে থাকতে পারি না। তাই, আমরা যদি কর্ম করে তার ফল শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করি, তখন তাকে বলা হয় 'যুক্তবৈরাগ্য'। এই সন্ন্যাস যোগযুক্ত ক্রিয়া চিত্তরূপী দর্পণকে পরিমার্জিত করে

এবং তার ফলে অনুশীলনকারী ক্রমশ পারমার্থিক উপলব্ধিতে উন্নতি সাধন করেন এবং তখন তিনি পূর্ণরূপে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শরণাগত হন। সুতরাং অবশেষে তিনি বিশিষ্ট মুক্তি লাভ করেন। এই মুক্তির ফলে তিনি ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হয়ে যান না, পক্ষান্তরে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের ধামে প্রবেশ করেন। ভগবান এখানে স্পষ্টই বলেছেন, *মামুপৈষ্যসি*—"সে আমার কাছে চলে আসে," অর্থাৎ সে তার যথার্থ আবাস ভগবৎ-ধামে ফিরে যায়। মুক্তি পাঁচ প্রকারের হয় এবং এখানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে, সারা জীবন ভগবৎ-আজ্ঞা পালনকারী ভক্ত এমন পর্যায়ে উন্নীত হন, যেখান থেকে তিনি দেহত্যাগ করার পরে ভগবৎ-ধামে প্রবিষ্ট হয়ে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে পারেন।

অনন্য ভক্তি সহকারে যিনি ভগবানের সেবায় নিজের জীবন সমর্পণ করেছেন, তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী। এই ধরনের মানুষ নিজেকে ভগবানের নিত্যদাস বলে মনে করেন এবং সর্বদাই ভগবৎ-সংকল্পে আশ্রিত থাকেন। তাই, তিনি যে কাজই করেন, তা কেবল ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই করেন। তাই, তাঁর প্রত্যেকটি ক্রিয়াকলাপ ভগবৎ সেবাময় হয়ে ওঠে। তিনি *বেদ* বিহিত সকাম কর্ম এবং স্বধর্মের প্রতি কোন গুরুত্ব দেন না। সাধারণ মানুষের জন্যই কেবল বৈদিক স্বধর্মের আচরণ করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত শুদ্ধ ভক্ত কখনও কখনও বৈদিক বিধানের বিপরীত আচরণ করেন বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তা নয়।

তাই, বৈষ্ণব আচার্যেরা বলে গেছেন যে, এমন কি অতি বুদ্ধিমান লোকও শুদ্ধ ভক্তের পরিকল্পনা ও ক্রিয়াকর্ম বুঝতে পারে না। অবিকল কথাটি হচ্ছে—*তাঁর বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞেহ না বুঝয়* (চৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্য ২৩/৩৯) এভাবেই যে মানুষ ভগবানের সেবায় নিত্যযুক্ত অথবা ভগবানের চিন্তায় এবং ভগবানের সেবা-সংকল্পে নিত্য মগ্ন থাকেন, তাঁকে মনে করতে হবে তিনি বর্তমানে সর্বতোভাবে মুক্ত এবং ভবিষ্যতে তিনি যে ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবেন, সেই সম্বন্ধে সুনিশ্চিত। তিনিও শ্রীকৃষ্ণের মতো সব রকম জাগতিক সমালোচনার অতীত।

শ্লোক ২৯

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯ ॥

সমঃ—সমভাবাপন্ন; **অহম্**—আমি; **সর্বভূতেষু**—সমস্ত জীবের প্রতি; **ন**—নয়; **মে**—আমার; **দ্বেষ্যঃ**—বিদ্বেষ ভাবাপন্ন; **অস্তি**—হয়; **ন**—নয়; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **যে**—যাঁরা; **ভজন্তি**—ভজনা করেন; **তু**—কিন্তু; **মাম্**—আমাকে; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **ময়ি**—আমাতে; **তে**—তাঁরা; **তেষু**—তাঁদের; **চ**—ও; **অপি**—অবশ্যই; **অহম্**—আমি।

গীতার গান

আমি ত' সকল ভূতে দেখি সমভাব ।
নহে কেহ প্রিয় মোর দ্বেষ্য বা প্রভাব ॥
কিন্তু সেই ভজে মোরে ভক্তিযুক্ত হই ।
সে আমাতে আমি তাতে আসক্ত যে রই ॥

অনুবাদ

আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। কেউই আমার বিদ্বেষ ভাবাপন্ন নয় এবং প্রিয়ও নয়। কিন্তু যাঁরা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁরা আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও তাঁদের মধ্যে বাস করি।

তাৎপর্য

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ যদি প্রতিটি জীবের প্রতিই সমভাবাপন্ন হন এবং কেউই যদি তাঁর বিশেষ প্রিয় না হয়, তা হলে তিনি তাঁর সেবায় নিত্যযুক্ত অনন্য ভক্তের প্রতি কেন বিশেষভাবে অনুরক্ত? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাতে কোন ভেদভাব নেই, উপরন্তু এটিই স্বাভাবিক। এই জড় জগতে কোন মানুষ মহাদানী হতে পারে, তবুও সে তার নিজের সন্তানদের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত। ভগবান দাবি করছেন যে, প্রতিটি জীবই তাঁর সন্তান, তা সে যে যোনিতেই জন্ম গ্রহণ করুক। তাই, তিনি সমস্ত প্রাণীর জীবনের সব রকম প্রয়োজন উদারভাবে পূর্ণ করেন। পাষাণ, স্থল ও জলে কোন রকম ভেদবুদ্ধি না করে মেঘ যেমন সর্বত্রই সমানভাবে বর্ষণ করে, ভগবানের করুণাও তেমনই সকলের উপর সমভাবে বর্ষিত হয়। কিন্তু তাঁর ভক্তের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন। এই ধরনের ভক্তের কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে—তাঁরা কৃষ্ণভাবনায় নিয়তই মগ্ন, তাই তাঁরা সর্বদাই কৃষ্ণের মধ্যে অপ্রাকৃত স্তরে স্থিত থাকেন। 'কৃষ্ণভাবনা' এই শব্দটির অভিব্যক্তি এই যে, এই প্রকার চেতনা-সম্পন্ন মানুষ শ্রীভগবানের মধ্যে স্থিত জীবন্মুক্ত যোগী। ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে বলেছেন, *ময়ি তে*—"তারা আমাতে

স্থিত।" স্বভাবতই ভগবানও তাঁদের মধ্যে স্থিত থাকেন। এই সম্পর্ক পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। এটিকে ব্যাখ্যা করা যায় এভাবেও, *যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্*—"আমার প্রতি শরণাগতির মাত্রা অনুসারে আমি তাঁর তত্ত্বাবধান করি।" এই অপ্রাকৃত বিনিময় বর্তমান, কারণ ভগবান ও ভক্তবৃন্দ উভয়েই চৈতন্যময়। একটি সোনার আংটিতে যখন হীরে বসানো হয়, তখন সেটি দেখতে অতি সুন্দর লাগে। একত্রিত হবার ফলে সোনা ও হীরে উভয়েরই শোভা বর্ধিত হয়। ভগবান ও জীব নিত্যকাল প্রভাযুক্ত। জীব যখন ভগবৎ-সেবায় উন্মুখ হয়, তখন সে সোনার মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভগবান হচ্ছেন হীরে এবং তাই এই দুইয়ের সমন্বয় অত্যন্ত সুন্দর। শুদ্ধ অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট জীবকে বলা হয় ভক্ত। পরমেশ্বর ভগবানও আবার তাঁর ভক্তের ভক্ত হয়ে যান। ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে যদি এই বিনিময়ের সম্বন্ধ না থাকে, তা হলে সবিশেষ দর্শনের অস্তিত্বই থাকে না। নির্বিশেষবাদে পরমতত্ত্ব ও জীবের মধ্যে কোনও বিনিময় হয় না, কিন্তু সবিশেষবাদে অবশ্যই তা হয়।

এই উদাহরণটির প্রায়ই অবতারণা করা হয় যে, ভগবান কল্পবৃক্ষের মতো এবং এই কল্পবৃক্ষ থেকে যে যা চায়, ভগবান তাই দান করেন। কিন্তু এখানকার ব্যাখ্যাটি আরও পূর্ণাঙ্গ। এখানে ভগবানকে তাঁর ভক্তের প্রতি বিশেষভাবে পক্ষপাতী বলা হয়েছে। এটি ভক্তদের প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপার অভিব্যক্তি। ভক্ত ও ভগবানের এই ভাব বিনিময়কে কর্মফলের অধীন বলে মনে করা উচিত নয়। সেটি দিব্যস্তরে অবস্থিত, যেখানে ভগবান ও তাঁর ভক্তেরা নিত্য ক্রিয়াশীল। ভগবদ্ভক্তি এই জড় জগতের ক্রিয়া নয়; তা চিন্ময় জগতের ক্রিয়াকলাপ, যেখানে সচ্চিদানন্দময় দিব্য ভক্তিরস বিরাজ করে।

শ্লোক ৩০

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

অপি—এমন কি; **চেৎ**—যদি; **সুদুরাচারঃ**—অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তি; **ভজতে**—ভজনা করেন; **মাম্**—আমাকে; **অনন্যভাক্**—অনন্য ভক্তি সহকারে; **সাধুঃ**—সাধু; **এব**—অবশ্যই; **সঃ**—তিনি; **মন্তব্যঃ**—মনে করা উচিত; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **ব্যবসিতঃ**—দৃঢ়ভাবে অবস্থিত; **হি**—অবশ্যই; **সঃ**—তিনি।

গীতার গান

অনন্য যে ভক্ত যদি কভু দুরাচার ।
ভজন করয়ে মোরে একনিষ্ঠতার ॥
সে সাধু মন্তব্য হয় সম্যগ্ ব্যবসিত ।
দোষ তার কিছু নয় সে যে দৃঢ়ব্রত ॥

অনুবাদ

অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করেন, তাকে সাধু বলে মনে করবে, কারণ তাঁর দৃঢ় সংকল্পে তিনি যথার্থ মার্গে অবস্থিত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সুদুরাচারঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং এর যথার্থ অর্থ উপলব্ধি করা কর্তব্য। বদ্ধ জীবের ক্রিয়া দুই রকমের—নৈমিত্তিক ও নিত্য। দেহরক্ষা অথবা সমাজ ও রাষ্ট্রের বিধান পালনের জন্য বিভিন্ন কর্ম করা হয়। বদ্ধ জীবনে ভক্তকেও এই ধরনের কার্য করতে হয়। এই প্রকার কার্যকলাপকে বলা হয় নৈমিত্তিক। এ ছাড়া, যে জীব তাঁর চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সচেতন এবং যিনি কৃষ্ণভাবনায় অথবা ভগবদ্ভক্তিতে নিয়োজিত, তাঁর কার্যকলাপকে বলা হয় অপ্রাকৃত। তাঁর চিন্ময় স্বরূপে এই প্রকার কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয় এবং পরিভাষায় সেগুলিকে বলা হয় ভগবদ্ভক্তি। এখন বদ্ধ অবস্থায় কখনও কখনও ভগবৎ-সেবা এবং দেহ সম্বন্ধীয় কর্ম একই সঙ্গে সমান্তরালভাবে সম্পাদিত হতে থাকে। কিন্তু তারপর আবার, কখনও কখনও এই দুই ধরনের ক্রিয়ায় পরস্পর বিরোধও উৎপন্ন হতে পারে। ভক্ত সাধারণত যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করেন, যাতে তিনি এমন কোন কাজ না করেন যার ফলে তাঁর ভগবৎ-সেবা বাধা প্রাপ্ত হতে পারে। তিনি জানেন যে, কৃষ্ণভাবনায় উত্তরোত্তর অগ্রগতির উপর তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপের সফলতা নির্ভর করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কখনও কখনও দেখা যায় যে, কৃষ্ণভাবনা-পরায়ণ মানুষ এমন কাজ করে বসেন, যা সমাজ-ব্যবস্থা ও রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গর্হিত বলে মনে হয়। কিন্তু এই প্রকার ক্ষণিক পতন হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভক্তিযোগের অযোগ্য হন না। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে যে, অনন্যভাবে ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ মানুষ যদি পতিতও হন, তা হলে অন্তর্যামী ভগবান শ্রীহরি তাঁকে নির্মল করে পাপমুক্ত করে দেন। মায়ার মোহময়ী প্রভাব এতই প্রবল যে, এমন কি পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠ যোগীও কখনও কখনও

তার ফাঁদে পতিত হন; কিন্তু কৃষ্ণভাবনা এত অধিক শক্তিসম্পন্ন যে, যার ফলে এই ধরনের আকস্মিক পতন তৎক্ষণাৎ পরিশোধিত হয়ে যায়। তাই, ভগবদ্ভক্তির পন্থা সর্বদা সাফল্য অর্জন করে। যদি ভক্ত অকস্মাৎ আদর্শ ভাগবত পথ থেকে চ্যুত হন, তা হলেও তাঁকে উপহাস করা উচিত নয়, যে কথা পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হলে ভক্তের এই আকস্মিক পতন যথাসময়ে বন্ধ হয়ে যায়।

অতএব যে মানুষ কৃষ্ণভাবনায় স্থিত হয়ে সুদৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—এই মহামন্ত্র জপ করেন, তিনি যদি ঘটনাক্রমে অথবা অকস্মাৎ অধঃপতিত হন, তবুও তিনি অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত আছেন বলেই মনে করা উচিত। এই সম্বন্ধে *সাধুরেব* (তিনি সাধু) কথাটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা অভক্তদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, আকস্মিক পতন হওয়ার জন্য ভক্তকে উপহাস করা উচিত নয়; বরং তাঁকে সাধু বলেই মান্য করা উচিত। তা ছাড়া *মন্তব্যঃ* শব্দটি আরও বেশি জোরালো। এই শ্লোকের বিধান না মেনে যদি আকস্মিকভাবে পতিত ভক্তকে উপহাস করা হয়, তা হলে তা ভগবানের আজ্ঞার অবহেলা করা হবে। ভগবদ্ভক্তের একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে, অহৈতুকী ও অপ্রতিহতভাবে ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত থাকা।

নৃসিংহ পুরাণে বর্ণিত আছে—

ভগবতি চ হরাবনন্যচেতা
ভৃশমলিনোঽপি বিরাজতে মনুষ্যঃ ।
ন হি শশকলুষচ্ছবিঃ কদাচিৎ
তিমিরপরাভবতাম্ উপৈতি চন্দ্রঃ ॥

এর অর্থ হচ্ছে, কেউ সম্পূর্ণরূপে ভগবদ্ভক্তিতে রত থাকলেও কখনও কখনও তাকে হীন কর্মে নিয়োজিত দেখা যায়; এই ক্রিয়াকলাপগুলিকে চাঁদের কলঙ্কের মতো মনে করতে হবে। এই প্রকার কলঙ্ক চন্দ্রের আলো বিকিরণের বাধাস্বরূপ হয় না। তেমনই সৎপথ থেকে ভক্তের আকস্মিক পতন তাঁকে পাপাত্মায় পরিণত করে না।

তা বলে এটি কখনও মনে করা উচিত নয় যে, অপ্রাকৃত ভগবৎ-পরায়ণ ভক্ত সব রকম নিন্দনীয় কর্মে প্রবৃত্ত হতে পারেন। এই শ্লোকে কেবল বিষয় সংসর্গ-জনিত দুর্ঘটনার কথাই বলা হয়েছে। ভগবদ্ভক্তি বস্তুতপক্ষে মায়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সামিল। ভক্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সমর্থ

হচ্ছে, ততক্ষণ এই ধরনের দুর্ঘটনা-জনিত অধঃপতন হতে পারে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে, পূর্ণরূপে শক্তিশালী হওয়ার পরে তাঁর আর কখনও পতন হয় না। এই শ্লোকের দোহাই দিয়ে পাপাচারে প্রবৃত্ত হয়ে নিজেকে ভক্ত বলে মনে করা কখনই উচিত নয়। ভগবদ্ভক্তি সাধন করার পরেও যদি চরিত্র শুদ্ধ না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে উত্তম ভক্ত নয়।

শ্লোক ৩১

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

ক্ষিপ্রম্—অতি শীঘ্র; **ভবতি**—হন; **ধর্মাত্মা**—ধার্মিক; **শশ্বৎ**—নিত্য; **শান্তিম্**—শান্তি; **নিগচ্ছতি**—প্রাপ্ত হন; **কৌন্তেয়**—হে কুন্তীপুত্র; **প্রতিজানীহি**—ঘোষণা কর; **ন**—না; **মে**—আমার; **ভক্তঃ**—ভক্ত; **প্রণশ্যতি**—বিনাশ প্রাপ্ত হন।

গীতার গান

অতিশীঘ্র যাবে সেই ভাব দুরাচার ।
ধর্মভাব হবে তার ভক্তিতে আমার ॥
হে কৌন্তেয়! প্রতিজ্ঞা এ শুনহ আমার ।
আমার যে ভক্ত হয় নাশ নাহি তার ॥

অনুবাদ

তিনি শীঘ্রই ধর্মাত্মায় পরিণত হন এবং নিত্য শান্তি লাভ করেন। হে কৌন্তেয়! তুমি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হন না।

তাৎপর্য

ভগবানের এই উক্তির ভ্রান্ত অর্থ করা উচিত নয়। সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন যে, অসৎ কর্মে লিপ্ত মানুষেরা কখনই তাঁর ভক্ত হতে পারে না। যে ভগবানের ভক্ত নয়, তার কোনই সদ্‌গুণ নেই। তাই এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তা হলে স্বেচ্ছায় অথবা দুর্ঘটনাক্রমে পাপকর্মে প্রবৃত্ত মানুষ কিভাবে শুদ্ধ ভক্ত হতে পারে? এই ধরনের প্রশ্নের উত্থাপন ন্যায়সঙ্গত। সপ্তম অধ্যায় অনুসারে, যে দুষ্কৃতকারী সর্বদাই ভগবদ্ভক্তি থেকে বিমুখ থাকে, তার কোনই সদ্‌গুণ নেই। সেই কথা

শ্রীমদ্ভাগবতেও বলা হয়েছে। সাধারণত, নবধা ভক্তি আচরণকারী ভক্ত সমস্ত জাগতিক কলুষ থেকে হৃদয়কে নির্মল করতে প্রবৃত্ত থাকেন। তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করেন, তাই স্বাভাবিকভাবে তাঁর হৃদয় সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়। নিরন্তর ভগবৎ চিন্তা করার প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই তিনি শুদ্ধ হন। উন্নত স্তর থেকে ভ্রষ্ট হলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার বিধান *বেদে* আছে। কিন্তু এখানে সে রকম প্রায়শ্চিত্ত করার কোন বিধান দেওয়া হয়নি, কারণ নিরন্তর পরম পুরুষোত্তম ভগবানের চিন্তা করার ফলে ভক্তের হৃদয় আপনা থেকেই নির্মল হয়ে যায়। তাই, নিরন্তর **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে** কীর্তন করা উচিত। তার ফলে ভক্ত সব রকম আকস্মিক পতন থেকে রক্ষা পান। এভাবেই তিনি সব রকম জড় কলুষ থেকে সর্বদাই মুক্ত থাকেন।

শ্লোক ৩২

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩২ ॥

মাম্—আমাকে; **হি**—অবশ্যই; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **ব্যপাশ্রিত্য**—বিশেষভাবে আশ্রয় করে; **যে**—যারা; **অপি**—ও; **স্যুঃ**—হয়; **পাপযোনয়ঃ**—নীচকুলে জাত; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রী; **বৈশ্যাঃ**—বৈশ্য; **তথা**—এবং; **শূদ্রাঃ**—শূদ্র; **তে অপি**—তারাও; **যান্তি**—লাভ করে; **পরাম্**—পরম; **গতিম্**—গতি।

গীতার গান

আমাকে আশ্রয় করি যেবা পাপযোনি।
ম্লেচ্ছাদি যখন কিংবা বেশ্যা মধ্যে গণি ॥
কিংবা বৈশ্য শূদ্র যদি আমার আশ্রয়।
পাইবে বৈকুণ্ঠগতি জানিহ নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! যারা আমাকে বিশেষভাবে আশ্রয় করে, তারা স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র আদি নীচকুলে জাত হলেও অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে পরমেশ্বর ভগবান স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছেন যে, ভক্তিযোগে সকলেরই সমান অধিকার, এতে কোন জাতি-কুল আদির ভেদাভেদ নেই। জড়-জাগতিক জীবন ধারায় এই প্রকার ভেদাভেদ আছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তির কাছে তা নেই। পরম লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৪/১৮) বলা হয়েছে যে, এমন কি অত্যন্ত অধম যোনিজাত কুকুরভোজী চণ্ডাল পর্যন্ত শুদ্ধ ভক্তের সংসর্গে শুদ্ধ হতে পারে। সুতরাং, ভগবদ্ভক্তি ও শুদ্ধ ভক্তের পথনির্দেশ এতই শক্তিসম্পন্ন যে, তাতে উচ্চ-নীচ জাতিভেদ নেই; যে কেউ তা গ্রহণ করতে পারে। সবচেয়ে নগণ্য মানুষও যদি শুদ্ধ ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করে, তা হলে যথাযথ পথনির্দেশের মাধ্যমে সেও অচিরে শুদ্ধ হতে পারে। প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ অনুসারে মানুষকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে—সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, রজোগুণ-বিশিষ্ট ক্ষত্রিয় (শাসক), রজ ও তমোগুণ-বিশিষ্ট বৈশ্য (বণিক) এবং তমোগুণ-বিশিষ্ট শূদ্র (শ্রমিক)। তাদের থেকে অধম মানুষকে পাপযোনিভুক্ত চণ্ডাল বলা হয়। সাধারণত, উচ্চকুলোদ্ভূত মানুষেরা এই সমস্ত পাপযোনিভুক্ত জীবকে অস্পৃশ্য বলে দূরে ঠেলে দেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তির পন্থা এতই ক্ষমতাসম্পন্ন যে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত নীচবর্ণের মানুষদেরও মানব-জীবনের পরম সিদ্ধি প্রদান করতে সক্ষম। এটি সম্ভব হয় কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার ফলে। *ব্যপাশ্রিত্য* শব্দটির দ্বারা এখানে তা নির্দেশিত হয়েছে, তাই সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া উচিত। যিনি তা করেন, তিনি মহাজ্ঞানী এবং যোগীদের চেয়েও অধিক গৌরবান্বিত হন।

শ্লোক ৩৩

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩ ॥

কিম্—কি; **পুনঃ**—পুনরায়; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণেরা; **পুণ্যাঃ**—পুণ্যবান; **ভক্তাঃ**—ভক্তেরা; **রাজর্ষয়ঃ**—রাজর্ষিরা; **তথা**—ও; **অনিত্যম্**—অনিত্য; **অসুখম্**—দুঃখময়; **লোকম্**—লোক; **ইমম্**—এই; **প্রাপ্য**—লাভ করে; **ভজস্ব**—ভজনা কর; **মাম্**—আমাকে।

গীতার গান

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যারা তাদের কি কথা ।
পুণ্যবান হয় তারা জানিবে সর্বথা ॥
অতএব এ অনিত্য সংসারে আসিয়া ।
ভজন করহ মোর নিশ্চিন্তে বসিয়া ॥

অনুবাদ

পুণ্যবান ব্রাহ্মণ, ভক্ত ও রাজর্ষিদের আর কি কথা? তাঁরা আমাকে আশ্রয় করলে নিশ্চয়ই পরাগতি লাভ করবেন। অতএব, তুমি এই অনিত্য দুঃখময় মর্ত্যলোক লাভ করে আমাকে ভজনা কর।

তাৎপর্য

এই জগতে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই জগৎ কারও জন্যই সুখদায়ক নয়। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *অনিত্যমসুখং লোকম্*—এই জগৎ অনিত্য ও দুঃখময় এবং কোন সুস্থ মস্তিষ্ক-সম্পন্ন ভদ্রলোকের বসবাসের উপযুক্ত জায়গা এটি নয়। পরম পুরুষোত্তম ভগবান এই জগৎকে অনিত্য ও দুঃখময় বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কিছু কিছু দার্শনিকেরা, বিশেষ করে অল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন মায়াবাদী দার্শনিকেরা বলে যে, এই জগৎ মিথ্যা। কিন্তু *ভগবদ্গীতা* থেকে আমরা জানতে পারি যে, এই জগৎ মিথ্যা নয়; তবে এই জগৎ হচ্ছে অনিত্য। অনিত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য আছে। এই জগৎ অনিত্য, কিন্তু আর একটি জগৎ আছে, যা নিত্য শাশ্বত। এই জগৎ দুঃখময়, কিন্তু আর একটি জগৎ আছে যা নিত্য ও আনন্দময়।

অর্জুন রাজর্ষিকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁকেও ভগবান বলেছেন, "আমাকে ভক্তি কর এবং শীঘ্রই ভগবৎ-ধামে ফিরে এস।" এই দুঃখময় অনিত্য জগতে কারওই পড়ে থাকা উচিত নয়। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি আসক্ত হয়ে তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে শাশ্বত সুখ লাভ করা। ভগবদ্ভক্তিই হচ্ছে সকল শ্রেণীর মানুষের সব রকম দুঃখ দূর করার একমাত্র উপায়। তাই, প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করে তার জীবন সার্থক করে তোলা।

শ্লোক ৩৪

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

মন্মনাঃ—মদ্গত চিত্ত; **ভব**—হও; **মৎ**—আমার; **ভক্তঃ**—ভক্ত; **মৎ**—আমার; **যাজী**—পূজাপরায়ণ; **মাম্**—আমাকে; **নমস্কুরু**—নমস্কার কর; **মাম্**—আমাকে; **এব**—সম্পূর্ণরূপে; **এষ্যসি**—প্রাপ্ত হবে; **যুক্ত্বৈবম্**—এভাবে অভিনিবিষ্ট হয়ে; **আত্মানম্**—তোমার আত্মা; **মৎপরায়ণঃ**—মৎপরায়ণ হয়ে।

গীতার গান

মন্মনা মদ্ভক্ত মোর ভজন পূজন ।
আমাকে প্রণাম তুমি কর সর্বক্ষণ ॥
মৎপর হয়ে তুমি নিজ কার্য কর ।
অবশ্য পাইবে মোরে জান ইহা কর ॥

অনুবাদ

তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে প্রণাম কর এবং আমার পূজা কর। এভাবেই মৎপরায়ণ হয়ে সম্পূর্ণরূপে আমাতে অভিনিবিষ্ট হলে, নিঃসন্দেহে তুমি আমাকে লাভ করবে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কৃষ্ণভাবনার অমৃতই হচ্ছে এই দূষিত জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করার একমাত্র উপায়। যদিও এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সমস্ত ভক্তিযোগের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অসাধু ব্যাখ্যাকারেরা এই অতি স্পষ্ট তথ্যকে বিকৃত করে পাঠকের চিত্ত কৃষ্ণবিমুখ করে তোলে এবং তাকে কুপথে চালিত করে। এই ধরনের ব্যাখ্যাকারেরা জানে না যে, শ্রীকৃষ্ণের মন এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোন ভেদ নেই। শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ মানুষ নন, তিনি হচ্ছেন পরমতত্ত্ব। তাঁর দেহ, তাঁর মন ও তিনি স্বয়ং অদ্বয় পরমতত্ত্ব। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের আদিলীলা*, পঞ্চম অধ্যায়, ৪১-৪৮ সংখ্যক শ্লোকের অনুভাষ্যে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর *কূর্ম পুরাণ* থেকে একটি শ্লোকের উল্লেখ করে বলেছেন, *দেহদেহিবিভেদোঽয়ং নেশ্বরে*

বিদ্যতে ক্বচিৎ। অর্থাৎ, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর দেহে কোন ভেদ নেই। কিন্তু যেহেতু তথাকথিত ব্যাখ্যাকারেরা কৃষ্ণতত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাই তারা তাদের ব্যাখ্যা ও বাক্‌চাতুর্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আড়াল করে রেখে বলে যে, শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ স্বরূপ তাঁর দেহ ও মন থেকে ভিন্ন। যদিও এই ধরনের মন্তব্য কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার পরিচায়ক, কিন্তু কিছু মানুষ জনসাধারণকে এভাবেই বিপথগামী করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে।

কিছু আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষও শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করে। কিন্তু তাদের চিন্তা শ্রীকৃষ্ণের মাতুল কংসের মতোই বিদ্বেষপূর্ণ। সে-ও শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সদাসর্বদা তন্ময় থাকত, কিন্তু সে শ্রীকৃষ্ণকে শত্রুরূপে চিন্তা করত। তার সব সময় উদ্বেগ হত যে, কখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে হত্যা করতে আসবেন। এই ধরনের চিন্তার ফলে কোন লাভ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করা উচিত প্রেমভক্তি সহকারে। তাকেই বলা হয় ভক্তিযোগ। প্রত্যেকের নিরন্তর কৃষ্ণবিজ্ঞান অনুশীলন করার চেষ্টা করা উচিত। সেই অনুকূল অনুশীলন কি? সদ্‌গুরুর আশ্রয়ে শিক্ষা গ্রহণ করাই হচ্ছে কৃষ্ণতত্ত্বের অনুকূল অনুশীলন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং আমরা ইতিপূর্বে কয়েকবার বিশ্লেষণ করেছি যে, তাঁর শ্রীবিগ্রহ জড় নয়, কিন্তু তা সচ্চিদানন্দময়। এই ধরনের কৃষ্ণকথা মানুষকে ভক্ত হতে সহায়তা করে। তা না করে যদি কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তির কাছে কৃষ্ণতত্ত্ব জানবার চেষ্টা করা হয়, তা হলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য, আদ্যরূপে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করে, হৃদয়ে সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জেনে তাঁর পূজায় তৎপর হওয়া উচিত। ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করার জন্য হাজার হাজার মন্দির আছে এবং সেখানে ভক্তিযোগ অনুশীলন করা হয়। এই ভক্তিযোগের একটি অঙ্গ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করা। ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে দণ্ডবৎ প্রণাম করা উচিত এবং কায়মনোবাক্যে সর্বতোভাবে কৃষ্ণোন্মুখ হতে হয়। তার ফলে শ্রীকৃষ্ণে অবিচলিত নিষ্ঠার উদয় হয় এবং কৃষ্ণলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। অসাধু ব্যাখ্যাকারদের বাক্‌চাতুর্যে কারও পথভ্রষ্ট হওয়া উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ, কীর্তন আদি নবধা ভক্তির অনুশীলনে প্রত্যেকের নিষ্ঠাপরায়ণ হওয়া উচিত। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তিই হচ্ছে মানব-সমাজের পরম প্রাপ্তি।

ভগবদ্‌গীতার সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে মনোধর্মী জ্ঞান, অষ্টাঙ্গযোগ ও সকাম কর্ম থেকে মুক্ত শুদ্ধ ভক্তিযোগের বর্ণনা করা হয়েছে। যারা পূর্ণরূপে শুদ্ধ হতে পারেনি, তারা নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি, সর্বভূতে স্থিত পরমাত্মা আদি ভগবানের অন্যান্য

রূপের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত কেবল ভগবানের সেবাকেই অঙ্গীকার করেন।

কৃষ্ণ-বিষয়ক একটি অতি মধুর কবিতাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যান্য দেব-দেবীর পূজায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণ মূঢ় এবং তারা কখনই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম কৃপা লাভ করতে পারে না। ভক্ত প্রামাণিক পর্যায়ে কখনও কখনও তাঁর প্রকৃত অবস্থা থেকে সাময়িকভাবে অধঃপতিত হতে পারে, তবুও তাঁকে সকল দার্শনিক ও যোগীদের থেকে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা উচিত। যে ব্যক্তি কৃষ্ণচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সতত কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত আছেন, তিনিই প্রকৃত সাধু ব্যক্তি। তাঁর দৈবক্রমে অনুষ্ঠিত অভক্তোচিত কার্যকলাপ অচিরেই বিনষ্ট হবে এবং তিনি শীঘ্রই নিঃসন্দেহে পরম সিদ্ধি লাভ করবেন। পরমেশ্বর ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের কখনও পতনের সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, পরম পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং তাঁর শুদ্ধ ভক্তের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই কৃষ্ণভক্তির এই সরল পন্থাটি অবলম্বন করে, এই জড় জগতেই পরম সুখে জীবন যাপন করা উচিত। অবশেষে তিনিই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম কৃপা লাভ করবেন।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—গূঢ়তম জ্ঞান বিষয়ক 'রাজগুহ্য-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়

বিভূতি-যোগ

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **এব**—অবশ্যই; **মহাবাহো**—হে মহাবীর; **শৃণু**—শ্রবণ কর; **মে**—আমার; **পরমম্**—পরম; **বচঃ**—বাক্য; **যৎ**—যা; **তে**—তোমাকে; **অহম্**—আমি; **প্রীয়মাণায়**—আমার প্রিয় পাত্র বলে মনে করে; **বক্ষ্যামি**—বলব; **হিতকাম্যয়া**—হিত কামনায়।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

আবার বলি যে শুন পরম বচন ।
তোমার মঙ্গল হেতু কহি বিবরণ ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে মহাবাহো! পুনরায় শ্রবণ কর। যেহেতু তুমি

আমার প্রিয় পাত্র, তাই তোমার হিতকামনায় আমি পূর্বে যা বলেছি, তার থেকেও উৎকৃষ্ট তত্ত্ব বলছি।

তাৎপর্য

ভগবান শব্দটির ব্যাখ্যা করে পরাশর মুনি বলেছেন, যিনি সর্বতোভাবে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ— যাঁর মধ্যে সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য পূর্ণরূপে বিদ্যমান, তিনিই হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে প্রকট ছিলেন, তিনি তাঁর ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছিলেন। তাই পরাশর মুনির মতো মহর্ষিরা সকলেই তাঁকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলে স্বীকার করেছেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর বিভূতি ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে আরও গূঢ়তম জ্ঞান প্রদান করেছেন। পূর্বে সপ্তম অধ্যায় থেকে শুরু করে ভগবান তাঁর বিভিন্ন শক্তি এবং তারা কিভাবে ক্রিয়া করে, সেই কথা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এখন এই অধ্যায়ে তিনি তাঁর বিশেষ বিভূতির কথা অর্জুনকে শোনাচ্ছেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির কথা বিশ্লেষণ করে শুনিয়েছেন যাতে অর্জুনের হৃদয়ে দৃঢ় ভক্তির উদয় হয়। এই অধ্যায়ে তিনি আবার অর্জুনকে তাঁর বিবিধ প্রকাশ ও বিভূতির কথা শোনাচ্ছেন।

পরমেশ্বর ভগবানের কথা যতই শ্রবণ করা যায়, ভগবানের প্রতি ভক্তি ততই দৃঢ় হয়। ভক্তসঙ্গে ভগবানের কথা সর্বদাই শ্রবণ করা উচিত, তার ফলে ভক্তি বৃদ্ধি হয়। যাঁরা যথার্থভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভের প্রয়াসী, তাঁরাই কেবল ভক্তসঙ্গে ভগবানের কথা আলোচনা করতে সক্ষম। অন্যেরা এই ধরনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। ভগবান স্পষ্টভাবে অর্জুনকে বলেছেন যে, যেহেতু অর্জুন তাঁর অতি প্রিয়, তাই তাঁর মঙ্গলের জন্য এই সমস্ত কথা আলোচনা হচ্ছে।

শ্লোক ২

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ ॥ ২ ॥

ন—না; **মে**—আমার; **বিদুঃ**—জানেন; **সুরগণাঃ**—দেবতাগণ; **প্রভবম্**—উৎপত্তি; **ন**—না; **মহর্ষয়ঃ**—মহর্ষিগণ; **অহম্**—আমি; **আদিঃ**—আদি কারণ; **হি**—অবশ্যই; **দেবানাম্**—দেবতাদের; **মহর্ষীণাম্**—মহর্ষিদের; **চ**—ও; **সর্বশঃ**—সর্বতোভাবে।

গীতার গান

আমার প্রভাব যেই কেহ নাহি জানে ।
সুরগণ ঋষিগণ কত জনে জনে ॥
সকলের আদি আমি দেব ঋষি যত ।
ভাবিয়া চিন্তিয়া তারা কি বুঝিবে কত ॥

অনুবাদ

দেবতারা বা মহর্ষিরাও আমার উৎপত্তি অবগত হতে পারেন না, কেন না, সর্বতোভাবে আমিই দেবতা ও মহর্ষিদের আদি কারণ।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতাতে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই; তিনি সর্ব কারণের পরম কারণ। এখানেও ভগবান নিজেই বলেছেন যে, তিনিই সমস্ত দেব-দেবী ও ঋষিদের উৎস। এমন কি দেব-দেবী এবং ঋষিরাও শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন না। তাঁরা তাঁর নাম ও স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারেন না, সুতরাং এই অতি ক্ষুদ্র গ্রহের তথাকথিত পণ্ডিতদের জ্ঞান যে কতটুকু, তা সহজেই অনুমেয়। পরমেশ্বর ভগবান কেন যে এই পৃথিবীতে একজন সাধারণ মানুষের মতো অবতীর্ণ হয়ে পরম আশ্চর্যজনক ও অলৌকিক লীলাবিলাস করেন, তা কেউই বুঝতে পারে না। তাই আমাদের বোঝা উচিত যে, তথাকথিত পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানা যায় না। এমন কি স্বর্গের দেব-দেবী এবং মহান ঋষিরাও মনোধর্মের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে জানবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাঁরা সফল হতে পারেননি। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এমন কি সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতারাও পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারেননি। তাঁরা তাঁদের সীমিত অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুমান করতে পারেন এবং তার ফলে নির্বিশেষবাদের অপসিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন, যা জড় জগতের তিনগুণের অতীত, অথবা মনোধর্মের বশবর্তী হয়ে তাঁরা নানা রকমের অলীক কল্পনা করতে পারেন, কিন্তু এই ধরনের নির্বোধ অনুমানের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কখনই উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

ভগবান এখানে পরোক্ষভাবে বলেছেন যে, যদি কেউ পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে চায়, "আমিই সেই পরমেশ্বর ভগবান, আমিই সেই পরমতত্ত্ব।" এটি সকলেরই বোঝা উচিত। পরমেশ্বর ভগবান অচিন্তনীয়, তাই তিনি আমাদের সামনে থাকলেও

তাঁকে উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু তবুও তিনি আছেন। আমরা কিন্তু *ভগবদ্গীতা* ও *শ্রীমদ্ভাগবতের* বাণী যথাযথভাবে গ্রহণ করার মাধ্যমে সেই সচ্চিদানন্দময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারি। যারা ভগবানের নিকৃষ্ট শক্তিতে অবস্থিত, তারা ভগবানকে কোন শাসক-প্রধানরূপে অথবা নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে অনুমান করতে পারে, কিন্তু অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারে না।

যেহেতু অধিকাংশ মানুষই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর স্বরূপে উপলব্ধি করতে পারে না, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অহৈতুকী করুণা প্রদর্শন করার জন্য এই জগতে অবতীর্ণ হয়ে এই সমস্ত মনোধর্মীদের প্রতি কৃপা করেন। কিন্তু ভগবানের অলৌকিক লীলা সম্বন্ধে অবগত হওয়া সত্ত্বেও, এই ধরনের মনোধর্মীরা জড় জগতের কলুষের দ্বারা কলুষিত থাকার ফলে মনে করে যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব। যে সব ভক্ত সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরাই কেবল ভগবানের কৃপার প্রভাবে উপলব্ধি করতে পারেন যে, তিনিই হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। ভগবানের নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপলব্ধি নিয়ে ভক্ত মাথা ঘামান না। তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির প্রভাবে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের চরণে তৎক্ষণাৎ আত্মসমর্পণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁরা তাঁকে জানতে পারেন। তা ছাড়া আর কেউই তাঁকে জানতে পারে না। তাই মহাঋষিরাও স্বীকার করেন, আত্মা কি? পরমতত্ত্ব কি? • তা হচ্ছেন তিনি, যাঁকে আমাদের ভজনা করা উচিত।

শ্লোক ৩

যো মামজমনাদিং চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

যঃ—যিনি; **মাম্**—আমাকে; **অজম্**—জন্মরহিত; **অনাদিম্**—অনাদি; **চ**—ও; **বেত্তি**—জানেন; **লোক**—সমস্ত গ্রহলোকের; **মহেশ্বরম্**—ঈশ্বর; **অসংমূঢ়ঃ**—মোহশূন্য হয়ে; **সঃ**—তিনি; **মর্ত্যেষু**—মরণশীলদের মধ্যে; **সর্বপাপৈঃ**—সমস্ত পাপ থেকে; **প্রমুচ্যতে**—মুক্ত হন।

গীতার গান

যে মোরে অনাদি জানে লোক মহেশ্বর ।
সচ্চিদ্ আনন্দ শ্রেষ্ঠ অব্যয় অজর ॥

মর্ত্যলোকে অসংমূঢ় যেই ব্যক্তি হয় ।
এই মাত্র জানি তার সর্ব পাপ ক্ষয় ॥

অনুবাদ

যিনি আমাকে জন্মরহিত, অনাদি ও সমস্ত গ্রহলোকের মহেশ্বর বলে জানেন, তিনিই কেবল মানুষদের মধ্যে মোহশূন্য হয়ে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হন।

তাৎপর্য

সপ্তম অধ্যায়ে (৭/৩) বলা হয়েছে যে, *মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে*—যাঁরা আত্মজ্ঞান লাভের প্রয়াসী, তাঁরা সাধারণ মানুষ নন। আত্ম-জ্ঞানবিহীন লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের থেকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যথার্থ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রয়াসী পুরুষদের মধ্যে কদাচিৎ দুই-একজন কেবল উপলব্ধি করতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান, সর্বলোক মহেশ্বর ও অজ। এভাবেই যাঁরা ভগবৎ-তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন, তাঁরাই অধ্যাত্ম মার্গে সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণের পরমপদ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারার ফলেই কেবল পাপময় কর্মের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া যায়।

এখানে *অজ* শব্দটির দ্বারা ভগবানকে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'জন্মরহিত'। দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবকেও *অজ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু ভগবান জীব থেকে ভিন্ন। জীবেরা জন্মগ্রহণ করছে এবং বৈষয়িক আসক্তির ফলে মৃত্যুবরণ করছে, কিন্তু ভগবান তাদের থেকে আলাদা। বদ্ধ জীবাত্মারা তাদের দেহ পরিবর্তন করছে, কিন্তু ভগবানের দেহের কোন পরিবর্তন হয় না। এমন কি তিনি যখন জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর অপরিবর্তিত *অজ* রূপেই অবতরণ করেন। তাই চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, ভগবান সব সময়ই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিতে অধিষ্ঠিত। তিনি কখনই অনুৎকৃষ্টা মায়াশক্তি দ্বারা প্রভাবিত হন না। তিনি সব সময়ই তাঁর উৎকৃষ্টা শক্তিতে অবস্থান করেন।

এই শ্লোকে *বেত্তি লোকমহেশ্বরম্* কথাটি ইঙ্গিত করে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহলোকের মহেশ্বর এবং তা সকলের জানা উচিত। সৃষ্টির পূর্বেও তিনি ছিলেন এবং তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে ভিন্ন। দেব-দেবীরা সকলেই এই জড় জগতে সৃষ্ট হয়েছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে, তিনি কখনও সৃষ্ট হন না; তাই তিনি ব্রহ্মা, শিব আদি মহান দেবতাদের থেকেও ভিন্ন। আর যেহেতু তিনি ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য সমস্ত দেব-দেবীর সৃষ্টিকর্তা, তাই তিনি সমস্ত গ্রহলোকেরও পরম পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ তাই সমস্ত সৃষ্টি থেকে ভিন্ন এবং এভাবেই যখন কেউ শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপময় কর্মফল থেকে মুক্ত হন। পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে হলে সব রকমের পাপময় কর্মফল থেকে মুক্ত হতে হবে। কেবলমাত্র ভক্তির মাধ্যমেই তাঁকে জানা যায়, এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে তাঁকে জানতে পারা যায় না। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণকে কখনই একজন মানুষরূপে জানবার চেষ্টা করা উচিত নয়। পূর্বেই সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, একমাত্র মূঢ় ব্যক্তি তাঁকে একজন মানুষ বলে মনে করে। সেই কথাই এখানে একটু ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যে মানুষ মূর্খ নয়, যিনি যথার্থ বুদ্ধিমান, তিনি ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন এবং তার ফলে তিনি সব রকমের পাপময় কর্মফল থেকে মুক্ত হন।

শ্রীকৃষ্ণ যদি দেবকীর পুত্র হন, তা হলে তিনি অজ হন কি করে? সেই কথাও *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে—তিনি যখন দেবকী ও বসুদেবের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো জন্মগ্রহণ করেননি; তিনি তাঁর আদি চিন্ময় স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তারপর তিনি নিজেকে একটি সাধারণ শিশুতে রূপান্তরিত করেন।

শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে যা কিছু করা হয়, তা অপ্রাকৃত। তা জড় জগতের শুভ অথবা অশুভ কোন কর্মফলের দ্বারাই কলুষিত হয় না। জড় জগতের শুভ ও অশুভ সম্বন্ধে যে ধারণা তা কম-বেশি মনোধর্ম-প্রসূত অলীক কল্পনা মাত্র, কারণ এই জড় জগতে শুভ বলতে কিছুই নেই। সব কিছুই অশুভ, কারণ এই জড়া প্রকৃতিই হচ্ছে অশুভ। আমরা কেবল কল্পনা করি যে, তা শুভ। প্রগাঢ় ভক্তি ও সেবার মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপের উপর যথার্থ শুভ নির্ভরশীল। যদি আমরা প্রকৃতই শুভ কর্ম সম্পাদনে প্রয়াসী হই, তা হলে আমাদের পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ অনুসারে কাজ করা উচিত। সেই সমস্ত নির্দেশ আমরা *শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা* আদি শাস্ত্রগ্রন্থ অথবা সদ্গুরুর কাছ থেকে পেতে পারি। সদ্গুরু যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি, তাই তাঁর নির্দেশ প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ। সদ্গুরু, সাধু ও শাস্ত্র একই নির্দেশ দান করেন। এই তিনের নির্দেশের মধ্যে কোন রকম বিরোধ নেই। তাঁদের নির্দেশ অনুসারে সাধিত সমস্ত কর্ম জড় জগতের সব রকমের শুভ বা অশুভ কর্মফল থেকে মুক্ত থাকে। কর্মকালে ভক্তের অপ্রাকৃত মনোভাবই হচ্ছে যথার্থ বৈরাগ্য এবং তাকেই বলা হয় সন্ন্যাস। *ভগবদ্গীতার* ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে, যিনি

কর্তব্যবোধে কর্ম করেন, যেহেতু সেই প্রকার কর্ম করতে তিনি ভগবানের দ্বারা নির্দেশিত হয়েছেন এবং যিনি তাঁর কর্মফলের প্রতি আশ্রিত নন (*অনাশ্রিতঃ কর্মফলম্*), তিনিই হচ্ছে যথার্থ সন্ন্যাসী। ভগবানের নির্দেশ অনুসারে যিনি কর্তব্যকর্ম করেন, তিনিই হচ্ছেন যথার্থ সন্ন্যাসী ও যোগী। সন্ন্যাসী বা যোগীর পোশাক পরলেই যোগী হওয়া যায় না।

শ্লোক ৪-৫

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ॥ ৪ ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ ॥ ৫ ॥

বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **অসংমোহঃ**—সংশয়মুক্তি; **ক্ষমা**—ক্ষমা; **সত্যম্**—সত্যবাদিতা; **দমঃ**—ইন্দ্রিয়-সংযম; **শমঃ**—মনঃসংযম; **সুখম্**—সুখ; **দুঃখম্**—দুঃখ; **ভবঃ**—জন্ম; **অভাবঃ**—মৃত্যু; **ভয়ম্**—ভয়; **চ**—ও; **অভয়ম্**—অভয়; **এব**—ও; **চ**—এবং; **অহিংসা**—অহিংসা; **সমতা**—সমতা; **তুষ্টিঃ**—সন্তুষ্টি; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **দানম্**—দান; **যশঃ**—যশ; **অযশঃ**—অযশ; **ভবন্তি**—উৎপন্ন হয়; **ভাবাঃ**—ভাব; **ভূতানাম্**—প্রাণীদের; **মত্তঃ**—আমার থেকে; **এব**—অবশ্যই; **পৃথগ্‌বিধাঃ**—নানা প্রকার।

গীতার গান

সূক্ষ্মার্থ নির্ণয় যোগ্য বুদ্ধি যাহা হয় ।
আত্ম যে অনাত্ম তাহা জ্ঞানের বিষয় ॥
সত্য, দম, শম, ক্ষমা, সুখ, দুঃখ, ভয় ।
অভয়, ভবাভব আর অহিংসা যা হয় ॥
সমতাদিতুষ্টিযশ অযশ বা দান ।
সকল ভূতের ভাব যাহা কিছু আন ॥
আমি তার সৃষ্টিকর্তা পৃথক পৃথক ।
বুদ্ধিমান যেবা হয় বুঝয়ে নিছক ॥

অনুবাদ

বুদ্ধি, জ্ঞান, সংশয় ও মোহ থেকে মুক্তি, ক্ষমা, সত্যবাদিতা, ইন্দ্রিয়-সংযম, মনঃসংযম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, সন্তোষ, তপস্যা, দান, যশ ও অযশ—প্রাণীদের এই সমস্ত নানা প্রকার ভাব আমার থেকেই উৎপন্ন হয়।

তাৎপর্য

জীবের সব রকম গুণাবলী—ভালই হোক অথবা মন্দই হোক, তা সবই শ্রীকৃষ্ণেরই সৃষ্ট এবং সেই সম্বন্ধে এখানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

যথাযথভাবে বিষয়-বস্তুর বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাকে বলা হয় বুদ্ধি এবং জড় ও চেতনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার বোধকে বলা হয় জ্ঞান। জড় বস্তু সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের ফলে যে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় তা সাধারণ জ্ঞান এবং তাকে এখানে জ্ঞান বলে স্বীকার করা হচ্ছে না। জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে জড় ও চেতনের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করা। আধুনিক যুগের শিক্ষায় চেতন সম্বন্ধে কোন রকম জ্ঞানই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেগুলি কেবল জড় উপাদান ও জড় দেহের প্রয়োজনের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। তাই এই কেতাবি বিদ্যা অসম্পূর্ণ।

অসংমোহ, অর্থাৎ সংশয় ও মোহ থেকে মুক্তি তখন লাভ করা সম্ভব, যখন কারও অপ্রাকৃত দর্শনতত্ত্ব উপলব্ধি লাভ করার ফলে দ্বিধা মোচন হয়। ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে সে তখন মোহ থেকে মুক্ত হয়। অন্ধভাবে কোন কিছুই গ্রহণ করা উচিত নয়; সব কিছু গ্রহণ করা উচিত সতর্কতা ও যত্নের সঙ্গে। *ক্ষমা* অনুশীলন করা উচিত; সহিষ্ণু হওয়া উচিত এবং অপরের ক্ষুদ্র ভুল-ত্রুটিগুলি মার্জনা করে দেওয়া উচিত। *সত্যম্* অর্থাৎ প্রকৃত তথ্য অপরের সুবিধার জন্য যথাযথভাবে প্রদান করা উচিত। সত্যকে কখনই বিকৃত করা উচিত নয়। সামাজিক রীতি অনুসারে বলা হয় যে, সত্য কথা কেবল তখনই বলা যেতে পারে, যদি তা অপরের রুচিকর হয়। কিন্তু সেটি সত্যবাদিতা নয়। দৃঢ়তা ও সপ্রতিভতার সঙ্গে অকপটভাবে সত্য বলা উচিত, যাতে যথার্থ তত্ত্ব সম্বন্ধে যথাযথভাবে সকলে অবগত হতে পারে। কোন মানুষ যদি চোর হয় এবং অপরকে যদি সেই সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া হয়, তবে সেটি সত্য, যদিও সত্য কখনও কখনও অপ্রিয় হতে পারে, কিন্তু তার থেকে নিরস্ত হওয়া কখনই উচিত নয়। সত্য আমাদের কাছে দাবি করে যে, অপরের সুবিধার জন্য প্রকৃত ঘটনা যথাযথভাবে প্রদান করা হোক। সেটিই হচ্ছে সত্যের সংজ্ঞা।

ইন্দ্রিয়-সংযমের অর্থ হচ্ছে নিরর্থক আত্মতৃপ্তির জন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার না করা। ইন্দ্রিয়ের যথার্থ প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য কোন রকম নিষেধ নেই, কিন্তু অযথা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পারমার্থিক উন্নতির প্রতিবন্ধক-স্বরূপ। তাই ইন্দ্রিয়গুলির অনর্থক ব্যবহার দমন করা উচিত। তেমনই মনকেও অনাবশ্যক চিন্তা থেকে বিরত রাখা উচিত। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় *শম*। অর্থ উপার্জনের চিন্তায় সময় নষ্ট করা উচিত নয়। সেটি কেবল চিন্তাশক্তির অপচয় মাত্র। মানব-জীবনের পরম প্রয়োজন উপলব্ধি করার জন্যই মনের ব্যবহার করা উচিত এবং তা শাস্ত্রসম্মত যথাযথভাবে করা উচিত। শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ, সাধু, সদ্‌গুরু ও উন্নতমনা পুরুষের সাহচর্যে চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধন করা উচিত। *সুখম্*, শুধুমাত্র কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তির দিব্যজ্ঞান লাভের পক্ষে যা অনুকূল, তার মাধ্যমেই প্রাপ্ত হওয়া উচিত। আর তেমনই, ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে যা প্রতিকূল তা দুঃখজনক। কৃষ্ণভক্তি বিকাশের পক্ষে যা অনুকূল তা গ্রহণীয় এবং যা প্রতিকূল তা বর্জনীয়।

ভব অর্থাৎ জন্ম, দেহ সম্পর্কিত বলেই জানা উচিত। আত্মার জন্ম হয় না, মৃত্যু হয় না; সেই কথা *ভগবদ্‌গীতার* প্রারম্ভেই আলোচনা করা হয়েছে। জন্ম ও মৃত্যু জড় জগতে দেহ ধারণ করার পরিপ্রেক্ষিতেই কেবল সম্বন্ধযুক্ত। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগের ফলেই ভয়ের উদয় হয়। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত সর্বদাই নির্ভীক, কারণ তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন যে, তাঁর কার্যকলাপের ফলে তিনি তাঁর প্রকৃত আলয়, চিন্ময় জগতে ভগবানের কাছে ফিরে যাবেন। তাই তাঁর ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। অন্যেরা কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। পরবর্তী জীবনে তাদের ভাগ্যে কি আছে, সেই সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। তাই, তারা সর্বক্ষণ গভীর উৎকণ্ঠায় কালাতিপাত করে। আমরা যদি উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হতে চাই, তবে শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অবগত হয়ে কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হওয়া। সেভাবেই আমরা সব রকম ভয়ের হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারব। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১১/২/৩৭) বলা হয়েছে যে, *ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ*—মায়াতে মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকার ফলেই ভয়ের উদয় হয়। কিন্তু যাঁরা মায়াশক্তি থেকে মুক্ত, যাঁরা স্থির নিশ্চিতভাবে জানেন যে, তাঁদের স্বরূপ তাঁদের জড় দেহটি নয়, তাঁরা হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবানের চিন্ময় অংশ, তাই তাঁরা সর্বক্ষণ ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত এবং সর্বতোভাবে ভয় থেকে মুক্ত। তাঁদের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করেনি, তারাই কেবল আশঙ্কাগ্রস্ত। *অভয়ম্*, অর্থাৎ ভয়শূন্য কেবল তিনিই হতে পারেন, যিনি কৃষ্ণভাবনাময় কৃষ্ণভক্ত।

অহিংসা হচ্ছে অপরের অনিষ্ট সাধন না করা বা অপরকে বিভ্রান্ত না করা। রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক, লোকহিতৈষী ব্যক্তিরা যে সমস্ত জড় কর্মের প্রতিশ্রুতি দেয়, তার ফলে কারওই তেমন কোন মঙ্গল সাধিত হয় না। কারণ, রাজনীতিবিদ বা লোকহিতৈষী ব্যক্তিদের দিব্য দৃষ্টি নেই। মানব-সমাজের যথার্থ মঙ্গল কিভাবে সাধিত হতে পারে, সেই সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই। *অহিংসা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে মানব-দেহের যথার্থ সদ্ব্যবহার করার শিক্ষা দেওয়া। মানব-দেহের যথার্থ উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞান উপলব্ধি করা। সুতরাং যে সংস্থা বা যে আন্দোলন এই উদ্দেশ্যে মানুষকে পরিচালিত করে না, তা মনুষ্য-শরীরের প্রতি হিংসাত্মক আচরণ করে। যে প্রচেষ্টা সমগ্র জনসাধারণকে ভাবী দিব্য আনন্দ প্রাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে চলে, তাই হচ্ছে যথার্থ *অহিংসা*।

সমতা বলতে বোঝায় আসক্তি ও বিরক্তিতে নিস্পৃহ। অত্যধিক আসক্তি ও অত্যধিক বিরক্তি ভাল নয়। আসক্তি অথবা বিরক্তি রহিত হয়ে জড় জগৎকে গ্রহণ করা উচিত। কৃষ্ণভক্তি সাধনে যা অনুকূল তা গ্রহণ করা উচিত, যা প্রতিকূল তা বর্জন করা উচিত। তাকেই বলা হয় *সমতা*। কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা-আনুকূল্য ব্যতীত কোন কিছুই গ্রহণ করেন না বা বর্জন করেন না।

তুষ্টি বলতে বোঝায় অনর্থক কর্মের মাধ্যমে অধিক থেকে অধিকতর জড় সম্পত্তি সঞ্চয় না করা। ভগবানের কৃপার প্রভাবে যা পাওয়া যায় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তাকেই বলা হয় *তুষ্টি*। *তপঃ* কথাটির অর্থ হচ্ছে তপস্যা বা কৃচ্ছ্রসাধন। এই সম্বন্ধে *বেদে* নানা রকম নিয়ম-নিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—যেমন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান করা। কখনও কখনও খুব সকালে ঘুম থেকে উঠতে খুব কষ্ট হয়, কিন্তু স্বেচ্ছাকৃতভাবে এই ধরনের কষ্ট স্বীকার করাকে বলা হয় তপস্যা। তেমনই, মাসের কতগুলি নির্দিষ্ট দিনে উপবাস করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের উপবাস করতে আমাদের ইচ্ছা নাও হতে পারে, কিন্তু আমরা যদি কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তির পথে উন্নতি সাধন করতে চাই, তা হলে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে এই ধরনের দৈহিক ক্লেশ স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তা বলে বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ না করে নিজের ইচ্ছামতো অনাবশ্যক উপবাস করা উচিত নয়। কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপবাস করা উচিত নয়। *ভগবদ্গীতাতে* এই ধরনের উপবাস করাকে তামসিক উপবাস বলা হয়েছে এবং তম অথবা রজোগুণে কৃতকর্ম আমাদের পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হয় না। সত্ত্বগুণে কৃত কর্মই কেবল পারমার্থিক উন্নতি সাধন করে। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে উপবাস করার ফলে পারমার্থিক জ্ঞান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

দান সম্বন্ধে বলা হয়েছে, উপার্জিত অর্থের অর্ধাংশ কোন সৎকর্মে দান করা উচিত। সৎকর্ম বলতে কি বোঝায়? কৃষ্ণভাবনার উদ্দেশ্যে সাধিত কর্মই হচ্ছে সৎকর্ম। তা কেবল সৎকর্মই নয়, তা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কর্ম। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সৎ, তাই তাঁর উদ্দেশ্যে যে কর্ম সাধিত হয় তাও সৎ। তাই, যে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছেন, তাঁকেই দান করা উচিত। বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ব্রাহ্মণকে দান করা উচিত। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে যথাযথভাবে সাধিত না হলেও, সেই রীতি আজও চলে আসছে। তবুও নির্দেশ হচ্ছে যে, ব্রাহ্মণকে দান করা। কেন? কারণ ব্রাহ্মণেরা সর্বদা পারমার্থিক জ্ঞানের উচ্চতর অনুশীলনে মগ্ন থাকেন। ব্রাহ্মণের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করা। *ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ*—যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ। এভাবেই দান ব্রাহ্মণদের নিবেদন করা হয়, কারণ উচ্চতর পারমার্থিক প্রয়াসে নিবিষ্ট থাকার ফলে তাঁরা জীবিকা অর্জনের কোন অবসর পান না। বৈদিক শাস্ত্রে আরও বলা হয়েছে, সন্ন্যাসীদেরও দান করা উচিত। সন্ন্যাসীরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেন অর্থ উপার্জন করার জন্য নয়—প্রচারের জন্য। এভাবেই তাঁরা ঘরে ঘরে গিয়ে গৃহস্থদের অজ্ঞানতার সুষুপ্তি থেকে জেগে ওঠার জন্য আবেদন করেন। কারণ, গৃহস্থেরা গৃহসংক্রান্ত কর্মে এতই মগ্ন হয়ে পড়ে যে, তারা তাদের জীবনের আসল উদ্দেশ—কৃষ্ণভাবনা জাগরিত করার কথা সম্পূর্ণভাবে ভুলে যায়। তাই, সন্ন্যাসীদের কর্তব্য হচ্ছে গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে তাদের কৃষ্ণভাবনায় অনুপ্রাণিত করা। *বেদে* বলা হয়েছে, জেগে ওঠ এবং মানব-জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য লাভ কর। সন্ন্যাসীরা এই জ্ঞান ও পন্থা প্রদান করেন। তাই দান সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ ও সেই ধরনের উদ্দেশ্যেই প্রদান করা উচিত, নিজের খেয়ালখুশি মতো দান করা উচিত নয়।

যশ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতানুসারে হওয়া উচিত। মহাপ্রভু বলেছেন যে, একজন মানুষ তখনই যশ লাভের অধিকারী হন, যখন তিনি ভগবানের মহান ভক্তরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত যশ। যদি জানা যায় যে, কোন মানুষ কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি লাভ করেছেন, তখন তিনি প্রকৃত যশস্বী হন। আর এই রকম যশ যার নেই, সে কখনই যশস্বী নয়।

এই গুণগুলি ব্রহ্মাণ্ডে মানব ও দেবতা সকল সমাজেই বর্তমান। অন্যান্য গ্রহলোকেও বিভিন্ন আকৃতিসম্পন্ন মনুষ্যজাতি রয়েছে এবং এই গুণগুলি সেখানেও বর্তমান। এখন, কেউ যদি কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করতে চান, কৃষ্ণ তখন তাঁর জন্য এই সমস্ত গুণগুলি সৃষ্টি করেন, কিন্তু সেই ব্যক্তি নিজে সেগুলিকে

অন্তরে বিকাশ সাধন করেন। যিনি পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিরন্তর নিযুক্ত থাকেন, তিনি ভগবানের ব্যবস্থাপনায় সমস্ত সদ্গুণের বিকাশ সাধন করেন।

ভাল বা মন্দ, যাই আমরা দেখি না কেন, তার মূল উৎস হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এই জড় জগতে কোন কিছুই প্রকাশিত হতে পারে না, যা শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নেই। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। যদিও আমরা জানি যে, প্রতিটি বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত, কিন্তু আমাদের এটি উপলব্ধি করা উচিত যে, সব কিছু সৃষ্টির মূলেই আছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ৬

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা ।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

মহর্ষয়ঃ—মহর্ষিগণ; **সপ্ত**—সাত; **পূর্বে**—পূর্বে; **চত্বারঃ**—সনকাদি চারজন; **মনবঃ**—চতুর্দশ মনু; **তথা**—ও; **মদ্ভাবাঃ**—আমার থেকে জন্মগ্রহণ করেছে; **মানসাঃ**—মন থেকে; **জাতাঃ**—উৎপন্ন; **যেষাম্**—যাঁদের; **লোকে**—এই জগতে; **ইমাঃ**—এই সমস্ত; **প্রজাঃ**—প্রজাসমূহ।

গীতার গান

মরীচ্যাদি সপ্তঋষি চারি সনকাদি ।
চতুর্দশ মনু পূর্ব হিরণ্যগর্ভাদি ॥
তাদের এ প্রজা সব যত লোকে আছে ।
আমা হতে জন্ম সব মানসাদি পাছে ॥

অনুবাদ

সপ্ত মহর্ষি, তাঁদের পূর্বজাত সনকাদি চার কুমার ও চতুর্দশ মনু, সকলেই আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়ে আমা হতে জন্মগ্রহণ করেছে এবং এই জগতের স্থাবর-জঙ্গম আদি সমস্ত প্রজা তাঁরাই সৃষ্টি করেছেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসীদের সংক্ষিপ্ত বংশানুক্রমিক বিবরণ দান করেছেন। সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বর ভগবানের হিরণ্যগর্ভ নামক শক্তি

থেকে প্রথম জীব ব্রহ্মার সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মা থেকে সপ্ত ঋষি এবং তাঁদের আগে চারজন মহর্ষি—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার এবং তারপর চতুর্দশ মনুর সৃষ্টি হয়। এই পঁচিশজন মহর্ষিরা হচ্ছেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের জীবসমূহের পিতৃকুল। এই জগতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এবং প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে অগণিত গ্রহলোক রয়েছে এবং প্রতিটি গ্রহলোক নানা রকম প্রাণী দ্বারা অধ্যুষিত। তারা সকলেই এই পঁচিশজন পিতৃপুরুষের দ্বারা জাত। ব্রহ্মা দেবতাদের সময়ের হিসাব অনুসারে এক সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করার পর জানতে পারেন কিভাবে জগৎ সৃষ্টি করতে হবে। তারপর ব্রহ্মা থেকে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমারের আবির্ভাব হয়। তার পরে রুদ্র ও সপ্ত ঋষি এবং এভাবেই সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শক্তি থেকে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মাকে বলা হয় পিতামহ এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন প্রপিতামহ। কারণ, তিনি পিতামহ ব্রহ্মারও পিতা। *ভগবদ্গীতার* একাদশ অধ্যায়ে (১১/৩৯) এই বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৭

এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
সোঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

এতাম্—এই সমস্ত; **বিভূতিম্**—বিভূতি; **যোগম্**—যোগ; **চ**—ও; **মম**—আমার; **যঃ**—যিনি; **বেত্তি**—জানেন; **তত্ত্বতঃ**—যথার্থরূপে; **সঃ**—তিনি; **অবিকল্পেন**—অবিচলিত; **যোগেন**—ভক্তিযোগ দ্বারা; **যুজ্যতে**—যুক্ত হন; **ন**—না; **অত্র**—এই বিষয়ে; **সংশয়ঃ**—সন্দেহ।

গীতার গান

আমার স্বরূপজ্ঞান শক্তি বা বিভূতি ।
সমস্ত ক্রিয়াদি যোগ শ্রেষ্ঠ সে ভকতি ॥
এই সব তত্ত্ব যারা নিশ্চিত জানিল ।
ভক্তিযোগ সাধিবারে যোগ্য সে হইল ॥

অনুবাদ

যিনি আমার এই বিভূতি ও যোগ যথার্থরূপে জানেন, তিনি অবিচলিতভাবে ভক্তিযোগে যুক্ত হন। সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

পারমার্থিক সিদ্ধির সর্বোচ্চ সীমা হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানা। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভগবানের অনন্ত বিভূতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবগত না হচ্ছি, ততক্ষণ আমরা ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হতে পারি না। সাধারণত সকলেই জানে যে, ভগবান মহান। কিন্তু ভগবান কেন মহান, তা তারা বিশদভাবে অবগত নয়। এখানে তার বিশদ বর্ণনা করা হচ্ছে। আমরা যখন ভগবানের মহত্ত্ব সম্বন্ধে যথাযথভাবে জানতে পারি, তখন আমরা স্বাভাবিকভাবে তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করে ভক্তিযোগে তাঁর সেবায় প্রবৃত্ত হই। যখন আমরা বাস্তবিকপক্ষে ভগবানের বিভূতি সম্বন্ধে অবগত হই, তখন ভগবানের চরণে আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া বিকল্প কোন উপায় থাকে না। এই তত্ত্বজ্ঞান *শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা* আদি শাস্ত্রগ্রন্থের বর্ণনার মাধ্যমে জানতে পারা যায়।

এই ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালনায় বহু দেব-দেবীরা বিভিন্ন গ্রহলোকে নিযুক্ত আছেন এবং তাঁদের প্রধান হচ্ছেন ব্রহ্মা, শিব, চতুঃস্বন ও প্রজাপতিগণ। ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসীরা বহু প্রজাপতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং এই সমস্ত প্রজাপতিরা সকলেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত প্রজাপতিদের আদিপুরুষ।

এই সমস্ত ভগবানের অনন্ত বৈভবের কয়েকটির প্রকাশ। এই সম্বন্ধে আমাদের চিত্তে যখন দৃঢ় বিশ্বাসের উদয় হয়, তখন আমরা গভীর শ্রদ্ধা সহকারে ও নিঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করতে পারি এবং তখন আমরা তাঁর সেবায় প্রবৃত্ত হই। প্রেমভক্তি সহকারে ভগবানের সেবার আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করার জন্য ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় এই জ্ঞান অত্যন্ত আবশ্যক। শ্রীকৃষ্ণ যে কত বড় মহান তা পূর্ণরূপে জানার জন্য আমাদের কখনও অবহেলা করা উচিত নয়, কেন না শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়ার ফলে আমরা ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে তাঁর সেবায় নিযুক্ত হতে পারি।

শ্লোক ৮

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥

অহম্—আমি; **সর্বস্য**—সকলের; **প্রভবঃ**—উৎপত্তির হেতু; **মত্তঃ**—আমার থেকে; **সর্বম্**—সব কিছু; **প্রবর্ততে**—প্রবর্তিত হয়; **ইতি**—এভাবে; **মত্বা**—জেনে; **ভজন্তে**—ভজন করেন; **মাম্**—আমাকে; **বুধাঃ**—পণ্ডিতগণ; **ভাবসমন্বিতাঃ**—ভাবযুক্ত হয়ে।

গীতার গান

প্রাকৃতাপ্রাকৃত সব আমা হতে হয় ।
বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানি আমাকে ভজয় ॥
আমার যে ভাব তাহা ভক্তির লক্ষণ ।
অপণ্ডিত নাহি জানে জানে পণ্ডিতগণ ॥

অনুবাদ

আমি জড় ও চেতন জগতের সব কিছুর উৎস। সব কিছু আমার থেকেই প্রবর্তিত হয়। সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে পণ্ডিতগণ শুদ্ধ ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন।

তাৎপর্য

যে সমস্ত পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে যথার্থ বৈদিক জ্ঞান লাভ করেছেন এবং সেই শিক্ষা কিভাবে কাজে লাগাতে হয় তা বুঝেছেন, তাঁরা জানেন যে, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় জগতের সব কিছু শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত এবং সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার ফলে তাঁরা অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন। তাঁরা কখনই অপসিদ্ধান্ত বা মূর্খ মানুষের অপপ্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হন না। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র এক বাক্যে স্বীকার করে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রহ্মা, শিব আদি সমস্ত দেব-দেবীর উৎস। *অথর্ব বেদে* (*গোপালতাপনী উপনিষদ* ১/২৪) বলা হয়েছে, *যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ*—"ব্রহ্মা, যিনি পূর্বকালে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করেন, তিনি সেই জ্ঞান সৃষ্টির আদিতে শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে প্রাপ্ত হন।" তারপর পুনরায় *নারায়ণ উপনিষদে* (১) বলা হয়েছে, *"অথ পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি*—"তারপর পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ প্রাণী সৃষ্টির ইচ্ছা করেন।" *উপনিষদে* আরও বলা হয়েছে, *নারায়ণাদ্ ব্রহ্মা জায়তে, নারায়ণাদ্ প্রজাপতিঃ প্রজায়তে, নারায়ণাদ্ ইন্দ্রো জায়তে, নারায়ণাদ্ অষ্টৌ বসবো জায়ন্তে, নারায়ণাদ্ একাদশ রুদ্রো জায়ন্তে, নারায়ণাদ্ দ্বাদশাদিত্যাঃ*—"নারায়ণ হতে ব্রহ্মার জন্ম হয়, নারায়ণ হতে, প্রজাপতিদের জন্ম হয়, নারায়ণ হতে ইন্দ্রের জন্ম হয়, নারায়ণ হতে অষ্টবসুর জন্ম হয়, নারায়ণ থেকে একাদশ রুদ্রের জন্ম হয় এবং নারায়ণ থেকে দ্বাদশ আদিত্যের জন্ম হয়।" এই নারায়ণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ-প্রকাশ।

সেই একই *বেদে* আরও বলা হয়েছে, *ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রঃ*—"দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান"। (*নারায়ণ উপনিষদ* ৪) তারপর বলা হয়েছে, *একো বৈ নারায়ণ আসীন্ ন ব্রহ্মা ন ঈশানো নাপো নাগ্নি-সমৌ নেমে দ্যাবাপৃথিবী*

ন নক্ষত্রাণি ন সূর্যঃ—"সৃষ্টির আদিতে কেবল পরম পুরুষ নারায়ণ ছিলেন। ব্রহ্মা ছিল না, শিব ছিল না, অগ্নি ছিল না, চন্দ্র ছিল না, আকাশে নক্ষত্র ছিল না এবং সূর্য ছিল না।" (*মহা উপনিষদ* ১) *মহা উপনিষদে* আরও বলা হয়েছে যে, শিবের জন্ম হয় পরমেশ্বর ভগবানের ভ্রূযুগলের মধ্য থেকে। এভাবেই *বেদে* বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মা ও শিবের যিনি সৃষ্টিকর্তা, সেই পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন সকলের আরাধ্য।

মোক্ষধর্মে শ্রীকৃষ্ণও বলেছেন—

প্রজাপতিং চ রুদ্রং চাপ্যহমেব সৃজামি বৈ।
তৌ হি মাং ন বিজানীতো মম মায়াবিমোহিতৌ ॥

"প্রজাপতিগণ, রুদ্র ও অন্য সকলকে আমি সৃষ্টি করেছি, যদিও তাঁরা তা জানেন না। কারণ, তাঁরা আমার মায়াশক্তির দ্বারা বিমোহিত।" *বরাহ পুরাণেও* বলা হয়েছে—

নারায়ণঃ পরো দেবস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্মুখঃ।
তস্মাদ্ রুদ্রোঽভবদ্ দেবঃ স চ সর্বজ্ঞতাং গতঃ ॥

"নারায়ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান আর তাঁর থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়, তাঁর থেকে শিবের জন্ম হয়।"

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির উৎস এবং তাঁকে বলা হয় সব কিছুর নিমিত্ত কারণ। তিনি বলেছেন, "যেহেতু সব কিছু আমার থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তাই আমিই সব কিছুর আদি উৎস। সব কিছুই আমার অধীন। আমার উপরে কেউ নেই।" শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া পরম নিয়ন্তা আর কেউ নেই। সদ্‌গুরু ও বৈদিক শাস্ত্র থেকে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যিনি এই জ্ঞান লাভ করেন, তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি কৃষ্ণভাবনায় নিয়োজিত করেন এবং তিনিই হচ্ছেন যথার্থ জ্ঞানী। তাঁর তুলনায় অন্য সকলে যারা কৃষ্ণ-তত্ত্বজ্ঞান যথাযথভাবে লাভ করেনি, তারা নিতান্তই মূর্খ। মূর্খেরাই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। মূর্খদের প্রলাপের দ্বারা কৃষ্ণভক্তের কখনই বিচলিত হওয়া উচিত নয়; *ভগবদ্‌গীতার* সমস্ত অপ্রামাণিক ভাষ্য ও ব্যাখ্যায় কর্ণপাত না করে দৃঢ় প্রত্যয় ও গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তির অনুশীলন করা উচিত।

শ্লোক ৯

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯ ॥

মচ্চিত্তাঃ—যাঁদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে আমাতে সমর্পিত; **মদ্‌গতপ্রাণাঃ**—তাঁদের প্রাণ আমাতে সমর্পিত; **বোধয়ন্তঃ**—বুঝিয়ে; **পরস্পরম্**—পরস্পরকে; **কথয়ন্তঃ**—আলোচনা করে; **চ**—ও; **মাম্**—আমার সম্বন্ধেই; **নিত্যম্**—সর্বদা; **তুষ্যন্তি**—তুষ্ট হন; **চ**—ও; **রমন্তি**—অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করেন; **চ**—ও।

গীতার গান

আমার অনন্য ভক্ত মচ্চিত্ত মৎপ্রাণ ।
পরস্পর বুঝে পড়ে আনন্দে মগন ॥
আমার সে কথা নিত্য বলিয়া শুনিয়া ।
তোষণ রমণ করে ভক্তিতে মজিয়া ॥

অনুবাদ

যাঁদের চিত্ত ও প্রাণ সম্পূর্ণরূপে আমাতে সমর্পিত, তাঁরা পরস্পরের মধ্যে আমার কথা সর্বদাই আলোচনা করে এবং আমার সম্বন্ধে পরস্পরকে বুঝিয়ে পরম সন্তোষ ও অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করেন।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্ত, যাঁদের বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে বলা হয়েছে, তাঁরা সর্বদাই পূর্ণরূপে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমভক্তিতে যুক্ত থাকেন। তাঁদের মন কখনই শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ থেকে বিক্ষিপ্ত হয় না। তাঁরা সর্বদাই অপ্রাকৃত বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ এই শ্লোকে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। ভগবদ্ভক্ত দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানের লীলাসমূহ কীর্তনে মগ্ন থাকেন। তাঁদের মনপ্রাণ সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে নিমগ্ন থাকে এবং অন্যান্য ভক্তের সঙ্গে তিনি ভগবানের কথা আলোচনা করে গভীর আনন্দ উপভোগ করেন।

ভগবদ্ভক্তির প্রাথমিক স্তরে ভক্ত ভগবানের সেবার মাধ্যমেই অপ্রাকৃত আনন্দ উপভোগ করেন এবং পরিপক্ক অবস্থায় তাঁরা ভগবৎ-প্রেমে প্রকৃতই মগ্ন থাকেন। একবার অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত হলে, তখন তাঁরা পূর্ণতম রস আস্বাদন করতে পারেন, যা ভগবান তাঁর ধামে প্রদর্শন করে থাকেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবদ্ভক্তিকে জীবের হৃদয়ে বীজ বপন করার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্ন গ্রহে অসংখ্য জীব ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে কোন ভাগ্যবান জীব শুদ্ধ ভক্তের সংস্পর্শে আসার ফলে ভগবদ্ভক্তির নিগূঢ় রহস্যের কথা অবগত

হতে সক্ষম হন। এই ভগবদ্ভক্তি ঠিক একটি বীজের মতো এবং তা যদি জীবের হৃদয়ে বপন করা হয় এবং **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—এই মহামন্ত্র শ্রবণ ও কীর্তনরূপ জল সিঞ্চন করা হয়, তা হলে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। ঠিক যেমন, নিয়মিত জল সিঞ্চনের ফলে একটি গাছের বীজ অঙ্কুরিত হয়। এই অপ্রাকৃত ভক্তিলতা ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হয়ে জড় ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করে চিৎ-আকাশের ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবেশ করে। চিৎ-আকাশেও এই লতা বর্ধিত হতে থাকে এবং অবশেষে সর্বোচ্চ আলয় শ্রীকৃষ্ণের পরম গ্রহলোক গোলোক বৃন্দাবনে প্রবেশ করে। পরিশেষে, এই লতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সেখানে বিশ্রাম লাভ করে। একটি লতা যেমন ক্রমশ ফল-ফুল উৎপাদন করে, সেই ভক্তিলতাও সেখানে ফল উৎপাদন করতে থাকে এবং সেই সঙ্গে শ্রবণ ও কীর্তনরূপ জল সিঞ্চনের পন্থা চলতে থাকে। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্যলীলা ঊনবিংশতি* অধ্যায়ে) এই ভক্তিলতার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, এই ভক্তিলতা যখন সম্পূর্ণভাবে ভগবানের চরণ-কমলে আশ্রয় গ্রহণ করে, ভক্ত তখন ভগবৎ-প্রেমে নিমগ্ন হন। তখন তিনি এক মুহূর্তের জন্যও ভগবানের সংস্পর্শ ব্যতীত থাকতে পারেন না—ঠিক যেমন একটা মাছ জল ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। এই অবস্থায়, পরমেশ্বর ভগবানের সংস্পর্শে আসার ফলে ভক্ত সমস্ত দিব্যগুণে গুণান্বিত হন।

শ্রীমদ্ভাগবতও ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এই রকম দিব্য সম্পর্কের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। তাই, *শ্রীমদ্ভাগবত* ভক্তদের অতি প্রিয় এবং সেই কথা *ভাগবতেই* (১২/১৩/১৮) বর্ণিত আছে। *শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ম্।* এই বর্ণনায় কোন রকম জড়-জাগতিক কর্মের, ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অথবা মুক্তির উল্লেখ নেই। *শ্রীমদ্ভাগবতই* হচ্ছে একমাত্র গ্রন্থ, যেখানে ভগবান ও তাঁর ভক্তের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে। এভাবেই কৃষ্ণভাবনাময় শুদ্ধ ভক্তেরা অপ্রাকৃত সাহিত্য *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করার মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ করেন, ঠিক যেমন, কোন যুবক-যুবতী পরস্পরের সঙ্গ লাভের ফলে আনন্দ উপভোগ করে থাকে।

শ্লোক ১০

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ ॥

তেষাম্—তাঁদের; **সততযুক্তানাম্**—নিত্যযুক্ত; **ভজতাম্**—ভক্তিযুক্ত সেবাপরায়ণ হয়ে; **প্রীতিপূর্বকম্**—প্রীতিপূর্বক; **দদামি**—দান করি; **বুদ্ধিযোগম্**—বুদ্ধিযোগ; **তম্**—সেই; **যেন**—যার দ্বারা; **মাম্**—আমাকে; **উপযান্তি**—প্রাপ্ত হন; **তে**—তাঁরা।

গীতার গান

সেই নিত্যযুক্ত যারা ভজনে কুশল ।
প্রীতির সহিত তারা ধরে ভক্তিবল ॥
আমি দিই ভক্তিযোগ তাদের অন্তরে ।
আমার পরম ধাম তারা লাভ করে ॥

অনুবাদ

যাঁরা ভক্তিযোগ দ্বারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে নিত্যযুক্ত, আমি তাঁদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসতে পারেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *বুদ্ধিযোগম্* কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা আমরা স্মরণ করতে পারি। সেখানে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, তিনি তাঁকে *বুদ্ধিযোগ* সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন। এখানে সেই *বুদ্ধিযোগের* ব্যাখ্যা করা হয়েছে। *বুদ্ধিযোগের* অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম। সেটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তি। *বুদ্ধির* অর্থ হচ্ছে বোধশক্তি এবং *যোগের* অর্থ হচ্ছে অতীন্দ্রিয় কার্যকলাপ অথবা যোগারূঢ়। কেউ যখন তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবৎ-ধামে ফিরে যেতে চান এবং সেই উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভাবনাময় ভগবৎ-সেবায় সম্যকভাবে নিযুক্ত হন, তখন তাঁর সেই কার্যকলাপকে বলা হয় *বুদ্ধিযোগ*। পক্ষান্তরে, *বুদ্ধিযোগ* হচ্ছে সেই পন্থা, যার ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। সাধনার পরম লক্ষ্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। সাধারণ মানুষ সেই কথা জানে না। তাই, ভগবদ্ভক্ত ও সদ্‌গুরুর সঙ্গ অতি আবশ্যক। আমাদের সকলেরই জানা উচিত যে, পরম লক্ষ্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং সেই লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত হলে, ধীরস্থির গতিতে সেই লক্ষ্যের দিকে ধীরে ধীরে অথচ ক্রমোন্নতির পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়া যায় এবং অবশেষে সেই পরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়।

কেউ যখন মানব-জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া সত্ত্বেও কর্মফল ভোগের প্রতি আসক্ত হয়ে থাকে, তখন সেই স্তরে সাধিত কর্মকে বলা হয় কর্মযোগ। কেউ

যখন জানতে পারে যে, পরম লক্ষ্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণকে জানবার জন্য মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাকে বলা হয় জ্ঞানযোগ এবং কেউ যখন পরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, তখন তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ বা *বুদ্ধিযোগ* এবং সেটিই হচ্ছে যোগের পরম পূর্ণতা। যোগের এই পূর্ণতাই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধির স্তর।

কেউ সদ্গুরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হয়ে কোন পারমার্থিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন, কিন্তু পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য যথার্থ বুদ্ধি যদি তাঁর না থাকে, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ অন্তস্তল থেকে তাঁকে যথাযথভাবে নির্দেশ প্রদান করেন, যার ফলে তিনি অনায়াসে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই কৃপা লাভ করার একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে যে, কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে প্রীতি ও ভক্তি সহকারে সর্বক্ষণ সর্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করা। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁকে কোন একটি কর্ম করতে হবে এবং সেই কর্ম প্রীতির সঙ্গে সাধন করতে হবে। ভক্ত যদি আত্ম-উপলব্ধির বিকাশ সাধনে যথার্থ বুদ্ধিমান না হন, কিন্তু ভক্তিযোগ সাধনে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তা হলে ভগবান তাঁকে সুযোগ প্রদান করেন, যার ফলে তিনি ক্রমশ উন্নতি সাধন করেন এবং অবশেষে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারেন।

শ্লোক ১১

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

তেষাম্—তাঁদের; **এব**—অবশ্যই; **অনুকম্পার্থম্**—অনুগ্রহ করার জন্য; **অহম্**—আমি; **অজ্ঞানজম্**—অজ্ঞান-জনিত; **তমঃ**—অন্ধকার; **নাশয়ামি**—নাশ করি; **আত্মভাবস্থঃ**—হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে; **জ্ঞান**—জ্ঞানের; **দীপেন**—প্রদীপের দ্বারা; **ভাস্বতা**—উজ্জ্বল।

গীতার গান

সেই সে অনন্য ভক্ত নহেত অজ্ঞানী ।
আমি তার হৃদয়েতে জ্ঞানদীপ আনি ॥
অন্ধকার তমোনাশ করি সে অশনি ।
জ্ঞানদীপ জ্বালাইয়া করি তারে জ্ঞানী ॥

অনুবাদ

তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য আমি তাঁদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে, উজ্জ্বল জ্ঞান-প্রদীপের দ্বারা অজ্ঞান-জনিত অন্ধকার নাশ করি।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বারাণসীতে **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে** কীর্তন করে প্রচার করছিলেন, তখন হাজার হাজার লোক তাঁর অনুগামী হয়েছিল। বারাণসীর অত্যন্ত প্রভাবশালী পণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতী তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভাবুক বলে উপহাস করেছিলেন। দার্শনিক পণ্ডিতেরা কখনও কখনও ভগবদ্ভক্তের সমালোচনা করে, কারণ তারা মনে করে যে, অধিকাংশ ভক্তেরাই অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং তত্ত্বদর্শনে অনভিজ্ঞ ভাবুক। প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরা ভক্তিতত্ত্বের মাহাত্ম্য কীর্তন করে ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে গেছেন। কিন্তু এমন কি কোন ভক্ত যদি এই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থ অথবা সদ্গুরুর সাহায্য গ্রহণ না-ও করেন, কিন্তু তিনি যদি ঐকান্তিক ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করেন, তা হলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অন্তর থেকে সাহায্য করেন। সুতরাং, কৃষ্ণভাবনায় নিযুক্ত নিষ্ঠাবান ভক্ত কখনই তত্ত্বজ্ঞানবিহীন নন। তাঁর একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা।

আধুনিক যুগের দার্শনিকেরা মনে করেন যে, পার্থক্য বিচার না করে কেউ শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করতে পারে না। তার উত্তরে পরমেশ্বর ভগবান এখানে বলেছেন যে, যাঁরা শুদ্ধ ভক্তি সহকারে তাঁর সেবা করেন, তাঁরা যদি অশিক্ষিত এবং পর্যাপ্ত বৈদিক জ্ঞানবিহীনও হন, তবুও তিনি তাঁদের হৃদয়ে দিব্য জ্ঞানের দীপ জ্বালিয়ে তাঁদের সাহায্য করেন, যা এই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে।

ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে, মূলত মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞানের মাধ্যমে কখনই পরম সত্য বা পরমতত্ত্ব পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারা যায় না, কেন না পরম সত্য এতই বৃহৎ যে, কেবল কোন রকম মানসিক প্রচেষ্টার দ্বারা তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করা অথবা তাঁকে লাভ করা সম্ভব নয়। মানুষ লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা ও অনুমান করে যেতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তার চিত্তে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তি না জাগছে, পরম সত্যের প্রতি প্রীতির উদয় না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোন মতেই শ্রীকৃষ্ণকে বা পরম সত্যকে জানতে পারে না। ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করার মাধ্যমেই পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণকে

পরিতুষ্ট করা যায় এবং তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে নিজেকে প্রকাশিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই তাঁর শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে বিরাজমান এবং সূর্যসম শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যের ফলে অজ্ঞানতার সমস্ত অন্ধকার তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়। শুদ্ধ ভক্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এটি একটি বিশেষ কৃপা।

লক্ষ লক্ষ জন্ম-জন্মান্তরে বৈষয়িক সংসর্গের কলুষতার ফলে জড়বাদের ধূলির দ্বারা আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কিন্তু আমরা যখন ভক্তিযোগে ভগবৎ-সেবায় যুক্ত হয়ে নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে থাকি, তখন অতি শীঘ্রই হৃদয়ের সমস্ত আবর্জনা বিদূরিত হয় এবং আমরা শুদ্ধ জ্ঞানের পর্যায়ে উন্নতি লাভ করি। পরম লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণকে কেবলমাত্র এভাবেই কীর্তন ও সেবার মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়া যায়, মনোধর্ম-প্রসূত কল্পনা অথবা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে নয়। জীবন ধারণের আবশ্যকতাগুলির জন্য শুদ্ধ ভক্ত কোন রকম উদ্বেগগ্রস্ত হন না। তাঁর উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই, কারণ তাঁর হৃদয় থেকে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয়ে যাওয়ার ফলে পরমেশ্বর ভগবান আপনা থেকেই তার সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়ে দেন, কারণ ভক্তের ভক্তিযুক্ত সেবায় ভগবান অত্যন্ত প্রীত হন। এটিই হচ্ছে *ভগবদ্গীতার* শিক্ষার সারমর্ম। *ভগবদ্গীতা* অধ্যয়ন করার মাধ্যমে আমরা সর্বতোভাবে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করে শুদ্ধ ভক্তিযোগে তাঁর সেবায় নিযুক্ত হতে পারি। ভগবান যখন আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন আমরা সব রকম জাগতিক প্রচেষ্টা থেকে মুক্ত হই।

শ্লোক ১২-১৩

অর্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২ ॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা ।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; **পরম্**—পরম; **ব্রহ্ম**—সত্য; **পরম্**—পরম; **ধাম**—ধাম; **পবিত্রম্**—পবিত্র; **পরমম্**—পরম; **ভবান্**—তুমি; **পুরুষম্**—পুরুষ; **শাশ্বতম্**—সনাতন; **দিব্যম্**—দিব্য; **আদিদেবম্**—আদিদেব; **অজম্**—জন্মরহিত; **বিভুম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **আহুঃ**—বলেন; **ত্বাম্**—তোমাকে; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **সর্বে**—সমস্ত;

দেবর্ষিঃ—দেবর্ষি; **নারদঃ**—নারদ; **তথা**—ও; **অসিতঃ**—অসিত; **দেবলঃ**—দেবল; **ব্যাসঃ**—ব্যাসদেব; **স্বয়ম্**—তুমি নিজে; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **ব্রবীষি**—বলছ; **মে**—আমাকে।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

পরম ব্রহ্ম পরম ধাম পবিত্র পরম ।
তুমি কৃষ্ণ হও নিত্য এই মোর জ্ঞান ॥
শাশ্বত পুরুষ তুমি অজ, আদি বিভু ।
অপ্রাকৃত দেহ তব সকলের প্রভু ॥
দেবর্ষি নারদ আর যত ঋষি আছে ।
অসিত দেবল ব্যাস সেই গাহিয়াছে ॥
তোমার এই শ্রীমূর্তি ওহে ভগবান ।
না জানে দেবতা কিংবা যারা দানবান ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র ও পরম পুরুষ। তুমি নিত্য, দিব্য, আদি দেব, অজ ও বিভু। দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস আদি ঋষিরা তোমাকে সেভাবেই বর্ণনা করেছেন এবং তুমি নিজেও এখন আমাকে তা বলছ।

তাৎপর্য

এই দুটি শ্লোকের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান আধুনিক যুগের তথাকথিত দার্শনিকদের তাঁর সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হওয়ার সুযোগ দান করেছেন। কারণ এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, স্বতন্ত্র জীবাত্মা থেকে পরমতত্ত্ব ভিন্ন। এই অধ্যায়ে *ভগবদ্গীতার* সারমূলক চারটি মুখ্য শ্লোক শোনার পর অর্জুন সন্দেহ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে স্বীকার করেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন, "তুমি হচ্ছ *পরং ব্রহ্ম* অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম ভগবান।" পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন যে, তিনি সকলের ও সব কিছুর আদি। প্রতিটি মানুষ, এমন কি স্বর্গের দেব-দেবীরাও তাঁর

উপর নির্ভরশীল। অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে মানুষ ও দেবতারা মনে করেন যে, তাঁরা পূর্ণ এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতো সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। ভক্তিযোগ সাধন করার ফলে এই অজ্ঞানতার অন্ধকার সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হয়। সেই কথা পূর্ববর্তী শ্লোকে ভগবান নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন। এখন, ভগবানের কৃপার ফলে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পরম সত্য বলে স্বীকার করেছেন এবং সেই কথা *বেদেও* স্বীকার করা হয়েছে। এমন নয় যে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে অর্জুন তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বা পরমতত্ত্ব বলে তোষামোদ করেছেন। এই শ্লোক দুটিতে অর্জুন যা বলেছেন, তা সবই বৈদিক শাস্ত্রসম্মত। *বেদে* বলা হয়েছে যে, ভক্তির মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। এ ছাড়া আর কোনভাবেই তাঁকে জানতে পারা সম্ভব নয়। এখানে অর্জুন যা বলেছেন, তাঁর প্রতিটি কথা *বেদের* নির্দেশ অনুসারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

কেন উপনিষদে বলা হয়েছে যে, পরমব্রহ্ম হচ্ছেন সব কিছুর আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণ এখানে বর্ণনা করেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন সব কিছুরই পরম আশ্রয়। *মুণ্ডক উপনিষদে* প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সব কিছুর আশ্রয়, নিরন্তর তাঁর চিন্তা করার মাধ্যমেই কেবল তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই নিরন্তর চিন্তাকে বলা হয় *স্মরণম্*, তা ভগবদ্ভক্তির একটি অঙ্গ। কৃষ্ণভক্তির ফলেই কেবল আমরা আমাদের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হয়ে এই জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি।

বেদে পরমেশ্বর ভগবানকে পরম পবিত্র বলে স্বীকার করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকে যিনি পরম পবিত্র বলে উপলব্ধি করতে পারেন, তিনি সব রকম পাপকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হন। পরমেশ্বর ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ না করলে পাপকর্ম থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন পরম পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন, তা বৈদিক নির্দেশেরই পুনরাবৃত্তি। এই সত্য সমস্ত মুনি-ঋষিরাও স্বীকার করেছেন, যাঁদের মধ্যে নারদ মুনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ।

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তাঁর ধ্যানে মগ্ন থেকে আমরা তাঁর সঙ্গে আমাদের অপ্রাকৃত সম্পর্কের আনন্দ উপলব্ধি করতে পারি। তিনিই হচ্ছেন শাশ্বত অস্তিত্ব। তিনি সব রকম দৈহিক প্রয়োজন, জন্ম ও মৃত্যু থেকে মুক্ত। সেই কথা যে কেবল অর্জুনই বলেছেন, তা নয়, সমস্ত বৈদিক সাহিত্য, *পুরাণ* ও ইতিহাস যুগ-যুগান্তর ধরে সেই কথা ঘোষণা করে আসছে। সমস্ত বৈদিক সাহিত্যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তার পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন, "যদিও আমি অজ, তবুও এই পৃথিবীতে আমি ধর্ম সংস্থাপন করবার জন্য অবতরণ করি।" তিনি পরম

উৎস; তাঁর কোন কারণ নেই, কেন না তিনিই হচ্ছেন সর্ব কারণের কারণ এবং তাঁর থেকেই সব কিছুর প্রকাশ হয়। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল এই দিব্যজ্ঞান লাভ করা যায়।

ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল অর্জুন তাঁর এই উপলব্ধির কথা বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা যদি *ভগবদ্গীতাকে* যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে চাই, তা হলে এই শ্লোক দুটিতে ভগবান সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে হবে। একে বলা হয় পরম্পরা ধারা অর্থাৎ গুরুশিষ্য পারম্পর্যে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা। পরম্পরা ধারায় অধিষ্ঠিত না হলে *ভগবদ্গীতার* যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায় না। কেতাবি বিদ্যার দ্বারা *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান লাভ করা কখনই সম্ভব নয়। বৈদিক শাস্ত্রে অজস্র প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক যুগের তথাকথিত দাম্ভিক পণ্ডিতেরা তাদের কেতাবি বিদ্যার অহঙ্কারে মত্ত হয়ে গোঁয়ার্তুমি করে বলে যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন সাধারণ মানুষ।

শ্লোক ১৪

সর্বমেতদ্ ঋতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব ।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥

সর্বম্—সমস্ত; **এতৎ**—এই; **ঋতম্**—সত্য; **মন্যে**—মনে করি; **যৎ**—যা; **মাম্**—আমাকে; **বদসি**—বলেছ; **কেশব**—হে কৃষ্ণ; **ন**—না; **হি**—অবশ্যই; **তে**—তোমার; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **ব্যক্তিম্**—তত্ত্ব; **বিদুঃ**—জানতে পারে; **দেবাঃ**—দেবতারা; **ন**—না; **দানবাঃ**—দানবেরা।

গীতার গান

হে কেশব তোমার এ গীত বাণী যত ।
সর্ব সত্য মানি আমি সে বেদসম্মত ॥
তোমার মহিমা তুমি জান ভাল মতে ।
অনন্ত পারে না গাহিতে অনন্ত জিহ্বাতে ॥

অনুবাদ

হে কেশব! তুমি আমাকে যা বলেছ, তা আমি সত্য বলে মনে করি। হে ভগবান! দেবতা অথবা দানবেরা কেউই তোমার তত্ত্ব যথাযথভাবে অবগত নন।

তাৎপর্য

অর্জুন এখানে দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করছেন যে, নাস্তিক ও আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা কখনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। এমন কি দেব-দেবীরা পর্যন্ত তাঁকে জানতে পারেন না, সুতরাং আধুনিক যুগের তথাকথিত পণ্ডিতদের সম্বন্ধে কি আর বলার আছে? ভগবানের কৃপায় অর্জুন উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমতত্ত্ব এবং তিনি পূর্ণ শুদ্ধ। তাই, আমাদের অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। কারণ, *ভগবদ্গীতাকে* তিনিই যথাযথভাবে গ্রহণ করেছিলেন। চতুর্থ অধ্যায়ে যে কথা বলা হয়েছে, পরম্পরা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান মানুষ হারিয়ে ফেলে। তাই, অর্জুনের মাধ্যমে ভগবান সেই পরম্পরা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন, কারণ অর্জুন হচ্ছেন তাঁর সখা ও পরম ভক্ত। সুতরাং, *গীতোপনিষদ ভগবদ্গীতার* প্রস্তাবনায় আমরা বলেছি যে, গুরু-শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান আহরণ করা উচিত। পরম্পরা নষ্ট হয়েছিল বলেই অর্জুনের মাধ্যমে তা পুনরুজ্জীবিত করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত নির্দেশগুলি অর্জুন সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিলেন। *ভগবদ্গীতার* যথাযথ অর্থ যদি আমরা উপলব্ধি করতে চাই, তা হলে আমাদেরও অর্জুনেরই মতো ভগবানের সব কয়টি নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গ্রহণ করতে হবে। তা হলেই কেবল আমরা শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলে জানতে পারব।

শ্লোক ১৫

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম ।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫ ॥

স্বয়ম্—স্বয়ং; **এব**—অবশ্যই; **আত্মনা**—নিজেই; **আত্মানম্**—নিজেকে; **বেত্থ**—জান; **ত্বম্**—তুমি; **পুরুষোত্তম**—হে পুরুষোত্তম; **ভূতভাবন**—হে সর্বভূতের উৎস; **ভূতেশ**—হে সর্বভূতের ঈশ্বর; **দেবদেব**—দেবতাদেরও দেবতা; **জগৎপতে**—হে বিশ্বপালক।

গীতার গান

হে পুরুষোত্তম, তুমি জান তোমার তোমাকে ।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥

তোমার বিভূতি যোগ দিব্য সে অশেষ ।
যদি কৃপা করি বল বিস্তারি বিশেষ ॥

অনুবাদ

হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! তুমি নিজেই তোমার চিৎ-শক্তির দ্বারা তোমার ব্যক্তিত্ব অবগত আছ।

তাৎপর্য

অর্জুন ও অর্জুনের অনুগামীদের মতো যাঁরা ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরাই কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারেন। নাস্তিক ও আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা কখনই শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না। মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনা যা ভগবানের থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, তা একটি অত্যন্ত গর্হিত পাপ। সুতরাং যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানে না, তাদের কখনই *ভগবদ্গীতার* ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিত নয়। *ভগবদ্গীতা* হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের বাণী এবং যেহেতু তা কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান, তা আমাদের শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে বুঝতে চেষ্টা করা উচিত, ঠিক যেভাবে অর্জুন তা বুঝেছিলেন। নাস্তিকের কাছ থেকে কখনই *ভগবদ্গীতা* শোনা উচিত নয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১১) বলা হয়েছে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

পরমতত্ত্বকে তিন রূপে উপলব্ধি করা যায়—নির্বিশেষ ব্রহ্ম, সর্বভূতে বিরাজমান পরমাত্মা এবং সবশেষে পরম পুরুষোত্তম ভগবানরূপে। সুতরাং পরম-তত্ত্বের চরম উপলব্ধির স্তরেই কেবল পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সান্নিধ্যে আসতে পারা যায়। মুক্ত পুরুষ, এমন কি সাধারণ মানুষেরা নির্বিশেষ ব্রহ্ম অথবা সর্বভূতে বিরাজমান পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু তবুও তারা *ভগবদ্গীতার* শ্লোকের মাধ্যমে এই *গীতার* বক্তা সবিশেষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নাও বুঝতে পারে। নির্বিশেষবাদীরা কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে স্বীকার করেন অথবা তাঁর প্রামাণিকতা স্বীকার করেন। তবুও বহু মুক্ত পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তম বা পরম পুরুষ বলে বুঝতে পারেন না। তাই, অর্জুন তাঁকে *পুরুষোত্তম* বলে সম্বোধন করেছেন। তবুও অনেকে এখনও নাও জানতে পারে যে, কৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের পিতা। তাই,

অর্জুন তাঁকে *ভূতভাবন* বলে সম্বোধন করেছেন। আর তাঁকে সর্বজীবের পরম পিতা বলে জানলেও অনেকে তাঁকে পরম নিয়ন্তারূপে নাও জানতে পারে; তাই এখানে তাঁকে *ভূতেশ* অর্থাৎ সর্বভূতের পরম নিয়ন্তা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এমন কি কৃষ্ণকে সর্বভূতের পরম নিয়ন্তা বলে জানলেও, অনেকে তাঁকে সমস্ত দেব-দেবীর উৎস বলে নাও জানতে পারে; তাই তাঁকে এখানে *দেবদেব* অর্থাৎ সমস্ত দেবতাদের আরাধ্য দেবতা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এমন কি তাঁকে সমস্ত দেবতাদের আরাধ্য দেবতা বলে জানলেও অনেকে তাঁকে সমস্ত জগতের পতিরূপে নাও জানতে পারেন; তাই তাঁকে *জগৎপতে* বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এভাবেই অর্জুনের উপলব্ধির মাধ্যমে এই শ্লোকটিতে কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যথাযথভাবে শ্রীকৃষ্ণকে জানতে চেষ্টা করা।

শ্লোক ১৬

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

বক্তুম্—বলতে; **অর্হসি**—সক্ষম; **অশেষেণ**—বিস্তারিতভাবে; **দিব্যাঃ**—দিব্য; **হি**—অবশ্যই; **আত্ম**—স্বীয়; **বিভূতয়ঃ**—বিভূতিসকল; **যাভিঃ**—যে সমস্ত; **বিভূতিভিঃ**—বিভূতি দ্বারা; **লোকান্**—লোকসমূহ; **ইমান্**—এই সমস্ত; **ত্বম্**—তুমি; **ব্যাপ্য**—ব্যাপ্ত হয়ে; **তিষ্ঠসি**—অবস্থান করছ।

গীতার গান

যে যে বিভূতি বলে ভুবন চতুর্দশ ।
ব্যাপিয়া রয়েছ তুমি সর্বত্র সে যশ ॥
কিভাবে করিয়া চিন্তা তোমার মহিমা ।
হে যোগী তোমাকে জানি তাহা সে কহিবা ॥

অনুবাদ

তুমি যে সমস্ত বিভূতির দ্বারা এই লোকসমূহে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছ, সেই সমস্ত তোমার দিব্য বিভূতি সকল তুমিই কেবল বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে সমর্থ।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি পড়ে প্রতীয়মান হয় যে, অর্জুন যেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই নিঃসন্দেহ হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অর্জুন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং এগুলির মাধ্যমে মানুষ আর যা কিছু অর্জন করতে পারে, সেই সবের দ্বারাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান বলে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। ভগবান সম্বন্ধে তাঁর মনে আর কোন সংশয় নেই, তবু তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করেছেন তাঁর সর্বব্যাপ্ত বিভূতির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করতে। সাধারণ লোকেরা এবং বিশেষ করে নির্বিশেষবাদীরা প্রধানত পরম-তত্ত্বের সর্বব্যাপ্ত রূপের প্রতিই আগ্রহী। তাই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছেন, তাঁর বিবিধ শক্তির মাধ্যমে তাঁর সর্বব্যাপ্ত রূপে তিনি কিভাবে বিরাজ করেন। এখানে আমাদের বোঝা উচিত যে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রশ্নগুলি করেছেন সাধারণ মানুষের হয়ে, তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য।

শ্লোক ১৭

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্ ।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥

কথম্—কিভাবে; **বিদ্যাম্ অহম্**—আমি জানব; **যোগিন্**—হে যোগেশ্বর; **ত্বাম্**—তোমাকে; **সদা**—সর্বদা; **পরিচিন্তয়ন্**—চিন্তা করে; **কেষু**—কোন্; **কেষু**—কোন্; **চ**—ও; **ভাবেষু**—ভাবে; **চিন্ত্যঃ অসি**—চিন্তনীয় হও; **ভগবন্**—হে পরমেশ্বর ভগবান; **ময়া**—আমার দ্বারা।

গীতার গান

কিভাবে বুঝিব আমি তোমার সে বৈভব ।
কৃপা করি তুমি মোরে কহ সে ভাব ॥

অনুবাদ

হে যোগেশ্বর! কিভাবে সর্বদা তোমার চিন্তা করলে আমি তোমাকে জানতে পারব? হে ভগবন্! কোন্ কোন্ বিবিধ আকৃতির মাধ্যমে আমি তোমাকে চিন্তা করব?

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবান তাঁর যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকেন। যে সকল ভক্ত তাঁর চরণে সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন, তাঁরাই কেবল তাঁকে দেখতে পারেন। এখন অর্জুনের মনে আর কোন সংশয় নেই যে, তাঁর বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু তিনি জানতে চান কিভাবে সাধারণ মানুষ সর্বব্যাপক পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে। কোন সাধারণ মানুষ, নাস্তিক ও অসুরেরা শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে না, কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যোগমায়ার শক্তি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকেন। কিন্তু তবুও অর্জুন আবার এই প্রশ্নগুলি করেছেন তাদেরই মঙ্গলের জন্য। উত্তম ভক্ত কেবল নিজের জানার জন্যই শুধু উৎসাহী নন, সমগ্র মানবজাতি যাতে জানতে পারে সেদিকে তাঁর লক্ষ্য। সুতরাং, যেহেতু অর্জুন হচ্ছেন ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব, তাই অহৈতুকী কৃপার বশবর্তী হয়ে তিনি ভগবানের সর্বব্যাপকতার নিগূঢ় রহস্যের আবরণ জনসাধারণের কাছে উন্মোচিত করেছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষত যোগী বলে সম্বোধন করেছেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন যোগমায়া শক্তির অধীশ্বর। এই যোগমায়ার দ্বারা তিনি সাধারণ মানুষের কাছে নিজেকে আচ্ছাদিত করে রাখেন অথবা প্রকাশিত করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে মানুষের ভক্তি নেই, সে শ্রীকৃষ্ণের কথা সব সময়ে চিন্তা করতে পারে না। তাই তাকে জড়-জাগতিক পদ্ধতিতেই চিন্তা করতে হয়। অর্জুন এই জড় জগতের বিষয়াসক্ত মানুষের কথা বিবেচনা করেছেন। *কেষু কেষু চ ভাবেষু* কথাটি জড়া প্রকৃতিকে উল্লেখ করে (*ভাব* শব্দটির অর্থ 'জড় বস্তু')। যেহেতু বিষয়াসক্ত মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না, তাই এখানে তাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে জড় বিষয়ে মনকে নিবিষ্ট করে এবং তার মধ্যে দিয়ে কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্রই নিজেকে প্রকাশিত করছেন, তা দেখবার চেষ্টা করতে।

শ্লোক ১৮

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দন ।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

বিস্তরেণ—বিস্তারিতভাবে; **আত্মনঃ**—তোমার; **যোগম্**—যোগ; **বিভূতিম্**—বিভূতি; **চ**—ও; **জনার্দন**—হে জনার্দন; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **কথয়**—বল; **তৃপ্তিঃ**—তৃপ্তি; **হি**—

অবশ্যই; **শৃণ্বতঃ**—শ্রবণ করে; **ন অস্তি**—হচ্ছে না; **মে**—আমার; **অমৃতম্**—উপদেশামৃত।

গীতার গান

হে জনার্দন তোমার যোগ বা বিভূতি ।
বিস্তার শুনিতে মন হয়েছে সে অতি ॥
পুনঃ পুনঃ বল যদি তবু তৃপ্ত নয় ।
অমৃত তোমার কথা মৃতত্ব না ক্ষয় ॥

অনুবাদ

হে জনার্দন! তোমার যোগ ও বিভূতি বিস্তারিতভাবে পুনরায় আমাকে বল। কারণ তোমার উপদেশামৃত শ্রবণ করে আমার পরিতৃপ্তি হচ্ছে না; আমি আরও শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি।

তাৎপর্য

অনেকটা এই ধরনের কথা, শৌনক মুনির নেতৃত্বে নৈমিষারণ্যের ঋষিরা সূত গোস্বামীকে বলেছিলেন। সেই বিবৃতিটি হচ্ছে—

বয়ং তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমশ্লোকবিক্রমে ।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥

"উত্তমশ্লোকের দ্বারা বন্দিত শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা নিরন্তর শ্রবণ করলেও কখনও তৃপ্তি লাভ হয় না। ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত সম্পর্কে যাঁরা যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা পদে পদে তাঁর অপ্রাকৃত লীলারস আস্বাদন করেন।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/১/১৯) এভাবেই অর্জুনও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে, বিশেষ করে কিভাবে তিনি সর্বব্যাপ্ত ভগবানরূপে বিরাজমান, তা জানতে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী।

এখন অমৃত সম্বন্ধে বলতে গেলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে যে কোন বর্ণনা অমৃতময় এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই অমৃত আস্বাদন করা যায়। আধুনিক গল্প, উপন্যাস ও ইতিহাস ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা থেকে ভিন্ন। জাগতিক গল্প-উপন্যাস একবার পড়ার পরেই মানুষ অবসাদ বোধ করে, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণে কখনই ক্লান্তি আসে না। সেই জন্যই সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস ভগবানের অবতারসমূহের লীলাকাহিনীর বর্ণনায় পরিপূর্ণ। যেমন,

পুরাণ হচ্ছে অতীতের ইতিহাস, যাতে রয়েছে ভগবানের বিভিন্ন অবতারের লীলাবর্ণনা। এভাবেই ভগবানের এই সমস্ত লীলাকাহিনী বার বার পাঠ করলেও নিত্য নব নব রসের আস্বাদন লাভ করা যায়।

শ্লোক ১৯

শ্রীভগবানুবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **হন্ত**—হ্যাঁ; **তে**—তোমাকে; **কথয়িষ্যামি**—আমি বলব; **দিব্যাঃ**—দিব্য; **হি**—অবশ্যই; **আত্মবিভূতয়ঃ**—আমার বিভূতিসমূহ; **প্রাধান্যতঃ**—যেগুলি প্রধান; **কুরুশ্রেষ্ঠ**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; **নাস্তি**—নেই; **অন্তঃ**—অন্ত; **বিস্তরস্য**—বিভূতি বিস্তারের; **মে**—আমার।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ
হে অর্জুন বলি শুন বিভূতি আমার ।
যাহার নাহিক অন্ত অনন্ত অপার ॥
প্রধানত বলি কিছু শুন মন দিয়া ।
কুরুশ্রেষ্ঠ নিজ শ্রেষ্ঠ বুঝ সে শুনিয়া ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে অর্জুন, আমার দিব্য প্রধান প্রধান বিভূতিসমূহ তোমাকে বলব, কিন্তু আমার বিভূতিসমূহের অন্ত নেই।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ব ও তাঁর বিভূতি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। স্বতন্ত্র জীবাত্মার ইন্দ্রিয়গুলি সীমিত এবং তা দিয়ে কৃষ্ণ বিষয়ক তত্ত্ব পূর্ণরূপে জানা অসম্ভব। তবুও ভক্তেরা শ্রীকৃষ্ণকে জানতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁদের সেই প্রয়াস এই রকম নয়

যে, কোন বিশেষ সময়ে অথবা জীবনের কোন বিশেষ স্তরে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় সমস্ত আলোচনা এতই আস্বাদনীয় যে, তা ভক্তদের কাছে অমৃতবৎ প্রতিভাত হয়। এভাবেই ভক্তেরা তা উপভোগ করেন। শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি ও তাঁর বিভিন্ন শক্তির কথা আলোচনা করে শুদ্ধ ভক্তেরা দিব্য আনন্দ অনুভব করেন। তাই, তাঁরা নিরন্তর তা শ্রবণ ও কীর্তন করতে চান। শ্রীকৃষ্ণ জানেন যে, জীবেরা তাঁর বিভূতির কূল-কিনারা পায় না। তাই, তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির মুখ্য প্রকাশগুলি কেবল বর্ণনা করতে সম্মত হয়েছেন। *প্রাধান্যতঃ* ('প্রধান') কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা কেবল ভগবানের শক্তির কয়েকটি মুখ্য প্রকাশই কেবল অনুভব করতে পারি, কেন না তাঁর শক্তিবৈচিত্র্য অনন্ত। সেই অনন্ত শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। এই শ্লোকে ব্যবহৃত *বিভূতি* বলতে উল্লেখ করা হয়েছে যার দ্বারা তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। *অমরকোষ* অভিধানে *বিভূতি* শব্দের অর্থে বলা হয়েছে 'অসাধারণ ঐশ্বর্য'।

নির্বিশেষবাদীরা অথবা সর্বেশ্বরবাদীরা পরমেশ্বর ভগবানের অসাধারণ বিভূতি ও তাঁর দিব্য শক্তির প্রকাশ উপলব্ধি করতে পারে না। জড় ও চিন্ময় উভয় জগতেই ভগবানের শক্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন, একজন সাধারণ মানুষও কিভাবে তা অনুভব করতে পারে। এভাবেই ভগবান তাঁর অনন্ত শক্তিকে কেবল আংশিকভাবে বর্ণনা করেছেন।

শ্লোক ২০

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ।
অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥

অহম্—আমি; **আত্মা**—আত্মা; **গুড়াকেশ**—হে অর্জুন; **সর্বভূত**—সমস্ত জীবের; **আশয়স্থিতঃ**—হৃদয়ে অবস্থিত; **অহম্**—আমি; **আদিঃ**—আদি; **চ**—ও; **মধ্যম্**—মধ্য; **চ**—ও; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **অন্তঃ**—অন্ত; **এব**—অবশ্যই; **চ**—এবং।

গীতার গান

সর্বভূত আশ্রয় সে আমি গুড়াকেশ ।
আমি আদি আমি মধ্য আমি সেই শেষ ॥

অনুবাদ

হে গুড়াকেশ! আমিই সমস্ত জীবের হৃদয়ে অবস্থিত পরমাত্মা। আমিই সর্বভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে অর্জুনকে গুড়াকেশ বলে সম্বোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ 'যিনি নিদ্রারূপী তামসকে জয় করেছেন'। যারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিদ্রিত, তারা কখনই জানতে পারে না, পরমেশ্বর ভগবান কিভাবে বিবিধ প্রকারে জড় ও চিন্ময় জগতে নিজেকে প্রকাশ করেন। তাই, অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের এভাবে সম্বোধন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্জুন যেহেতু এই তামসের অতীত, তাই পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে বিভিন্ন বিভূতির কথা শোনাতে সম্মত হয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে অর্জুনকে জ্ঞাপন করেছেন যে, তাঁর মুখ্য বিস্তারের মাধ্যমে তিনিই হচ্ছেন সমস্ত বিশ্বচরাচরের আত্মা। সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান নিজেকে স্বাংশ পুরুষ অবতার রূপে প্রকাশিত করেন এবং তাঁর থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি হয়। তাই, তিনি হচ্ছেন মহৎ-তত্ত্ব বা ব্রহ্মাণ্ডের উপাদানগুলির আত্মা। সমগ্র জড় শক্তি সৃষ্টির কারণ নয়, প্রকৃতপক্ষে মহাবিষ্ণু মহৎ-তত্ত্ব বা সমগ্র জড় শক্তিতে প্রবেশ করেন। তিনি হচ্ছেন আত্মা। মহাবিষ্ণু যখন প্রকটিত ব্রহ্মাণ্ডগুলির মধ্যে প্রবেশ করেন, তখন তিনি আবার প্রতিটি সত্তার অন্তরে পরমাত্মারূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন। আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, চিন্ময় স্ফুলিঙ্গের উপস্থিতির ফলেই জীবের এই জড় দেহ সক্রিয় হয়। এই চিন্ময় স্ফুলিঙ্গ ব্যতীত দেহের কোন রকম বিকাশ হতে পারে না। তেমনই, পরম আত্মা শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ না করা পর্যন্ত জড় জগতের কোন রকম বিকাশ হতে পারে না। *সুবল উপনিষদে* বর্ণনা দেওয়া আছে, *প্রকৃত্যাদিসর্বভূতান্তর্যামী সর্বশেষী চ নারায়ণঃ*—"পরম পুরুষোত্তম ভগবান পরমাত্মা রূপে সব কয়টি প্রকটিত ব্রহ্মাণ্ডেই বিরাজমান।"

শ্রীমদ্ভাগবতে তিনটি পুরুষ অবতারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলি আবার *সাত্বত-তন্ত্রেও* বর্ণিত আছে। *বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ*—"পরম পুরুষোত্তম ভগবান এই জড় জগতে কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু—এই তিন রূপে নিজেকে প্রকটিত করেন।" *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪৭) মহাবিষ্ণু বা কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর বর্ণনা আছে। *যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগনিদ্রাম্*—সর্ব কারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

মহাবিষ্ণু রূপে কারণ-সমুদ্রে শায়িত থাকেন। সুতরাং পরম পুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূলতত্ত্ব, প্রকটিত বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা এবং সমগ্র শক্তির সংহারকর্তা।

শ্লোক ২১

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্ ।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

আদিত্যানাম্—আদিত্যদের মধ্যে; **অহম্**—আমি; **বিষ্ণুঃ**—বিষ্ণু; **জ্যোতিষাম্**—জ্যোতিষ্কদের মধ্যে; **রবিঃ**—সূর্য; **অংশুমান্**—কিরণশালী; **মরীচিঃ**—মরীচি; **মরুতাম্**—মরুতদের মধ্যে; **অস্মি**—হই; **নক্ষত্রাণাম্**—নক্ষত্রদের মধ্যে; **অহম্**—আমি; **শশী**—চন্দ্র।

গীতার গান

আদিত্যগণের বিষ্ণু জ্যোতিষে সে সূর্য ।
মরীচি মরুৎগণে শশী তারাচর্য ॥

অনুবাদ

আদিত্যদের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কদের মধ্যে আমি কিরণশালী সূর্য, মরুতদের মধ্যে আমি মরীচি এবং নক্ষত্রদের মধ্যে আমি চন্দ্র।

তাৎপর্য

দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ প্রধান। আকাশে অসংখ্য উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মধ্যে সূর্য হল মুখ্য। *ব্রহ্মসংহিতায়* সূর্যকে ভগবানের একটি উজ্জ্বল চোখরূপে গণ্য করা হয়েছে। অন্তরীক্ষে পঞ্চাশ রকমের বিভিন্ন বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে এবং এগুলির নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা মরীচি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি।

অসংখ্য নক্ষত্রদের ভিতর রাত্রিবেলায় চন্দ্র অত্যন্ত সুস্পষ্ট উজ্জ্বল এবং এভাবেই চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। এই শ্লোক থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চন্দ্রও একটি নক্ষত্র; তাই যে সমস্ত নক্ষত্র আকাশে ঝলমল করে, সেগুলিতেও সূর্যের আলোক প্রতিফলিত হচ্ছে। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অনেকগুলি সূর্য রয়েছে, তা বৈদিক শাস্ত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। সূর্য একটিই এবং সূর্যের প্রতিফলনের দ্বারা যেমন চন্দ্র আলোকিত

হয়, সেই রকম নক্ষত্রগুলিও আলোকিত হয়। যেহেতু *ভগবদ্গীতা* এখানে নির্দেশ করছে যে, নক্ষত্রগুলির মধ্যে চন্দ্রও একটি নক্ষত্র, তাই যে সমস্ত নক্ষত্র ঝলমল করছে সেগুলি সূর্য নয়, বরং সেগুলি চন্দ্রেরই মতো নক্ষত্র।

শ্লোক ২২

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ ॥

বেদানাম্—সমস্ত বেদের মধ্যে; **সামবেদঃ**—সামবেদ; **অস্মি**—হই; **দেবানাম্**—সমস্ত দেবতাদের মধ্যে; **অস্মি**—হই; **বাসবঃ**—ইন্দ্র; **ইন্দ্রিয়াণাম্**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে; **মনঃ**—মন; **চ**—ও; **অস্মি**—হই; **ভূতানাম্**—প্রাণীদের মধ্যে; **অস্মি**—হই; **চেতনা**—চেতনা।

গীতার গান

বেদ-মধ্যে সামবেদ দেবগণে ইন্দ্র ।
ইন্দ্রিয়গণের মন চেতনার কেন্দ্র ॥

অনুবাদ

সমস্ত বেদের মধ্যে আমি সামবেদ, সমস্ত দেবতাদের মধ্যে আমি ইন্দ্র, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আমি মন এবং সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে আমি চেতনা।

তাৎপর্য

জড় ও চেতনের পার্থক্য হচ্ছে যে, জীবসত্তার মতো জড়ের চেতনা নেই। তাই, চেতন হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও নিত্য। জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে কখনই চেতনা সৃষ্টি করা যায় না।

শ্লোক ২৩

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্ ।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩ ॥

রুদ্রাণাম্—রুদ্রদের মধ্যে; **শঙ্করঃ**—শিব; **চ**—ও; **অস্মি**—হই; **বিত্তেশঃ**—কুবের; **যক্ষরক্ষসাম্**—যক্ষ ও রাক্ষসদের মধ্যে; **বসূনাম্**—বসুদের মধ্যে; **পাবকঃ**—অগ্নি; **চ**—ও; **অস্মি**—হই; **মেরুঃ**—মেরু; **শিখরিণাম্**—পর্বতসমূহের মধ্যে; **অহম্**—আমি।

গীতার গান

রুদ্রদের মধ্যে শিব যক্ষের কুবের ।
পাবক সে বসুমধ্যে পর্বতে সুমের ॥

অনুবাদ

রুদ্রদের মধ্যে আমি শিব, যক্ষ ও রাক্ষসদের মধ্যে আমি কুবের, বসুদের মধ্যে আমি অগ্নি এবং পর্বতসমূহের মধ্যে আমি সুমেরু।

তাৎপর্য

একাদশ রুদ্রের মধ্যে শঙ্কর বা শিব হচ্ছেন প্রধান। তিনি হচ্ছেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তমোগুণের নিয়ন্তা এবং ভগবানের গুণাবতার। যক্ষ ও রাক্ষসদের অধিপতি কুবের হচ্ছেন দেবতাদের সমস্ত ধন-সম্পদের কোষাধ্যক্ষ এবং তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি। মেরু হচ্ছে একটি সুবিখ্যাত পর্বত, যা প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ।

শ্লোক ২৪

পুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥

পুরোধসাম্—পুরোহিতদের মধ্যে; **চ**—ও; **মুখ্যম্**—প্রধান; **মাম্**—আমাকে; **বিদ্ধি**—জানবে; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **বৃহস্পতিম্**—বৃহস্পতি; **সেনানীনাম্**—সেনাপতিদের মধ্যে; **অহম্**—আমি; **স্কন্দঃ**—কার্তিকেয়; **সরসাম্**—সমস্ত জলাশয়ের মধ্যে; **অস্মি**—হই; **সাগরঃ**—সাগর।

গীতার গান

পুরোহিতগণ মধ্যে হই বৃহস্পতি ।
সেনানীর মধ্যে স্কন্দ সাগর জলেতি ॥

অনুবাদ

হে পার্থ! পুরোহিতদের মধ্যে আমি প্রধান বৃহস্পতি, সেনাপতিদের মধ্যে আমি কার্তিক এবং জলাশয়ের মধ্যে আমি সাগর।

তাৎপর্য

স্বর্গরাজ্যের প্রধান দেবতা হচ্ছেন ইন্দ্র এবং তাঁকে স্বর্গের রাজা বলা হয়। তাঁর শাসনাধীন গ্রহলোককে ইন্দ্রলোক বলা হয়। বৃহস্পতি হচ্ছেন ইন্দ্রের পুরোহিত এবং ইন্দ্র যেহেতু সমস্ত রাজাদের মধ্যে প্রধান, সেই জন্য বৃহস্পতি হচ্ছেন সমস্ত পুরোহিতদের মধ্যে প্রধান। আর ইন্দ্র যেমন সমস্ত রাজাদের মধ্যে প্রধান, তেমনই শিব-পার্বতীর পুত্র স্কন্দও সমগ্র সেনাবর্গের মধ্যে প্রধান। আর সমস্ত জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্রই হচ্ছে প্রধান। শ্রীকৃষ্ণের এই অভিব্যক্তিগুলি তাঁর মাহাত্ম্যকেই ইঙ্গিত করে।

শ্লোক ২৫

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্ ।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫ ॥

মহর্ষীণাম্—মহর্ষিদের মধ্যে; **ভৃগুঃ**—ভৃগু; **অহম্**—আমি; **গিরাম্**—বাক্যসমূহের মধ্যে; **অস্মি**—হই; **একম্ অক্ষরম্**—এক অক্ষর প্রণব; **যজ্ঞানাম্**—যজ্ঞসমূহের মধ্যে; **জপযজ্ঞঃ**—জপযজ্ঞ; **অস্মি**—হই; **স্থাবরাণাম্**—স্থাবর বস্তুসমূহের মধ্যে; **হিমালয়ঃ**—হিমালয় পর্বত।

গীতার গান

মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু আমি হই ।
ওঙ্কার প্রণব আমি একাক্ষর সেই ॥
যজ্ঞ যত হয় তার মধ্যে আমি জপ ।
অচলেতে হিমালয় স্থাবর যে সব ॥

অনুবাদ

মহর্ষিদের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যসমূহের মধ্যে আমি ওঁকার। যজ্ঞসমূহের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং স্থাবর বস্তুসমূহের মধ্যে আমি হিমালয়।

তাৎপর্য

এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম জীব ব্রহ্মা বিভিন্ন ধরনের প্রজাতি সৃষ্টির জন্য কয়েকজন সন্তান সৃষ্টি করেন। তাঁর সেই সন্তানদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সন্তান হচ্ছেন মহান ঋষি ভৃগু। সমস্ত অপ্রাকৃত শব্দের মধ্যে ওঁ (ওঁকার) শব্দরূপে ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করে। সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে** জপ করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ, কারণ এই মহামন্ত্র হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে পবিত্র প্রতীক। যজ্ঞ অনুষ্ঠানে কখনও কখনও পশুবলির নির্দেশ দেওয়া হয়, কিন্তু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার মাধ্যমে যে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাতে হিংসার কোন স্থান নেই। এটি সবচেয়ে সরল ও পবিত্রতম যজ্ঞানুষ্ঠান। জগতে যা কিছু পরম মহিমান্বিত, তা সবই শ্রীকৃষ্ণেরই প্রতীক। তাই, এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পর্বত হিমালয় তাঁরই প্রতীক। পূর্ববর্তী শ্লোকে মেরু পর্বতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মেরু পর্বত কখনও কখনও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করে, কিন্তু হিমালয় অচল। এভাবেই হিমালয়ের মাহাত্ম্য মেরুর চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ২৬

অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাং চ নারদঃ ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥

অশ্বত্থঃ—অশ্বত্থ বৃক্ষ; **সর্ববৃক্ষাণাম্**—সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে; **দেবর্ষীণাম্**—দেবর্ষিদের মধ্যে; **চ**—এবং; **নারদঃ**—নারদ মুনি; **গন্ধর্বাণাম্**—গন্ধর্বদের মধ্যে; **চিত্ররথঃ**—চিত্ররথ; **সিদ্ধানাম্**—সিদ্ধদের মধ্যে; **কপিলঃ মুনিঃ**—কপিল মুনি।

গীতার গান

সর্ব বৃক্ষ মধ্যে হই অশ্বত্থ বিশাল ।
দেবর্ষির মধ্যে নাম নারদ আমার ॥
গন্ধর্বের চিত্ররথ সিদ্ধের কপিল ।
মুনিগণের মধ্যে সে সর্বত জটিল ॥

অনুবাদ

সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবর্ষিদের মধ্যে আমি নারদ। গন্ধর্বদের মধ্যে আমি চিত্ররথ এবং সিদ্ধদের মধ্যে আমি কপিল মুনি।

তাৎপর্য

অশ্বত্থ বৃক্ষ হচ্ছে গাছের মধ্যে সবচেয়ে বিশাল ও সবচেয়ে সুন্দর। ভারতবাসীরা প্রতিদিন সকালে অশ্বত্থ বৃক্ষের পূজা করে থাকেন। দেবতাদের মধ্যে দেবর্ষি নারদকেও তাঁরা পূজা করে থাকেন এবং তাঁকে এই জগতে ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলে গণ্য করা হয়। এভাবেই নারদ হচ্ছেন ভগবানের ভক্তরূপী প্রকাশ। গন্ধর্বলোকের অধিবাসীরা সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী এবং তাঁদের মধ্যে চিত্ররথ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ। সিদ্ধদের মধ্যে দেবহূতিনন্দন কপিলদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের একজন অবতার বলা হয় এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* তাঁর দর্শনের উল্লেখ আছে। পরবর্তীকালে আর একজন কপিল খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তবে তাঁর প্রবর্তিত দর্শন নাস্তিক মতবাদ-প্রসূত। তাই ভগবৎ অবতার কপিল এবং এই নাস্তিক কপিলের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত।

শ্লোক ২৭

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্ ।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাং চ নরাধিপম্ ॥ ২৭ ॥

উচ্চৈঃশ্রবসম্—উচ্চৈঃশ্রবা; **অশ্বানাম্**—অশ্বদের মধ্যে; **বিদ্ধি**—জানবে; **মাম্**—আমাকে; **অমৃতোদ্ভবম্**—সমুদ্র-মন্থনের সময় উদ্ভূত; **ঐরাবতম্**—ঐরাবত; **গজেন্দ্রাণাম্**—শ্রেষ্ঠ হস্তীদের মধ্যে; **নরাণাম্**—মানুষদের মধ্যে; **চ**—এবং; **নরাধিপম্**—রাজা।

গীতার গান

অশ্বদের মধ্যে হই উচ্চৈঃশ্রবা নাম ।
সমুদ্র মন্থনে সে হয় মোর ধাম ॥
গজেন্দ্রগণের মধ্যে ঐরাবত হই ।
সম্রাটগণের মধ্যে মনুষ্যেতে সেই ॥

অনুবাদ

অশ্বদের মধ্যে আমাকে সমুদ্র-মন্থনের সময় উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা বলে জানবে। শ্রেষ্ঠ হস্তীদের মধ্যে আমি ঐরাবত এবং মনুষ্যদের মধ্যে আমি সম্রাট।

তাৎপর্য

একবার ভগবদ্ভক্ত দেবতা ও ভগবৎ-বিদ্বেষী অসুরেরা সমুদ্র-মন্থনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই মন্থনের ফলে অমৃত ও বিষ উত্থিত হয়েছিল এবং দেবাদিদেব মহাদেব সেই বিষ পান করে জগৎকে রক্ষা করেছিলেন। অমৃতের থেকে অনেক জীব উৎপন্ন হয়েছিল। উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব ও ঐরাবত নামক হস্তী এই অমৃত থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। যেহেতু এই দুটি পশু অমৃত থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, তাই তাঁদের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে এবং সেই জন্য তাঁরা হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি।

মনুষ্যদের মধ্যে রাজা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি, কারণ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন এই জগতের পালনকর্তা এবং দৈব গুণাবলীতে গুণান্বিত হওয়ার ফলে রাজারা তাঁদের রাজ্যের পালনকর্তা রূপে নিযুক্ত হয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্র, মহারাজ যুধিষ্ঠির, মহারাজ পরীক্ষিতের মতো নরপতিরা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। তাঁরা সর্বক্ষণ তাঁদের প্রজাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করতেন। বৈদিক শাস্ত্রে রাজাকে ভগবানের প্রতিনিধিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। আধুনিক যুগে, ধর্মনীতি কলুষিত হয়ে যাওয়ার ফলে রাজতন্ত্র ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অবশেষে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে গেছে। এটি অনস্বীকার্য যে, পুরাকালে ধর্মপরায়ণ রাজার তত্ত্বাবধানে প্রজারা অত্যন্ত সুখে বসবাস করত।

শ্লোক ২৮-২৯

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্ ।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮ ॥
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্ ।
পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯ ॥

আয়ুধানাম্—সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে; **অহম্**—আমি; **বজ্রম্**—বজ্র; **ধেনূনাম্**—গাভীদের মধ্যে; **অস্মি**—হই; **কামধুক্**—কামধেনু; **প্রজনঃ**—সন্তান উৎপাদনের কারণ; **চ**—এবং; **অস্মি**—হই; **কন্দর্পঃ**—কামদেব; **সর্পাণাম্**—সর্পদের মধ্যে; **অস্মি**—হই;

বাসুকি—বাসুকি; অনন্তঃ—অনন্ত; চ—ও; অস্মি—হই; নাগানাম্—নাগদের মধ্যে; বরুণঃ—বরুণদেব; যাদসাম্—সমস্ত জলচরের মধ্যে; অহম্—আমি; পিতৃণাম্—পিতৃদের মধ্যে; অর্যমা—অর্যমা; চ—ও; অস্মি—হই; যমঃ—যমরাজ; সংযমতাম্—দণ্ডদাতাদের মধ্যে; অহম্—আমি।

গীতার গান

অস্ত্রের মধ্যেতে বজ্র ধেনু কামধেনু ।
উৎপত্তির কন্দর্প হই কামতনু ॥
সর্পগণের মধ্যেতে আমি সে বাসুকি ।
অনন্ত সে নাগগণে বরুণ যাদসি ॥
পিতৃদেব মধ্যে আমি হই সে অর্যমা ॥
যমরাজ আমি সেই মধ্যেতে সংযমা ।

অনুবাদ

সমস্ত অস্ত্রের মধ্যে আমি বজ্র, গাভীদের মধ্যে আমি কামধেনু। সন্তান উৎপাদনের কারণ আমিই কামদেব এবং সর্পদের মধ্যে আমি বাসুকি। সমস্ত নাগদের মধ্যে আমি অনন্ত এবং জলচরদের মধ্যে আমি বরুণ। পিতৃদের মধ্যে আমি অর্যমা এবং দণ্ডদাতাদের মধ্যে আমি যম।

তাৎপর্য

বাস্তবিকই অসীম শক্তিশালী অস্ত্র বজ্র শ্রীকৃষ্ণের শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। চিন্ময় জগতে কৃষ্ণলোকে গাভীদের যে কোন সময় দোহন করলেই যত পরিমাণ ইচ্ছা তত পরিমাণ দুধ পাওয়া যায়। জড় জগতে অবশ্য এই ধরনের গাভী দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার বহু গাভী রয়েছে এবং এই সমস্ত গাভীদের বলা হয় সুরভী। বর্ণিত আছে যে, গোচারণে ভগবান নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। কন্দর্প হচ্ছেন কামদেব, যাঁর প্রভাবে সুসন্তান উৎপন্ন হয়। তাই কন্দর্প হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য যে কাম তা কখনই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব করে না। কিন্তু সুসন্তান উৎপাদনের জন্য যে কাম, তাই হচ্ছেন কন্দর্প এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব করেন।

বহু ফণাধারী নাগদের মধ্যে অনন্ত হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ এবং জলচরদের মধ্যে বরুণ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ। তাঁরা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। পিতৃ বা পূর্বপুরুষদেরও একটি গ্রহলোক আছে এবং সেই গ্রহের অধিষ্ঠাতা দেবতা হচ্ছেন অর্যমা, যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। পাপীদের যাঁরা দণ্ড দেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন যমরাজ। এই পৃথিবীর নিকটেই যমালয় অবস্থিত। মৃত্যুর পর পাপীদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং যমরাজ তাদের নানাভাবে শাস্তি দেন।

শ্লোক ৩০

**প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।
মৃগাণাং চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০ ॥**

প্রহ্লাদঃ—প্রহ্লাদ; চ—ও; অস্মি—হই; দৈত্যানাম্—দৈত্যদের মধ্যে; কালঃ—কাল; কলয়তাম্—বশীকারীদের মধ্যে; অহম্—আমি; মৃগাণাম্—সমস্ত পশুদের মধ্যে; চ—এবং; মৃগেন্দ্রঃ—সিংহ; অহম্—আমি; বৈনতেয়ঃ—গরুড়; চ—ও; পক্ষিণাম্—পক্ষীদের মধ্যে।

গীতার গান

দৈত্যদের প্রহ্লাদ সে ভক্তির পিপাসী ।
বশীদের মধ্যে আমি কাল মহাবশী ॥
মৃগদের মধ্যে সিংহ আমি হয়ে থাকি ।
পক্ষীদের মধ্যে আমি গরুড় সে পক্ষী ॥

অনুবাদ

দৈত্যদের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, বশীকারীদের মধ্যে আমি কাল, পশুদের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষীদের মধ্যে আমি গরুড়।

তাৎপর্য

দিতি ও অদিতি দুই ভগ্নী। অদিতির পুত্রদের বলা হয় আদিত্য এবং দিতির পুত্রদের বলা হয় দৈত্য। সমস্ত আদিত্যেরা ভগবানের ভক্ত, আর সমস্ত দৈত্যেরা নাস্তিক। যদিও প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও শৈশব থেকে তিনি ছিলেন মহান ভগবদ্ভক্ত। তাঁর ভক্তি ও দৈব গুণাবলীর জন্য তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিরূপে গণ্য করা হয়।

নানা ধরনের বশীভূতকরণ নিয়ম আছে, কিন্তু কাল এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুকেই পরাস্ত করে এবং তাই কাল হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। জন্তুদের মধ্যে সিংহ হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী ও হিংস্র। সমগ্র পক্ষীকুলের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর বাহক গরুড় হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্লোক ৩১

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্ ।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১ ॥

পবনঃ—বায়ু; **পবতাম্**—পবিত্রকারীদের মধ্যে; **অস্মি**—হই; **রামঃ**—পরশুরাম; **শস্ত্রভৃতাম্**—শস্ত্রধারীদের মধ্যে; **অহম্**—আমি; **ঝষাণাম্**—মৎস্যদের মধ্যে; **মকরঃ**—মকর; **চ**—ও; **অস্মি**—হই; **স্রোতসাম্**—নদীসমূহের মধ্যে; **অস্মি**—হই; **জাহ্নবী**—গঙ্গা।

গীতার গান

বেগবান মধ্যে আমি হই সে পবন ।
শস্ত্রধারী মধ্যে সে আমি পরশুরাম ॥
জলচর মধ্যে আমি হয়েছি মকর ।
জাহ্নবী আমার নাম মধ্যে নদীবর ॥

অনুবাদ

পবিত্রকারী বস্তুদের মধ্যে আমি বায়ু, শস্ত্রধারীদের মধ্যে আমি পরশুরাম, মৎস্যদের মধ্যে আমি মকর এবং নদীসমূহের মধ্যে আমি গঙ্গা।

তাৎপর্য

সমগ্র জলচর প্রাণীদের মধ্যে মকর হচ্ছে বৃহত্তম এবং মানুষের কাছে দারুণ ভয়ঙ্কর। এভাবেই মকর শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক।

শ্লোক ৩২

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জুন ।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২ ॥

সর্গাণাম্—সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে; **আদিঃ**—আদি; **অন্তঃ**—অন্ত; **চ**—এবং; **মধ্যম্**—মধ্য; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **অহম্**—আমি; **অর্জুন**—হে অর্জুন; **অধ্যাত্মবিদ্যা**—চিন্ময় জ্ঞান; **বিদ্যানাম্**—সমস্ত বিদ্যার মধ্যে; **বাদঃ**—সিদ্ধান্তবাদ; **প্রবদতাম্**—তার্কিকদের বাদ, জল্প ও বিতণ্ডার মধ্যে; **অহম্**—আমি।

গীতার গান

যত সৃষ্ট বস্তু তার আদি মধ্য অন্ত ।
হে অর্জুন দেখ মোর ঐশ্বর্য অনন্ত ॥
যত বিদ্যা হয় তার মধ্যে আত্মজ্ঞান ।
আমি সে সিদ্ধান্ত মধ্যে যত বাদীগণ ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে আমি আদি, অন্ত ও মধ্য। সমস্ত বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা এবং তার্কিকদের বাদ, জল্প ও বিতণ্ডার মধ্যে আমি সিদ্ধান্তবাদ।

তাৎপর্য

সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সমগ্র জড় উপাদান প্রথম সৃষ্টি হয়। পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে, মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু এই জগতের সৃষ্টি ও পরিচালনার কার্য করেন এবং তারপর পুনরায় সৃষ্টির প্রলয় সাধন করেন শিব। ব্রহ্মা হচ্ছেন গৌণ সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের এই সমস্ত প্রতিনিধিরা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের গুণাবতার। তাই, তিনি হচ্ছেন সমগ্র সৃষ্টির আদি মধ্য ও অন্ত।

উন্নতমানের শিক্ষার জন্য জ্ঞানের বহুবিধ গ্রন্থ আছে, যেমন *চতুর্বেদ*, তাদের অন্তর্ভুক্ত ষড়দর্শন, *বেদান্ত-সূত্র*, ন্যায় শাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ও *পুরাণ*। সুতরাং, শিক্ষামূলক গ্রন্থের সর্বসমেত চতুর্দশটি বিভাগ রয়েছে। এগুলির মধ্যে যেই গ্রন্থটি অধ্যাত্মবিদ্যা বা পারমার্থিক জ্ঞান পরিবেশন করছে, বিশেষ করে *বেদান্ত-সূত্র* হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক।

ন্যায় শাস্ত্রে তার্কিকদের মধ্যে তর্কের বিভিন্ন স্তর আছে। বাদী-প্রতিবাদীর যুক্তিতর্কের সমর্থনে সাক্ষ্য বা প্রামাণিক তথ্যকে বলা হয় 'জল্প'। পরস্পরকে পরাস্ত করার প্রচেষ্টাকে বলা হয় 'বিতণ্ডা' এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে বলা হয় 'বাদ'। এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক।

শ্লোক ৩৩

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ ॥

অক্ষরাণাম্—সমস্ত অক্ষরের মধ্যে; **অকারঃ**—অকার; **অস্মি**—হই; **দ্বন্দ্বঃ**—দ্বন্দ্ব; **সামাসিকস্য**—সমাসসমূহের মধ্যে; **চ**—এবং; **অহম্**—আমি; **এব**—অবশ্যই; **অক্ষয়ঃ**—নিত্য; **কালঃ**—কাল; **ধাতা**—স্রষ্টা; **অহম্**—আমি; **বিশ্বতোমুখঃ**—ব্রহ্মা।

গীতার গান

অক্ষরের মধ্যে আমি 'অ'কার সে হই ।
সমাসের দ্বন্দ্ব আমি কিন্তু দ্বন্দ্ব নই ॥
স্রষ্টাগণে আমি ব্রহ্মা ধ্বংসে মহাকাল ।
রুদ্র নাম ধরি আমি সংহারী বিশাল ॥

অনুবাদ

সমস্ত অক্ষরের মধ্যে আমি অকার, সমাসসমূহের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব-সমাস, সংহারকারীদের মধ্যে আমি মহাকাল রুদ্র এবং স্রষ্টাদের মধ্যে আমি ব্রহ্মা।

তাৎপর্য

সংস্কৃত বর্ণমালার প্রথম অক্ষর *অকার* হচ্ছে বৈদিক সাহিত্যের প্রথম অক্ষর। *অকার* ছাড়া কোন শব্দের উচ্চারণ সম্ভব নয়। তাই *অকার* হচ্ছে শব্দের সূত্রপাত। সংস্কৃতে একাধিক শব্দের সমন্বয় হয়, যেমন রাম-কৃষ্ণ একে বলা হয় দ্বন্দ্ব। রাম ও কৃষ্ণ এই দুটি শব্দেরই ছন্দরূপ এক রকম, তাই তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলা হয়।

সমস্ত বিনাশকারীদের মধ্যে কাল হচ্ছেন চরম শ্রেষ্ঠ, কারণ কালের প্রভাবে সকলেরই বিনাশ হয়। কাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি, কারণ কালক্রমে এক মহা অগ্নি-প্রলয়ে সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে।

সমস্ত স্রষ্টা জীবদের মধ্যে চতুর্মুখ ব্রহ্মাই হচ্ছেন প্রধান। তাই, তিনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি।

শ্লোক ৩৪

মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।
কীর্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ ॥

মৃত্যুঃ—মৃত্যু; **সর্বহরঃ**—সমস্ত হরণকারীদের মধ্যে; **চ**—ও; **অহম্**—আমি; **উদ্ভবঃ**—উদ্ভব; **চ**—ও; **ভবিষ্যতাম্**—ভবিষ্যতের; **কীর্তিঃ**—কীর্তি; **শ্রীঃ**—ঐশ্বর্য অথবা সৌন্দর্য; **বাক্**—বাণী; **চ**—ও; **নারীণাম্**—নারীদের মধ্যে; **স্মৃতিঃ**—স্মৃতি; **মেধা**—মেধা; **ধৃতিঃ**—ধৃতি; **ক্ষমা**—ক্ষমা।

গীতার গান

হরণের মধ্যে আমি মৃত্যু সর্বহর ।
ভবিষ্য যে হয় আমি উদ্ভব আকর ॥
নারীদের মধ্যে আমি শ্রী বাণী স্মৃতি ।
কীর্তি, মেধা, ক্ষমা মূর্তি অথবা সে ধৃতি ॥

অনুবাদ

সমস্ত হরণকারীদের মধ্যে আমি সর্বগ্রাসী মৃত্যু, ভাবীকালের বস্তুসমূহের মধ্যে আমি উদ্ভব। নারীদের মধ্যে আমি কীর্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা।

তাৎপর্য

জন্মের পর থেকে প্রতি মুহূর্তেই মানুষের মৃত্যু হতে থাকে। এভাবেই মৃত্যু প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি প্রাণীকে গ্রাস করে চলেছে, কিন্তু তার শেষ আঘাতকে মৃত্যু বলে সম্বোধন করা হয়। এই মৃত্যু হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ। প্রতিটি প্রাণীকেই ছয়টি মুখ্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তাদের জন্ম হয়, তাদের বৃদ্ধি হয়, কিছু কালের জন্য তারা স্থায়ী হয়, তারা প্রজনন করে, তাদের হ্রাস হয় এবং অবশেষে তাদের বিনাশ হয়। এই সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে প্রথম হচ্ছে গর্ভ থেকে সন্তানের প্রসব এবং তা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি। এই উদ্ভবই হচ্ছে ভবিষ্যতের সমস্ত কার্যকলাপের আদি উৎস।

এখানে যে কীর্তি, শ্রী, বাণী, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা—এই সাতটি ঐশ্বর্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সবই স্ত্রীলিঙ্গ বাচক। কোন ব্যক্তি যখন এই ঐশ্বর্যগুলির মধ্যে সব কয়টি বা কয়েকটি ধারণ করেন, তখন তিনি মহিমান্বিতা

হন। কোন মানুষ যখন ধার্মিক ব্যক্তিরূপে বিখ্যাত হন, তখন সেটি তাঁকে মহিমান্বিত করে। সংস্কৃত হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ শ্রেষ্ঠ ভাষা, তাই তা অতি মহিমান্বিত। কোন কিছু পাঠ করার পরেই কেউ যখন তা মনে রাখতে পারে, সেই বিশেষ গুণকে বলা হয় *স্মৃতি*। আর যে সামর্থ্যের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের উপর বহু গ্রন্থ কেবল অধ্যয়ন করাই নয়, সেই সঙ্গে সেগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করা এবং প্রয়োজনে প্রয়োগ করা, তাকে বলা হয় *মেধা* এবং এটিও একটি বিভূতি। যে সামর্থ্যের দ্বারা অস্থিরতাকে দমন করা যায়, তাকে বলা হয় *ধৃতি*। আর কেউ যখন সম্পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন, তবুও বিনয়ী ও ভদ্র এবং কেউ যখন সুখ ও দুঃখ উভয় সময়ে ভারসাম্যতা রক্ষা করতে সক্ষম, তাঁর সেই ঐশ্বর্যকে বলা হয় *ক্ষমা*।

শ্লোক ৩৫

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥

বৃহৎসাম—বৃহৎসাম; **তথা**—ও; **সাম্নাম্**—সামবেদের মধ্যে; **গায়ত্রী**—গায়ত্রী মন্ত্র; **ছন্দসাম্**—ছন্দসমূহের মধ্যে; **অহম্**—আমি; **মাসানাম্**—মাসসমূহের মধ্যে; **মার্গশীর্ষঃ**—অগ্রহায়ণ; **অহম্**—আমি; **ঋতূনাম্**—সমস্ত ঋতুর মধ্যে; **কুসুমাকরঃ**—বসন্ত।

গীতার গান

সামবেদ মধ্যে আমি বৃহৎ সে সাম ।
ছন্দ যত তার মধ্যে গায়ত্রী সে নাম ॥
মাসগণে আমি হই সে অগ্রহায়ণ ।
বসন্ত নাম মোর মধ্যে ঋতুগণ ॥

অনুবাদ

সামবেদের মধ্যে আমি বৃহৎসাম এবং ছন্দসমূহের মধ্যে আমি গায়ত্রী। মাসসমূহের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ এবং ঋতুদের মধ্যে আমি বসন্ত।

তাৎপর্য

ভগবান পূর্বেই বলেছেন যে, সমস্ত *বেদের* মধ্যে তিনি হচ্ছেন *সামবেদ*। *সামবেদ* বিভিন্ন দেবতাদের দ্বারা গীত অপূর্ব সুন্দর সঙ্গীতসমূহের দ্বারা সমৃদ্ধ। এই

সঙ্গীতগুলির একটিকে বলা হয় *বৃহৎসাম*, যার সুর অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত এবং মধ্যরাত্রে গীত হওয়ার রীতি।

সংস্কৃত ভাষায় কবিতাকে ছন্দোবদ্ধ করার কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে। ছন্দ ও মাত্রা আধুনিক কবিতার মতো খামখেয়ালীভাবে লেখা হয় না। সুসংবদ্ধ কবিতার মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্র হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, যা সুযোগ্য ব্রাহ্মণেরা গেয়ে থাকেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* গায়ত্রী মন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু গায়ত্রী মন্ত্রের মাধ্যমে ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়, তাই তা হচ্ছে ভগবানের প্রতীক। অধ্যাত্মমার্গে বিশেষভাবে উন্নত মানুষদের জন্যই গায়ত্রী মন্ত্র এবং কেউ যদি এই মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করেন, তবে তিনি ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করতে পারেন। গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতে হলে, প্রথমে জড়া প্রকৃতির সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির গুণ অর্জন করা প্রয়োজন। বৈদিক সভ্যতায় গায়ত্রী মন্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁকে ব্রহ্মের শব্দ অবতার বলে গণ্য করা হয়। ব্রহ্মা হচ্ছেন এর প্রবর্তক এবং এই মন্ত্র গুরু-শিষ্য পরম্পরায় তাঁর থেকে নেমে এসেছে।

সমস্ত মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাসকে বছরের শ্রেষ্ঠ সময় বলে গণ্য করা হয়। কারণ, ভারতবর্ষে এই সময়ে ক্ষেতের ফসল সংগ্রহ করা হয় এবং তাই জনসাধারণ সকলেই এই সময় গভীর সুখে মগ্ন থাকে। অবশ্যই বসন্ত এমনই একটি ঋতু যে, সকলেই তা পছন্দ করে, কারণ বসন্ত ঋতু নাতিশীতোষ্ণ এবং এই সময় গাছপালা ফুলে-ফলে শোভিত হয়। বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহকে স্মরণ করে অনেক মহোৎসব উদযাপিত হয়; তাই বসন্ত ঋতুকে সর্বাপেক্ষা আনন্দোজ্জ্বল ঋতু বলে গণ্য করা হয় এবং এই ঋতুরাজ বসন্ত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি।

শ্লোক ৩৬

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩৬ ॥

দ্যূতম্—দ্যূতক্রীড়া; **ছলয়তাম্**—বঞ্চনাকারীদের মধ্যে; **অস্মি**—হই; **তেজঃ**—তেজ; **তেজস্বিনাম্**—তেজস্বীদের মধ্যে; **অহম্**—আমি; **জয়ঃ**—জয়; **অস্মি**—হই; **ব্যবসায়ঃ**—উদ্যম; **অস্মি**—হই; **সত্ত্বম্**—বল; **সত্ত্ববতাম্**—বলবানদের মধ্যে; **অহম্**—আমি।

গীতার গান

বঞ্চনার মধ্যে আমি হই দ্যূতক্রীড়া ।
তেজস্বীগণের মধ্যে আমি তেজবীরা ॥

উদ্যমের মধ্যে হই আমি সে বিজয় ।
তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমি হই ব্যবসায় ॥
বলবান মধ্যে আমি হয়ে থাকি বল ।
আমার বিভূতি এই বুঝহ সকল ॥

অনুবাদ

সমস্ত বঞ্চনাকারীদের মধ্যে আমি দ্যূতক্রীড়া এবং তেজস্বীদের মধ্যে আমি তেজ। আমি বিজয়, আমি উদ্যম এবং বলবানদের মধ্যে আমি বল।

তাৎপর্য

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে নানা রকম প্রবঞ্চনাকারী আছে। সব রকম প্রবঞ্চনার মধ্যে দ্যূতক্রীড়া হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, তাই তা শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। পরমেশ্বর রূপে শ্রীকৃষ্ণ যে কোন মানুষের থেকেও অনেক বড় প্রবঞ্চক হতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ যদি কাউকে প্রতারণা করতে চান, তা হলে কেউই তাঁকে এড়াতে পারেন না। ভগবান সব ব্যাপারেই শ্রেষ্ঠ, এমন কি প্রতারণাতেও।

বিজয়ীদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন জয়। তিনি হচ্ছেন তেজস্বীর তেজ। উদ্যমী ও অধ্যবসায়ীদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন সর্বোৎকৃষ্ট উদ্যমী ও অধ্যবসায়ী। দুঃসাহসীদের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ দুঃসাহসী এবং বলবানের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ বলশালী। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে প্রকট ছিলেন, তখন তাঁর মতো শক্তিশালী কেউই ছিল না। এমন কি তাঁর শৈশবেই তিনি গিরি-গোবর্ধন তুলেছিলেন। তাঁর মতো প্রবঞ্চক কেউ ছিল না, তাঁর মতো তেজস্বী কেউ ছিল না, তাঁর মতো বিজয়ী কেউ ছিল না, তাঁর মতো উদ্যমী কেউ ছিল না এবং তাঁর মতো বলবানও কেউ ছিল না।

শ্লোক ৩৭

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥ ৩৭ ॥

বৃষ্ণীনাম্—বৃষ্ণিদের মধ্যে; **বাসুদেবঃ**—দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ; **অস্মি**—হই; **পাণ্ডবানাম্**—পাণ্ডবদের মধ্যে; **ধনঞ্জয়ঃ**—অর্জুন; **মুনীনাম্**—মুনীদের মধ্যে; **অপি**—

ও; **অহম্**—আমি; **ব্যাসঃ**—ব্যাসদেব; **কবীনাম্**—মহান চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে; **উশনাঃ**—শুক্র; **কবিঃ**—কবি।

গীতার গান

বৃষ্ণিদের মধ্যে আমি বাসুদেব হই ।
পাণ্ডবের মধ্যে আমি জান ধনঞ্জয় ॥
মুনিদের মধ্যে ব্যাস কবি শুক্রাচার্য ।
সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমি সেই আর্য ॥

অনুবাদ

বৃষ্ণিদের মধ্যে আমি বাসুদেব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে আমি অর্জুন। মুনিদের মধ্যে আমি ব্যাস এবং কবিদের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন আদি পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তার সাক্ষাৎ কায়ব্যূহ হচ্ছেন বাসুদেব। বাসুদেবের অর্থ হচ্ছে বসুদেবের সন্তান। শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব উভয়েই বসুদেবের সন্তানরূপে অবতরণ করেন।

পাণ্ডুপুত্রদের মধ্যে অর্জুন ধনঞ্জয়রূপে বিখ্যাত। তিনি হচ্ছেন নরশ্রেষ্ঠ, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। বৈদিক জ্ঞানে পারদর্শী মুনি অথবা পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীল ব্যাসদেব হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ কলিযুগের জনসাধারণকে বৈদিক জ্ঞান দান করার মানসে তিনি বেদকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাসদেব আবার শ্রীকৃষ্ণের অবতার; তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। কবি তাঁদের বলা হয়, যাঁরা যে কোন বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিন্তা করতে সক্ষম। কবিদের মধ্যে দৈত্যদের কুলগুরু উশনা বা শুক্রাচার্য হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ। ইনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ। এভাবেই শুক্রাচার্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের বিভূতির আর এক প্রতিনিধি।

শ্লোক ৩৮

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮ ॥

দণ্ডঃ—দণ্ড; **দময়তাম্**—দমনকারীদের মধ্যে; **অস্মি**—হই; **নীতিঃ**—নীতি; **অস্মি**—হই; **জিগীষতাম্**—জয় অভিলাষকারীদের; **মৌনম্**—মৌন; **চ**—এবং; **এব**—ও; **অস্মি**—হই; **গুহ্যানাম্**—গোপনীয় বিষয়-সমূহের মধ্যে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **জ্ঞানবতাম্**—জ্ঞানবানদের মধ্যে; **অহম্**—আমি।

গীতার গান

শাসনকর্তার সেই আমি হই দণ্ড ।
ন্যায়াধীশগণ মধ্যে আমি সেই ন্যায্য ॥
গুপ্ত যে বিষয় হয় তার মধ্যে মৌন ।
জ্ঞানীদের আমি জ্ঞান আর সব গৌণ ॥

অনুবাদ

দমনকারীদের মধ্যে আমি দণ্ড এবং জয় অভিলাষীদের মধ্যে আমি নীতি। গুহ্য ধর্মের মধ্যে আমি মৌন এবং জ্ঞানবানদের মধ্যে আমিই জ্ঞান।

তাৎপর্য

শাসন করার যে দণ্ড তা শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বিজয় লাভের প্রচেষ্টা করে, তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয় হচ্ছে নৈতিকতা। শ্রবণ, মনন ও ধ্যান আদি গুপ্ত কার্যকলাপের মধ্যে মৌনতাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মৌনতার মাধ্যমে অতি শীঘ্রই পারমার্থিক উন্নতি লাভ করা যায়। জ্ঞানী তাঁকে বলা হয়, যিনি জড় ও চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন অর্থাৎ যিনি ভগবানের উৎকৃষ্টা ও নিকৃষ্টা প্রকৃতির পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন। এই জ্ঞান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং।

শ্লোক ৩৯

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন ।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯ ॥

যৎ—যা; **চ**—ও; **অপি**—হতে পারে; **সর্বভূতানাম্**—সর্বভূতের; **বীজম্**—বীজ; **তৎ**—তা; **অহম্**—আমি; **অর্জুন**—হে অর্জুন; **ন**—না; **তৎ**—তা; **অস্তি**—হয়; **বিনা**—ব্যতীত; **যৎ**—যা; **স্যাৎ**—অস্তিত্ব, **ময়া**—আমাকে; **ভূতম্**—বস্তু; **চরাচরম্**—স্থাবর ও জঙ্গম।

গীতার গান

সর্বভূতপ্রবাহ বীজ আমি সে অর্জুন ।
আমি বিনা চরাচর সকল অগুণ ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! যা সর্বভূতের বীজস্বরূপ তাও আমি, যেহেতু আমাকে ছাড়া স্থাবর ও জঙ্গম কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

তাৎপর্য

সব কিছুরই একটি কারণ আছে এবং সেই কারণ বা প্রকাশের বীজ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বিনা কোন কিছুই অস্তিত্ব থাকতে পারে না; তাই তাঁকে বলা হয় সর্বশক্তিমান। তাঁর শক্তি বিনা স্থাবর ও জঙ্গম কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে যা স্থিত নয়, তাকে বলা হয় *মায়া*, অর্থাৎ 'যা নয়'।

শ্লোক ৪০

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০ ॥

ন—না; **অন্তঃ**—সীমা; **অস্তি**—হয়; **মম**—আমার; **দিব্যানাম্**—দিব্য; **বিভূতীনাম্**—বিভূতি-সমূহের; **পরন্তপ**—হে পরন্তপ; **এষঃ**—এই সমস্ত; **তু**—কিন্তু; **উদ্দেশতঃ**—সংক্ষেপে; **প্রোক্তঃ**—বলা হল; **বিভূতেঃ**—বিভূতির; **বিস্তরঃ**—বিস্তার; **ময়া**—আমার দ্বারা।

গীতার গান

আমার বিভূতি দিব্য নাহি তার অন্ত ।
সংক্ষেপে বলিনু সব শুন হে তপন্ত ॥

অনুবাদ

হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতি-সমূহের অন্ত নেই। আমি এই সমস্ত বিভূতির বিস্তার সংক্ষেপে বললাম।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যদিও ভগবানের বিভূতি ও শক্তি নানাভাবে উপলব্ধি করা যায়, তবুও তাঁর বিভূতির কোন অন্ত নেই; তাই ভগবানের সমস্ত বিভূতি ও শক্তি বর্ণনা করা যায় না। অর্জুনের কৌতূহল নিবারণ করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তাঁর অনন্ত বৈভবের কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দিলেন।

শ্লোক ৪১

যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৪১ ॥

যৎ যৎ—যে যে; **বিভূতিমৎ**—ঐশ্বর্যযুক্ত; **সত্ত্বম্**—অস্তিত্ব; **শ্রীমৎ**—সুন্দর; **ঊর্জিতম্**—মহিমান্বিত; **এব**—অবশ্যই; **বা**—অথবা; **তৎ তৎ**—সেই সমস্ত; **এব**—অবশ্যই; **অবগচ্ছ**—অবগত হও; **ত্বম্**—তুমি; **মম**—আমার; **তেজঃ**—তেজের; **অংশ**—অংশ; **সম্ভবম্**—সম্ভূত।

গীতার গান

যেখানে বিভূতি সত্তা ঐশ্বর্যাদি বল ।
সে সব আমার কৃপা জানিবে সকল ॥
আমার তেজাংশ দ্বারা হয় সে সম্ভব ।
সেখানে আমার সত্তা কর অনুভব ॥

অনুবাদ

ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রী-সম্পন্ন ও বল-প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে সবই আমার তেজাংশসম্ভূত বলে জানবে।

তাৎপর্য

এই জড় জগতেই হোক বা অপ্রাকৃত জগতেই হোক, যা কিছু মহিমান্বিত বা সুন্দর তা সবই শ্রীকৃষ্ণের বিভূতির নিতান্তই আংশিক প্রকাশ মাত্র। যা কিছুই অস্বাভাবিক ঐশ্বর্যমণ্ডিত, তা শ্রীকৃষ্ণের বিভূতির প্রতীক বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ৪২

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ ॥

অথবা—অথবা; **বহুনা**—বহু; **এতেন**—এই প্রকার; **কিম্**—কি; **জ্ঞাতেন**—জ্ঞান দ্বারা; **তব**—তোমার; **অর্জুন**—হে অর্জুন; **বিষ্টভ্য**—ব্যাপ্ত হয়ে; **অহম্**—আমি; **ইদম্**—এই; **কৃৎস্নম্**—সমগ্র; **এক**—এক; **অংশেন**—অংশের দ্বারা; **স্থিতঃ**—অবস্থিত; **জগৎ**—জগৎ।

গীতার গান

অধিক কি বলি অর্জুন সংক্ষেপে শুন ।
আমি সে প্রবিষ্ট হই সর্বশক্তি গুণ ॥
জগতে সর্বত্র থাকি আমার একাংশে ।
সত্যবৎ জড় মায়া তাই সে প্রকাশে ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! অথবা এই প্রকার বহু জ্ঞানের দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন? আমি আমার এক অংশের দ্বারা সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত হয়ে অবস্থিত আছি।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান সর্বভূতে পরমাত্মারূপে প্রবিষ্ট হয়ে এই জড় জগতের সর্বত্র বিরাজমান। ভগবান এখানে অর্জুনকে বলেছেন যে, এই জগতের কোন কিছুরই নিজস্ব কোন ঐশ্বর্য নেই, তাই তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সম্বন্ধে অবগত হয়ে কোন লাভ নেই। আমাদের জানতে হবে যে, সব কিছুরই অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে সেগুলির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছেন। মহত্তম জীব ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ক্ষুদ্র পিঁপড়ে পর্যন্ত সকলেরই অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে, কারণ ভগবান তাদের সকলের অন্তরে বিরাজমান এবং তিনিই তাদের প্রতিপালন করছেন।

অনেকে প্রচার করে থাকে যে, যে-কোন দেব-দেবীর আরাধনা করে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে বা পরম লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে। কিন্তু এখানে দেব-দেবীদের পূজা করতে সম্পূর্ণরূপে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, কারণ ব্রহ্মা ও শিবের মতো শ্রেষ্ঠ দেবতারাও হচ্ছেন ভগবানের অনন্ত বিভূতির অংশ মাত্র। ভগবানই হচ্ছেন

সকলের উৎস এবং তাঁর থেকে আর কেউ শ্রেষ্ঠ নয়। তিনি 'অসমোর্ধ্ব' অর্থাৎ তাঁর সমান অথবা তাঁর থেকে বড় আর কেউ নেই। *পদ্ম পুরাণে* বলা হয়েছে যে, যদি কেউ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেব-দেবীর সমান বলে মনে করে—এমন কি ভগবানকে যদি ব্রহ্মা, শিব, দুর্গা, কালী আদি শ্রেষ্ঠ দেব-দেবীদের সমান বলে মনে করে, তা হলে তখনই সে ভগবৎ-বিদ্বেষী নাস্তিকে পরিণত হয়। কিন্তু, যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণের শক্তির বিস্তার ও বিভূতির বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করি, তা হলে আমরা নিঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব উপলব্ধি করতে পারি এবং তার ফলে অনন্য ভক্তি সহকারে তাঁর সেবায় মনকে আমরা স্থির করতে পারি। তাঁর অংশ-প্রকাশরূপে সর্বভূতে বিরাজমান পরমাত্মার বিস্তারের দ্বারা ভগবান সর্বব্যাপ্ত। শুদ্ধ ভক্তেরা তাই সর্বতোভাবে ভগবৎ-সেবার মাধ্যমে তাঁদের মনকে কৃষ্ণচেতনায় কেন্দ্রীভূত করেন। তাই, তাঁরা সর্বদাই অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত থাকেন। ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের অষ্টম থেকে একাদশ শ্লোকে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটিই হচ্ছে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির পদ্ধতি। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গলাভ করে ভক্তিযোগের পূর্ণতা কিভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তা বিশদভাবে এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ থেকে গুরু-পরম্পরা ধারায় অধিষ্ঠিত একজন মহান আচার্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ এই অধ্যায়ের তাৎপর্যের উপসংহারে বলেছেন—

যচ্ছক্তিলেশাৎ সূর্যাদ্যা ভবন্ত্যত্যুগ্রতেজসঃ ।
যদংশেন ধৃতং বিশ্বং স কৃষ্ণো দশমেঽর্চ্যতে ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বলবান শক্তি থেকে এমন কি শক্তিশালী সূর্য তার শক্তি লাভ করে এবং শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশের দ্বারা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিপালিত হয়। সেই কারণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আরাধ্য।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—পরব্রহ্মের ঐশ্বর্য বিষয়ক 'বিভূতি-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; **মদনুগ্রহায়**—আমার প্রতি অনুগ্রহ করে; **পরমম্**—পরম; **গুহ্যম্**—গোপনীয়; **অধ্যাত্ম**—অধ্যাত্ম; **সংজ্ঞিতম্**—বিষয়ক; **যৎ**—যে; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **উক্তম্**—উক্ত হয়েছে; **বচঃ**—বাক্য; **তেন**—তার দ্বারা; **মোহঃ**—মোহ; **অয়ম্**—এই; **বিগতঃ**—দূর হয়েছে; **মম**—আমার।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

অনুগ্রহ করি মোরে শুনাইলে যাহা ।
মোহ নষ্ট হইয়াছে শুনি তত্ত্ব তাহা ॥
সেই সে অধ্যাত্ম তত্ত্ব অতি গুহ্যতম ।
বিগত সন্দেহ হল যত ছিল মম ।

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—আমার প্রতি অনুগ্রহ করে তুমি যে অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পরম গুহ্য উপদেশ আমাকে দিয়েছ, তার দ্বারা আমার এই মোহ দূর হয়েছে।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব কারণের পরম কারণ, তা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। সমগ্র জড় জগতের প্রকাশ হয় মহাবিষ্ণু থেকে এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সেই মহাবিষ্ণুরও উৎস। শ্রীকৃষ্ণ অবতার নন; তিনি হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী। সেই কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পূর্ণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখানে অর্জুন বলেছেন, তাঁর মোহ নিরসন হয়েছে। অর্থাৎ, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করছেন না, তাঁর বন্ধু বলেও মনে করছেন না; তিনি তাঁকে সমস্ত কিছুর পরম উৎসরূপে দর্শন করছেন। অর্জুন পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যে তিনি বন্ধুরূপে পেয়েছেন, তা উপলব্ধি করে পরম আনন্দ আস্বাদন করছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি এটিও ভাবছেন যে, তিনি তো শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান, সর্ব কারণের কারণরূপে জানতে পারলেন, কিন্তু অন্যেরা তো তাঁকে সেভাবে গ্রহণ নাও করতে পারে। তাই শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য, সকলকেই শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে জানাবার জন্য এই অধ্যায়ে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করছেন যাতে তিনি তাঁর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ অতি ভয়ংকর এবং সেই রূপ দর্শনে সকলেই ভীত হয়—যেমন অর্জুন হয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এতই দয়াময় যে, সেই ভয়ংকর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করার পর তিনি আবার তাঁর আদিরূপ—দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপে নিজেকে প্রকাশিত করলেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে তত্ত্বজ্ঞান দান করলেন, অর্জুন তা শাশ্বত সত্যরূপে গ্রহণ করলেন। অর্জুনের মঙ্গলের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সব কিছু শোনালেন এবং অর্জুনও তা শ্রীকৃষ্ণের কৃপারূপে গ্রহণ করলেন। তাঁর মনে আর কোন সংশয় রইল না যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ এবং পরমাত্মা রূপে তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান।

শ্লোক ২

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া ।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

ভব—উৎপত্তি; **অপ্যয়ৌ**—লয়; **হি**—অবশ্যই; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবের; **শ্রুতৌ**—শ্রুত হয়েছে; **বিস্তরশঃ**—বিস্তারিতভাবে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **ত্বত্তঃ**—তোমার থেকে; **কমলপত্রাক্ষ**—হে পদ্মপলাশলোচন; **মাহাত্ম্যম্**—মাহাত্ম্য; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **অব্যয়ম্**—অব্যয়।

গীতার গান

দুই তত্ত্ব শুনিলাম কমল পত্রাক্ষ ।
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় আর নিত্য তত্ত্ব ॥
এই সৃষ্টিমধ্যে যথা তুমি হে পরমেশ্বর ।
নিজ রূপ প্রকটিয়া প্রকাশ বিস্তর ॥

অনুবাদ

হে পদ্মপলাশলোচন! সর্বভূতের উৎপত্তি ও প্রলয় তোমার থেকেই হয় এবং তোমার কাছ থেকেই আমি তোমার অব্যয় মাহাত্ম্য অবগত হলাম।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিশ্চিতভাবে জানিয়েছেন যে, *অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা* —"আমি এই সমগ্র জড়-জাগতিক প্রকাশের সৃষ্টির ও লয়ের উৎস, তাই আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে *কমলপত্রাক্ষ* বলে সম্বোধন করেছেন (কারণ শ্রীকৃষ্ণের চোখ দুটি পদ্মফুলের পাপড়ির মতো)। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম থেকে অর্জুন সেই সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে শ্রবণ করেছেন। অর্জুন আরও জানতে পারেন যে, এই বিশ্ব-চরাচরের সব কিছুরই প্রকাশ এবং লয়ের পরম কারণ হওয়া সত্ত্বেও ভগবান সব কিছু থেকে পৃথক। নবম অধ্যায়ে ভগবান বলেছেন, যদিও তিনি সর্বব্যাপক, কিন্তু তবুও তিনি ব্যক্তিগতভাবে সর্বত্রই বিরাজমান থাকেন না। সেটিই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য যোগৈশ্বর্য, যা অর্জুন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে স্বীকার করেছেন।

শ্লোক ৩

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥

এবম্—এরূপ; এতৎ—এই; যথা—যথাযথ; আত্থ—বলেছ; ত্বম্—তুমি; আত্মানম্—নিজেকে; পরমেশ্বর—হে পরমেশ্বর ভগবান; দ্রষ্টুম্—দেখতে; ইচ্ছামি—ইচ্ছা করি; তে—তোমার; রূপম্—রূপ; ঐশ্বরম্—ঐশ্বর্যময়; পুরুষোত্তম—হে পুরুষোত্তম।

গীতার গান

পুরুষোত্তম সে যদি দেখাও আমাকে।
ইচ্ছা মোর দেখিবার যদি শক্তি থাকে ॥

অনুবাদ

হে পরমেশ্বর! তোমার সম্বন্ধে যেরূপ বলেছ, যদিও আমার সম্মুখে তোমাকে সেই রূপেই দেখতে পাচ্ছি, তবুও হে পুরুষোত্তম! তুমি যেভাবে এই বিশ্বে প্রবেশ করেছ, আমি তোমার সেই ঐশ্বর্যময় রূপ দেখতে ইচ্ছা করি।

তাৎপর্য

ভগবান বলছেন যে, এই জড় জগতে তিনি স্বাংশ প্রকাশরূপে প্রবিষ্ট হয়েছেন বলেই এই জগতের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে এবং তা বিদ্যমান রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনে অর্জুন অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কিন্তু অর্জুনের মনে সংশয় দেখা দিল যে, আগামী দিনের মানুষেরা হয়ত শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করতে পারে, তাই তাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন করবার জন্য তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখতে চাইলেন। তিনি দেখতে চাইলেন, এই জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে এই জগতের অভ্যন্তরে সমস্ত কর্ম পরিচালনা করছেন। এখানে অর্জুন যে পরমেশ্বর ভগবানকে *পুরুষোত্তম* বলে সম্বোধন করেছেন, সেটিও তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তাই তিনি অর্জুনের অন্তরেও বিরাজমান। সুতরাং, অর্জুনের হৃদয়ের সমস্ত বাসনার কথা তিনি জানতেন এবং তিনি এটিও জানতেন যে, তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করার কোন বিশেষ বাসনা অর্জুনের ছিল না। কারণ, তাঁর দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করেই অর্জুন পূর্ণমাত্রায় তৃপ্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে, অন্যদের হৃদয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করবার জন্যই অর্জুন তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করতে চাইছিলেন। ভগবানের ভগবত্তা সম্বন্ধে অর্জুনের আর কোন রকম সন্দেহ ছিল না। তাই, তাঁর নিজের মনের সন্দেহ নিরসন করার জন্য তিনি ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করতে চাননি। শ্রীকৃষ্ণ আরও জানতেন যে, অর্জুন তাঁর বিশ্বরূপ

দর্শন করতে চাইছিলেন একটি নীতির প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। কারণ, পরবর্তীকালে বহু ভণ্ড নিজেদেরকে ভগবানের অবতার বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করবে। সুতরা, মানুষকে সাবধান করতে হবে। তাই অর্জুন শিক্ষা দিয়ে গেলেন, কেউ যদি নিজেদেরকে ভগবান বলে প্রতিপন্ন করতে চায়, তা হলে সেই দাবির যথার্থতা সুষ্ঠুভাবে প্রতিপন্ন করবার জন্য তাকে বিশ্বরূপ দেখাতে হবে।

শ্লোক ৪

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪ ॥

মন্যসে—মনে কর; যদি—যদি; তৎ—তা; শক্যম্—সমর্থ; ময়া—আমার দ্বারা; দ্রষ্টুম্—দেখতে; ইতি—এভাবে; প্রভো—হে প্রভু; যোগেশ্বর—হে যোগেশ্বর; ততঃ—তারপর; মে—আমাকে; ত্বম্—তুমি; দর্শয়—দেখাও; আত্মানম্—তোমার স্বরূপ; অব্যয়ম্—নিত্য।

গীতার গান

অতএব তুমি যদি যোগ্য মনে কর।
দেখিবারে বিশ্বরূপ তোমার বিস্তর ॥
যোগেশ্বর তাহা তুমি দেখাও আমারে।
নিবেদন এই মোর কহিনু তোমারে ॥

অনুবাদ

হে প্রভু! তুমি যদি মনে কর যে, আমি তোমার এই বিশ্বরূপ দর্শন করার যোগ্য, তা হলে হে যোগেশ্বর! আমাকে তোমার সেই নিত্যস্বরূপ দেখাও।

তাৎপর্য

আমাদের জানা উচিত যে, জড় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায় না, তাঁর কথা শোনা যায় না, তাঁকে জানা যায় না অথবা তাঁকে উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু প্রথম থেকেই প্রেমভক্তি সহকারে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় নিয়োজিত হলে, তবেই ভগবানকে দর্শন করবার দিব্য দৃষ্টি আমরা লাভ করতে পারি। প্রতিটি জীবই হচ্ছে কেবলমাত্র চিন্ময় স্ফুলিঙ্গ; তাই তার পক্ষে পরমেশ্বর

ভগবানকে দর্শন করা বা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। অর্জুন ছিলেন ভগবদ্ভক্ত। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবগত ছিলেন। তাই, তিনি ভগবানকে উপলব্ধি করার ব্যাপারে তাঁর কল্পনা শক্তির উপর নির্ভর না করে, ভগবানের কাছে জীবরূপে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করেছেন। অর্জুন জানতেন যে, সীমিত জীবের পক্ষে অনন্ত-অসীম ভগবানকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। অসীম যখন কৃপা করে নিজেকে প্রকাশ করেন, তখনই কেবল অসীমের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়। *যোগেশ্বর* শব্দটিও এখানে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ভগবান অচিন্ত্য শক্তির অধীশ্বর। যদিও তিনি অসীম-অনন্ত, তবুও তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন। তাই, অর্জুন এখানে ভগবানের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আদেশ দিচ্ছেন না। অনন্য ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার মাধ্যমে নিজেকে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পণ না করলে শ্রীকৃষ্ণ কখনই নিজেকে প্রকাশ করেন না। এভাবেই যাঁরা নিজেদের মানসিক চিন্তাশক্তির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আছেন, তাঁদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা কখনই সম্ভব নয়।

শ্লোক ৫

শ্রীভগবানুবাচ

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **পশ্য**—দেখ; **মে**—আমার; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **রূপাণি**—রূপসকল; **শতশঃ**—শত শত; **অথ**—ও; **সহস্রশঃ**—সহস্র সহস্র; **নানাবিধানি**—নানাবিধ; **দিব্যানি**—দিব্য; **নানা**—বিভিন্ন; **বর্ণ**—বর্ণ; **আকৃতীনি**—আকৃতি; **চ**—ও।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

হে পার্থ আমার রূপ সহস্র সে শত ।
এই দেখ নানাবিধ দিব্য ভাল মত ॥
অনেক আকৃতি বর্ণ করহ প্রত্যক্ষ ।
সকল আমার সেই হয় যোগৈশ্বর্য ॥

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—হে পার্থ! নানা বর্ণ ও নানা আকৃতি-বিশিষ্ট শত শত ও সহস্র সহস্র আমার বিভিন্ন দিব্য রূপসমূহ দর্শন কর।

তাৎপর্য

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন। ভগবানের এই রূপ যদিও দিব্য, তবুও তাঁর প্রকাশ হয় এই জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে এবং তাই তা এই জড় জগতের কালের উপর নির্ভরশীল। জড়া প্রকৃতির যেমন প্রকট হয় এবং অপ্রকট হয়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের এই বিশ্বরূপেরও প্রকট হয় এবং অপ্রকট হয়। শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য প্রকাশের মতো তাঁর এই রূপ পরা প্রকৃতিতে নিত্য বিরাজমান নয়। ভগবানের ভক্তেরা বিশ্বরূপ দর্শনে উৎসাহী নন। কিন্তু অর্জুন যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকে এই রূপে দেখতে চেয়েছিলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ সেই রূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন। কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করা সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই বিশ্বরূপ দর্শন করবার শক্তি দেন, তখনই কেবল তাঁর এই রূপ দর্শন করা যায়।

শ্লোক ৬

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা ।
বহূন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্যাশ্চর্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥

পশ্য—দেখ; **আদিত্যান্**—অদিতির দ্বাদশ পুত্র; **বসূন্**—অষ্টবসু; **রুদ্রান্**—একাদশ রুদ্র; **অশ্বিনৌ**—অশ্বিনীকুমারদ্বয়; **মরুতঃ**—ঊনপঞ্চাশ মরুত (বায়ুর দেবতা); **তথা**—এবং; **বহূনি**—বহু; **অদৃষ্ট**—যা তুমি দেখনি; **পূর্বাণি**—পূর্বে; **পশ্য**—দেখ; **আশ্চর্যাণি**—আশ্চর্য; **ভারত**—হে ভারতশ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

আদিত্যাদি বসু রুদ্র অশ্বিনী মরুত ।
অদৃষ্ট অপূর্ব সব আশ্চর্য ভারত ॥

অনুবাদ

হে ভারত! দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঊনপঞ্চাশ মরুত এবং অনেক অদৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য রূপ দেখ।

তাৎপর্য

এমন কি যদিও অর্জুন ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং বিশেষ জ্ঞানী পুরুষ, তবুও তাঁর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সব কিছু জানা সম্ভব ছিল না। এখানে বলা হয়েছে যে, মানুষেরা ভগবানের এই রূপ এবং প্রকাশ সম্বন্ধে আগে কখনও শোনেনি অথবা জানেনি। এখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সেই বিস্ময়কর রূপসমূহ প্রকাশ করেছেন।

শ্লোক ৭

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্ ।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥

ইহ—এই; **একস্থম্**—একত্রে অবস্থিত; জগৎ—বিশ্ব; **কৃৎস্নম্**—সমগ্র; **পশ্য**—দেখ; অদ্য—এক্ষণে; **স**—সহ; **চর**—জঙ্গম; **অচরম্**—স্থাবর; **মম**—আমার; **দেহে**—শরীরে; **গুড়াকেশ**—হে অর্জুন; **যৎ**—যা কিছু; **চ**—ও; **অন্যৎ**—অন্য; **দ্রষ্টুম্**—দেখতে; **ইচ্ছসি**—ইচ্ছা কর।

গীতার গান

চরাচর বিশ্বরূপ আমার ভিতর ।
দেখ আজ একস্থানে সব পরাপর ॥
গুড়াকেশ আমি কৃষ্ণ পরাৎপরতত্ত্ব ।
দেখ তুমি ভাল করি আমার মহত্ত্ব ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! আমার এই বিরাট শরীরে একত্রে অবস্থিত সমগ্র স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব এবং অন্য যা কিছু দেখতে ইচ্ছা কর, তা এক্ষণে দর্শন কর।

তাৎপর্য

এক জায়গায় বসে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কি সর্বশ্রেষ্ঠ উন্নত বৈজ্ঞানিকেরাও এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য অংশে কোথায় কি হচ্ছে তা দেখতে পারেন না। কিন্তু অর্জুনের মতো ভক্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যে কোনও অংশে যা কিছু বিদ্যমান সবই দেখতে পান। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সব কিছু যাতে দেখতে পারেন, সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে শক্তি প্রদান করেছেন। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ফলে অর্জুন সব কিছু দেখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা ।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮ ॥

ন—না; **তু**—কিন্তু; **মাম্**—আমাকে; **শক্যসে**—সক্ষম হবে; **দ্রষ্টুম্**—দেখতে; অনেন—এই; **এব**—অবশ্যই; **স্বচক্ষুষা**—তোমার নিজের চক্ষুর দ্বারা; **দিব্যম্**—দিব্য; **দদামি**—প্রদান করছি; **তে**—তোমাকে; **চক্ষুঃ**—চক্ষু; **পশ্য**—দেখ; **মে**—আমার; **যোগমৈশ্বরম্**—অচিন্ত্য যোগশক্তি।

গীতার গান

তুমি শুদ্ধ ভক্ত মোর নহে প্রাকৃত দর্শন ।
অতএব দিব্যচক্ষু করি তোমারে অর্পণ ॥
দিব্যচক্ষু সোপাধিক কিন্তু স্থূল নহে ।
অপরোক্ষ অনুভূতি সকলে সে কহে ॥

অনুবাদ

কিন্তু তুমি তোমার বর্তমান চক্ষুর দ্বারা আমাকে দর্শন করতে সক্ষম হবে না। তাই, আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করছি। তুমি আমার অচিন্ত্য যোগৈশ্বর্য দর্শন কর।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপ ছাড়া আর অন্য কোন রূপ ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত দর্শন করতে চান না। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করতে হয় এবং ভক্ত তাঁর মনের দ্বারা দর্শন করেন না, করেন দিব্য দৃষ্টির মাধ্যমে। ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করার জন্য অর্জুনকে তাঁর মনোবৃত্তি পরিবর্তন করার কথা বলা হয়নি, তাঁর দৃষ্টির পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়; সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হবে। তবুও অর্জুন যেহেতু

তা দেখতে চেয়েছিলেন, তাই ভগবান তাঁর সেই রূপ দর্শনের জন্য যে দিব্য চক্ষুর প্রয়োজন, তা তাঁকে দান করেছিলেন।

যে সমস্ত ভগবদ্ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অপ্রাকৃত সম্পর্কে যুক্ত হয়েছেন, তাঁরা ভগবানের ঐশ্বর্যের দ্বারা আকৃষ্ট না হয়ে ভগবানের প্রেমময় মাধুর্য দ্বারা আকৃষ্ট হন। শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত সখা, বান্ধবী, পিতা-মাতা, তাঁরা কেউই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর ঐশ্বর্য প্রদর্শন করতে বলেন না। তাঁরা শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেমে এতই মগ্ন যে, শ্রীকৃষ্ণ যে পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তাও তাঁরা জানেন না। মাধুর্যমণ্ডিত প্রেমের বিনিময়ের ফলে তাঁরা ভুলে যান যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে সমস্ত বালকেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করেন, তাঁরা সকলেই অত্যন্ত পুণ্যবান আত্মা এবং বহু জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফলে তাঁরা ভগবানের সঙ্গে খেলা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এই সমস্ত বালকেরা জানেন না যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের খেলার সাথী এক অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে মনে করেন। তাই, শুকদেব গোস্বামী এই শ্লোকটি বর্ণনা করেছেন—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন ।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥

"ইনিই হচ্ছেন পরম পুরুষ, যাঁকে মহান মুনি-ঋষিরা নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে জানেন, ভগবানের ভক্তেরা ভগবানরূপে জানেন এবং সাধারণ মানুষেরা জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি বলেই মনে করেন। এখন এই বালকেরা তাঁদের পূর্বজন্মে বহু পুণ্যকর্মের ফলে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে খেলা করছেন।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/১২/১১)

আসল কথা হচ্ছে যে, ভক্ত কখনও ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করবার আকাঙ্ক্ষা করেন না। কিন্তু অর্জুন ভগবানের সেই বিশ্বরূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন যাতে আগামী দিনের মানুষেরা বুঝতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ কেবল তত্ত্ব কথার মাধ্যমে তাঁর পরম ভগবত্তা প্রতিপন্ন করেননি, তিনি অর্জুনকে তাঁর সেই রূপও দেখিয়েছিলেন, যাতে কারও মনে আর কোন সংশয় না থাকে। অর্জুনকে এই সত্য প্রতিপন্ন করতেই হবে, কারণ তিনি এখন পরম্পরার সূচনা করছেন। যাঁরা পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানবার জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী এবং সেই জন্য যাঁরা অর্জুনের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন, তাঁদের জানা উচিত যে, শ্রীকৃষ্ণ কেবল তত্ত্বগতভাবে তাঁর পরমেশ্বরত্ব প্রমাণ করেননি, তিনি যে পরমেশ্বর তা তিনি বাস্তবিকই দেখিয়েছেন।

ভগবান তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করার শক্তি অর্জুনকে দান করেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, অর্জুন তাঁর সেই বিশ্বরূপ দর্শনে তেমন আগ্রহী ছিলেন না—সেই কথা পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ৯

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ—সঞ্জয় বললেন; **এবম্**—এভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **ততঃ**—তারপর; **রাজন্**—হে রাজন্; **মহাযোগেশ্বরঃ**—মহান যোগেশ্বর; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **দর্শয়ামাস**—দেখালেন; **পার্থায়**—অর্জুনকে; **পরমম্**—পরম; **রূপম্ ঐশ্বরম্**—বিশ্বরূপ।

গীতার গান

সঞ্জয় কহিলেন ঃ

অতঃপর শুন রাজা যোগেশ্বর হরি ।
পার্থকে ঐশ্বর্যরূপ দেখাল শ্রীহরি ॥

অনুবাদ

সঞ্জয় বললেন—হে রাজন্! এভাবেই বলে, মহান যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখালেন।

শ্লোক ১০-১১

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্ ।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০ ॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্ ।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১ ॥

অনেক—বহু; **বক্ত্র**—মুখ; **নয়নম্**—চক্ষু; **অনেক**—বহু; **অদ্ভুত**—অদ্ভুত; **দর্শনম্**—দর্শনীয় বস্তু; **অনেক**—বহু; **দিব্য**—দিব্য; **আভরণম্**—অলঙ্কার; **দিব্য**—দিব্য;

অনেক—অনেক; উদ্যত—উদ্যত; আয়ুধম্—অস্ত্র; দিব্য—দিব্য; মাল্য—মালা; অম্বরধরম্—বস্ত্র শোভিত; দিব্য—দিব্য; গন্ধ—গন্ধ; অনুলেপনম্—অনুলিপ্ত; সর্ব—সমস্ত; আশ্চর্যময়ম্—আশ্চর্যজনক; দেবম্—দ্যুতিময়; অনন্তম্—অন্তহীন; বিশ্বতোমুখম্—সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

গীতার গান

অনেক নয়ন বক্ত্র অদ্ভুত দর্শন ।
অনেক সে অস্ত্র আর দিব্য আবরণ ॥
দিব্য মালা গন্ধ আর চন্দন লেপন ।
সর্বই আশ্চর্য রূপ বিশ্বের সৃজন ॥

অনুবাদ

অর্জুন সেই বিশ্বরূপে অনেক মুখ, অনেক নেত্র ও অনেক অদ্ভুত দর্শনীয় বস্তু দেখলেন। সেই রূপ অসংখ্য দিব্য অলঙ্কারে সজ্জিত ছিল এবং অনেক উদ্যত দিব্য অস্ত্র ধারণ করেছিল। সেই বিশ্বরূপ দিব্য মালা ও দিব্য বস্ত্রে ভূষিত ছিল এবং তাঁর শরীর দিব্য গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত ছিল। সবই ছিল অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, জ্যোতির্ময়, অনন্ত ও সর্বব্যাপী।

তাৎপর্য

এই শ্লোক দুটিতে অনেক শব্দটির বহুবার ব্যবহারের দ্বারা বুঝতে পারা যায় যে, ভগবানের যে সব হস্ত, পদ, মুখ এবং অন্যান্য রূপের অভিপ্রকাশ অর্জুন দেখছিলেন, সেগুলির সংখ্যার কোন সীমা ছিল না। ভগবানের এই প্রকাশগুলি সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে পরিব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় অর্জুন এক জায়গায় বসে তা দর্শন করতে পেরেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই তা সম্ভব হয়েছিল।

শ্লোক ১২

দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা ।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥

দিবি—আকাশে; সূর্য—সূর্যের; সহস্রস্য—সহস্র; ভবেৎ—হয়; যুগপৎ—একসঙ্গে; উত্থিতা—সমুদিত; যদি—যদি; ভাঃ—প্রভা; সদৃশী—তুল্য; সা—তা; স্যাৎ—হতে পারে; ভাসঃ—প্রভা; তস্য—সেই; মহাত্মনঃ—মহাত্মা বিশ্বরূপের।

গীতার গান

যদি সূর্য দিনে উঠে সহস্র সহস্র ।
একত্রে কিরণ বুঝ অনন্ত অজস্র ॥
তাহা হলে কিছু তার অংশ অনুমান ।
অন্যথা সে দিব্য তেজ নহে‌ত প্রমাণ ॥

অনুবাদ

যদি আকাশে সহস্র সূর্যের প্রভা যুগপৎ উদিত হয়, তা হলে সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের প্রভার কিঞ্চিৎ তুল্য হতে পারে।

তাৎপর্য

অর্জুন যা দর্শন করেছিলেন তা ছিল অবর্ণনীয়, তবুও সঞ্জয় সেই মহান অভিপ্রকাশের মানসিক চিন্তাপ্রসূত ভাবচিত্রটি ধৃতরাষ্ট্রকে দেবার চেষ্টা করছেন। সঞ্জয় বা ধৃতরাষ্ট্র কেউই সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু ব্যাসদেবের কৃপার প্রভাবে সঞ্জয় দেখতে পাচ্ছিলেন সেখানে কি হচ্ছিল। ভগবানের এই রূপ দর্শন করার ক্ষমতা যাদের নেই, তাদের বোধগম্য করাবার জন্য সঞ্জয় তা একটি কাল্পনিক অবস্থার সঙ্গে তুলনা করছেন (যেমন, সহস্র সহস্র সূর্য)।

শ্লোক ১৩

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা ।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩ ॥

তত্র—সেখানে; একস্থম্—এক স্থানে অবস্থিত; জগৎ—বিশ্ব; কৃৎস্নম্—সমগ্র; প্রবিভক্তম্—বিভক্ত; অনেকধা—বহু প্রকার; অপশ্যৎ—দেখলেন; দেবদেবস্য—পরমেশ্বর ভগবানের; শরীরে—বিশ্বরূপে; পাণ্ডবঃ—অর্জুন; তদা—তখন।

গীতার গান

অর্জুন দেখিল তবে কৃষ্ণের শরীরে ।
একত্রে সে অবস্থান অনন্ত বিশ্বের ॥
এক এক সে বিভক্ত যথা যথা স্থান ।
সেই তেজ জ্যোতি মধ্যে বিধির বিধান ॥

অনুবাদ

তখন অর্জুন পরমেশ্বর ভগবানের বিশ্বরূপে নানাভাবে বিভক্ত সমগ্র জগৎ একত্রে অবস্থিত দেখলেন।

তাৎপর্য

তত্র ('সেখানে') কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, অর্জুন যখন বিশ্বরূপ দর্শন করেন, তখন অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই রথের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে অন্য আর কেউ শ্রীকৃষ্ণের এই রূপ দর্শন করতে পারেননি, কারণ শ্রীকৃষ্ণ কেবল অর্জুনকেই দিব্যদৃষ্টি দান করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শরীরে অর্জুন হাজার হাজার গ্রহলোক দর্শন করলেন। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র সমন্বিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে। তাদের মধ্যে কোনটি মাটি দিয়ে তৈরি, কোনটি সোনা দিয়ে তৈরি, কোনটি মণি-মাণিক্য দিয়ে তৈরি, কোনটি বিশাল, কোনটি আবার তত বিশাল নয়। রথে বসে অর্জুন সমস্ত কিছুই দর্শন করলেন। কিন্তু অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তখন যে কি হচ্ছিল, তা কেউ বুঝতে পারেনি।

শ্লোক ১৪

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥

ততঃ—তারপর; সঃ—তিনি; **বিস্ময়াবিষ্টঃ**—বিস্ময়ান্বিত; **হৃষ্টরোমা**—রোমাঞ্চিত হয়ে; **ধনঞ্জয়ঃ**—অর্জুন; **প্রণম্য**—প্রণাম করে; **শিরসা**—মস্তক দ্বারা; **দেবম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **কৃতাঞ্জলিঃ**—করজোড়ে; **অভাষত**—বললেন।

গীতার গান

ধনঞ্জয় হৃষ্টরাম দেখিয়া বিস্মিত ।
শিরসা প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে ॥

কহিতে লাগিল সেই সম্ভ্রমসহিত ।
দেবতার কাছে যথা যাচে নিজ হিত ॥

অনুবাদ

তারপর সেই অর্জুন বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হয়ে এবং অবনত মস্তকে ভগবানকে প্রণাম করে করজোড়ে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই দিব্য দর্শনের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সম্পর্কের আকস্মিক পরিবর্তন হয়। পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সম্পর্ক সখ্যভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু এখন, বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জুন গভীর শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম করে করজোড়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্তব করছেন। তিনি বিশ্বরূপের প্রশংসা করছেন। এভাবেই ভগবানের প্রতি অর্জুনের সম্পর্ক সখ্যের পরিবর্তে অদ্ভুতে পরিণত হয়। মহাভাগবতেরা শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত সম্পর্কের আধাররূপে দর্শন করেন। শাস্ত্রাদিতে বারোটি বিভিন্ন রসের কথা বলা হয়েছে এবং সব কয়টি শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বর্তমান। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, জীবের মধ্যে, দেবতাদের মধ্যে এবং ভগবানের সঙ্গে তাঁর ভক্তদের মধ্যে যে রসের আদান প্রদান হয়, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সেই সমস্ত রসের সমুদ্র-স্বরূপ।

এখানে অর্জুন অদ্ভুত রসের সম্পর্কের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। স্বভাবতই অর্জুন যদিও ছিলেন খুব ধীর, স্থির ও শান্ত, তবুও এই অদ্ভুত রসের প্রভাবে তিনি আত্মহারা হয়ে পড়েন। তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তিনি বারবার ভগবানকে প্রণাম করতে থাকেন। অবশ্য তিনি ভীত হননি। তিনি পরমেশ্বর ভগবানের অত্যাশ্চর্য ঐশ্বর্য দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন। ভগবানের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক সখ্যভাব বিস্ময়ের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে এবং তাই তিনি এই রকম আচরণ করতে শুরু করেন।

শ্লোক ১৫

অর্জুন উবাচ

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্ ।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থম্
ঋষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; **পশ্যামি**—দেখছি; **দেবান্**—সমস্ত দেবতাদেরকে; **তব**—তোমার; **দেব**—হে দেব; **দেহে**—দেহে; **সর্বান্**—সমস্ত; **তথা**—ও; **ভূত**—প্রাণীদেরকে; **বিশেষসঙ্ঘান্**—বিশেষভাবে সমবেত; **ব্রহ্মাণম্**—ব্রহ্মাকে; **ঈশম্**—শিবকে; **কমলাসনস্থম্**—কমলাসনে স্থিত; **ঋষীন্**—মহর্ষিদেরকে; **চ**—ও; **সর্বান্**—সমস্ত; **উরগান্**—সর্পদেরকে; **চ**—ও; **দিব্যান্**—দিব্য।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

হে দেব শরীরে তব, দেখিতেছি যে বৈভব,
নহে বাক্য মনের গোচর ।
সকল ভূতের সঙ্ঘ, সে এক বিশাল রঙ্গ,
একত্রিত সব চরাচর ॥
ব্রহ্মা যে কমলাসন, সকল উরগগণ,
অন্তর্যামী ভগবান ঈশ ।
যত ঋষিগণ হয়, কেহ সেথা বাকী নয়,
দিবি দেব যত জগদীশ ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হে দেব! তোমার দেহে দেবতাদের, বিবিধ প্রাণীদের, কমলাসনে স্থিত ব্রহ্মা, শিব, ঋষিদের ও দিব্য সর্পদেরকে দেখছি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই অর্জুন দর্শন করলেন। তাই তিনি ব্রহ্মাকে দর্শন করলেন, যিনি হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব। তিনি দিব্য সর্পকে দর্শন করলেন, ব্রহ্মাণ্ডের নিম্নদেশে যার উপর গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু শয়ন করেন। এই সর্পশয্যাকে বলা হয় বাসুকী। বাসুকী নামক অন্য সর্পও আছে। এভাবেই অর্জুন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে শুরু করে এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ শিখরে কমলাসনে স্থিত ব্রহ্মাকে দর্শন করলেন। অর্থাৎ, তাঁর রথের উপর বসেই অর্জুন আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব কিছুই দর্শন করলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রভাবেই কেবল তা সম্ভব হয়েছিল।

শ্লোক ১৬

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্ ।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥

অনেক—অনেক; **বাহু**—বাহু; **উদর**—উদর; **বক্ত্র**—মুখ; **নেত্রম্**—চক্ষু; **পশ্যামি**—দেখছি; **ত্বাম্**—তোমাকে; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **অনন্তরূপম্**—অনন্ত রূপ; **ন অন্তম্**—অন্তহীন; **ন মধ্যম্**—মধ্যহীন; **ন**—না; **পুনঃ**—পুনরায়; **তব**—তোমার; **আদিম্**—আদি; **পশ্যামি**—দেখছি; **বিশ্বেশ্বর**—হে জগদীশ্বর; **বিশ্বরূপ**—হে বিশ্বরূপ।

গীতার গান

অনেক বাহু উদর, অনেক নয়ন বক্ত্র,
দেখিতেছি অনন্ত সে রূপ ।
আদি অন্ত নাহি তার, বিশ্বেশ্বর যে অপার
অদ্ভুত যে দেখি বিশ্বরূপ ॥

অনুবাদ

হে বিশ্বেশ্বর! হে বিশ্বরূপ! তোমার দেহে অনেক বাহু, উদর, মুখ এবং সর্বত্র অনন্ত রূপ দেখছি। আমি তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তিনি হচ্ছেন অসীম অনন্ত। তাই, তাঁর মধ্যে সব কিছুই দর্শন করা যায়।

শ্লোক ১৭

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

কিরীটিনম্—কিরীটযুক্ত; **গদিনম্**—গদাধারী; **চক্রিণম্**—চক্রধারী; **চ**—এবং; **তেজোরাশিম্**—তেজঃপুঞ্জ-স্বরূপ; **সর্বতঃ**—সর্বত্র; **দীপ্তিমন্তম্**—দীপ্তিমান; **পশ্যামি**—দেখছি; **ত্বাম্**—তোমাকে; **দুর্নিরীক্ষ্যম্**—দুর্নিরীক্ষ্য; **সমন্তাৎ**—সবদিকে; **দীপ্তানল**—প্রদীপ্ত অগ্নি; **অর্ক**—সূর্যের; **দ্যুতিম্**—দ্যুতি; **অপ্রমেয়ম্**—অপ্রমেয়।

গীতার গান

কিরীট যে চক্র গদা, রাশি রাশি তেজপ্রদ,
দীপ্তমান দেখিতেছি সব ।
দেখিতে দুরূহ সেই, প্রদীপ্ত উজ্জ্বল যেই,
দীপ্ত অগ্নি সূর্য দ্যুতি সম ॥

অনুবাদ

কিরীট শোভিত, গদা ও চক্রধারী, সর্বত্র দীপ্তিমান, তেজঃপুঞ্জ-স্বরূপ, দুর্নিরীক্ষ্য, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের মতো প্রভাবিশিষ্ট এবং অপ্রমেয় স্বরূপ তোমাকে আমি সর্বত্রই দেখছি।

শ্লোক ১৮

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮ ॥

ত্বম্—তুমি; **অক্ষরম্**—ব্রহ্ম; **পরমম্**—পরম; **বেদিতব্যম্**—জ্ঞাতব্য; **ত্বম্**—তুমি; **অস্য**—এই; **বিশ্বস্য**—বিশ্বের; **পরম্**—পরম; **নিধানম্**—আশ্রয়; **ত্বম্**—তুমি; **অব্যয়ঃ**—অব্যয়; **শাশ্বতধর্মগোপ্তা**—সনাতন ধর্মের রক্ষক; **সনাতনঃ**—নিত্য; **ত্বম্**—তুমি; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **মতঃ মে**—আমার মতে।

গীতার গান

তুমি যে অক্ষর তত্ত্ব, বুঝিবার যোগ্য তথ্য,
এ বিশ্বের পরম আশ্রয় ।

সনাতন ধর্মরক্ষক, সনাতন পুরুষাখ্যা,
তুমি হও অনন্ত অব্যয় ॥

অনুবাদ

তুমি পরম ব্রহ্ম এবং একমাত্র জ্ঞাতব্য। তুমি বিশ্বের পরম আশ্রয়। তুমি অব্যয়, সনাতন ধর্মের রক্ষক এবং সনাতন পরম পুরুষ। এই আমার অভিমত।

শ্লোক ১৯

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যম্
অনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯ ॥

অনাদিমধ্যান্তম্—আদি, মধ্য ও অন্তহীন; **অনন্ত**—অন্তহীন; **বীর্যম্**—বীর্যশালী; **অনন্ত**—অন্তহীন; **বাহুম্**—বাহু; **শশি**—চন্দ্র; **সূর্য**—সূর্য; **নেত্রম্**—চক্ষুদ্বয়; **পশ্যামি**—দেখছি; **ত্বাম্**—তোমাকে; **দীপ্ত**—প্রজ্বলিত; **হুতাশবক্ত্রম্**—অগ্নিতুল্য মুখবিশিষ্ট; **স্বতেজসা**—স্বীয় তেজ দ্বারা; **বিশ্বম্**—জগৎ; **ইদম্**—এই; **তপন্তম্**—সন্তাপকারী।

গীতার গান

তব আদি অন্ত নাই, মধ্যের কি কথা তাই,
তুমি হও সে অনন্ত বীর্য ।
তোমার বাহু মহান, চন্দ্র-সূর্য নেত্রবান,
তোমার হুতাশ দীপ্ত বক্ত্র ॥
নিজ তেজ রাশি দ্বারা, তপ্ত কর বিশ্ব সারা,
ব্যাপ্ত তোমার সর্বত্র তেজ ।

অনুবাদ

আমি দেখছি তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নেই। তুমি অনন্ত বীর্যশালী ও অসংখ্য বাহুবিশিষ্ট এবং চন্দ্র ও সূর্য তোমার চক্ষুদ্বয়। তোমার মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত অগ্নির জ্যোতি এবং তুমি স্বীয় তেজে সমস্ত জগৎ সন্তপ্ত করছ।

তাৎপর্য

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ষড়ৈশ্বর্যের কোন সীমা নেই। এখানে এবং বহু স্থানে তার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কিন্তু শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের কীর্তির পুনরাবৃত্তি করলে, তা সাহিত্যগত দুর্বলতা হয় না। কথিত আছে যে, মোহাচ্ছন্ন বা আশ্চর্যান্বিত হলে অথবা পুলকিত হলে মানুষ একই কথার বারবার পুনরাবৃত্তি করে। সেটি দূষণীয় নয়।

শ্লোক ২০

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০ ॥

দ্যৌ—দ্যুলোক; **আপৃথিব্যোঃ**—পৃথিবীর; **ইদম্**—এই; **অন্তরম্**—মধ্যস্থল; **হি**—অবশ্যই; **ব্যাপ্তম্**—ব্যাপ্ত; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **একেন**—একমাত্র; **দিশঃ**—দিক; **চ**—এবং; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **রূপম্**—রূপ; **উগ্রম্**—ভয়ংকর; **তব**—তোমার; **ইদম্**—এই; **লোকত্রয়ম্**—ত্রিলোক; **প্রব্যথিতম্**—ব্যথিত হচ্ছে; **মহাত্মন্**—হে মহাত্মন্।

গীতার গান

পৃথিবী বা অন্তরীক্ষে, বাহিরে ভিতরে মধ্যে,
যত দিগ্-দিগন্তের দেশ ॥
দেখিয়া তোমার রূপ, মহান যে বিশ্বরূপ,
যাহা হয় অদ্ভুত দর্শন ।
হয়েছে দেখিয়া ভীত, ত্রিভুবনে যে ব্যথিত,
সব লোক শুন মহাত্মন ॥

অনুবাদ

তুমি একাই স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ ও দশদিক পরিব্যাপ্ত করে আছ। হে মহাত্মন্! তোমার এই অদ্ভুত ও ভয়ংকর রূপ দর্শন করে ত্রিলোক অত্যন্ত ভীত হচ্ছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *দ্যাবাপৃথিব্যোঃ* (স্বর্গ ও মর্ত্যলোকের মধ্যবর্তী স্থান) ও *লোকত্রয়ম্* (ত্রিভুবন) কথা দুটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কেবল অর্জুনই ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করেননি, অন্যান্য গ্রহলোকের অধিবাসীরাও তাঁর সেই রূপ দর্শন করেছিলেন। অর্জুনের এই বিশ্বরূপ দর্শন স্বপ্ন নয়। ভগবান যাঁদেরকে দিব্যদৃষ্টি দান করেছিলেন, তাঁরা সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে সেই বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ২১

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি ।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১ ॥

অমী—ঐ সমস্ত; **হি**—অবশ্যই; **ত্বাম্**—তোমাকে; **সুরসঙ্ঘাঃ**—দেবতারা; **বিশন্তি**—প্রবেশ করছেন; **কেচিৎ**—কেউ কেউ; **ভীতাঃ**—ভীত হয়ে; **প্রাঞ্জলয়ঃ**—করজোড়ে; **গৃণন্তি**—গুণ বর্ণনা করছেন; **স্বস্তি**—শান্তিবাক্য; **ইতি**—এভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **মহর্ষি**—মহর্ষিগণ; **সিদ্ধসঙ্ঘাঃ**—সিদ্ধগণ; **স্তুবন্তি**—স্তব করছেন; **ত্বাম্**—তোমাকে; **স্তুতিভিঃ**—স্তুতির দ্বারা; **পুষ্কলাভিঃ**—বৈদিক মন্ত্র।

গীতার গান

ঐ যে যত দেবগণ, লইতেছে যে শরণ,
কেহ বা হয়েছে ভীত মনে ।
স্তব করে জোড় হাতে, মহর্ষির সে সন্ততি,
স্বস্তিবাদ সকলে বাখানে ॥

অনুবাদ

সমস্ত দেবতারা তোমার শরণাগত হয়ে তোমাতেই প্রবেশ করছেন। কেউ কেউ ভীত হয়ে করজোড়ে তোমার গুণগান করছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধেরা 'জগতের কল্যাণ হোক' বলে প্রচুর স্তুতি বাক্যের দ্বারা তোমার স্তব করছেন।

তাৎপর্য

ভগবানের বিশ্বরূপের এই ভয়ংকর প্রকাশ এবং তার প্রচণ্ড জ্যোতি দর্শন করে সমস্ত গ্রহলোকের দেব-দেবীরা ভীত হয়ে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকেন।

শ্লোক ২২

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ ।
গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ ২২ ॥

রুদ্র—রুদ্র; **আদিত্যাঃ**—আদিত্যগণ; **বসবঃ**—বসুগণ; **যে**—যে সমস্ত; **চ**—এবং; **সাধ্যাঃ**—সাধ্যগণ; **বিশ্বে**—বিশ্বদেবগণ; **অশ্বিনৌ**—অশ্বিনীকুমারদ্বয়; **মরুতঃ**—মরুতগণ; **চ**—এবং; **উষ্মপাঃ**—পিতৃগণ; **চ**—এবং; **গন্ধর্ব**—গন্ধর্বগণ; **যক্ষ**—যক্ষগণ; **অসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ**—অসুরগণ ও সিদ্ধগণ; **বীক্ষন্তে**—দর্শন করছেন; **ত্বাম্**—তোমাকে; **বিস্মিতাঃ**—বিস্ময়যুক্ত হয়ে; **চ**—ও; **এব**—অবশ্যই; **সর্বে**—সকলে।

গীতার গান

রুদ্র আর যে আদিত্য, বসু আর যত সাধ্য,
অশ্বিনীকুমার বিশ্বদেব ।
মরুত বা পিতৃলোক, গন্ধর্ব বা সিদ্ধলোক,
দেখিতে আসিয়াছে সে সব ॥

অনুবাদ

রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, সাধ্য নামক দেবতারা, বসুগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুতগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ, অসুরগণ ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মৃত হয়ে তোমাকে দর্শন করছে।

শ্লোক ২৩

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্ ।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩ ॥

রূপম্—রূপ; **মহৎ**—মহৎ; **তে**—তোমার; **বহু**—বহু; **বক্ত্র**—মুখ; **নেত্রম্**—চক্ষু; **মহাবাহো**—হে মহাবীর; **বহু**—অনেক; **বাহু**—বাহু; **উরু**—উরু; **পাদম্**—পদ; **বহূদরম্**—বহু উদর; **বহুদংষ্ট্রা**—বহু দন্ত; **করালম্**—ভয়ংকর; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **লোকাঃ**—সমস্ত লোক; **প্রব্যথিতাঃ**—ব্যথিত; **তথা**—তেমনই; **অহম্**—আমি।

গীতার গান

তোমার মহান রূপ, বহু নেত্র বহু মুখ,
বহু পাদ উরু মহাবাহো ।
বহু উদর দন্ত, করাল নাহিক অন্ত,
দেখিয়া মনেতে ভয়াবহ ॥

অনুবাদ

হে মহাবাহু! বহু মুখ, বহু চক্ষু, বহু বাহু, বহু উরু, বহু চরণ, বহু উদর ও অসংখ্য করাল দন্তবিশিষ্ট তোমার বিরাটরূপ দর্শন করে সমস্ত প্রাণী অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছে এবং আমিও অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছি।

শ্লোক ২৪

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো ॥ ২৪ ॥

নভঃস্পৃশম্—আকাশস্পর্শী; **দীপ্তম্**—জ্বলন্ত; **অনেক**—বহু; **বর্ণম্**—বর্ণ; **ব্যাত্ত**—বিস্ফারিত; **আননম্**—মুখ; **দীপ্ত**—উজ্জ্বল; **বিশাল**—আয়ত; **নেত্রম্**—চক্ষু; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **হি**—অবশ্যই; **ত্বাম্**—তোমাকে; **প্রব্যথিত**—ব্যথিত; **অন্তরাত্মা**—অন্তরাত্মা; **ধৃতিম্**—ধৈর্য; **ন**—না; **বিন্দামি**—পাচ্ছি; **শমম্**—শান্তি; **চ**—ও; **বিষ্ণো**—হে বিষ্ণু।

গীতার গান

আকাশে ঠেকেছে মাথা, ঝুলে যেন অগ্নিমাখা,
বহু বর্ণ হয়েছে বিস্তার ।

ব্যাপ্তানন দীপ্ত নেত্র, ঝলসিয়া সে সর্বত্র,
ধৈর্যচ্যুতি করেছে আমার ॥

অনুবাদ

হে বিষ্ণু! তোমার আকাশস্পর্শী, তেজোময়, বিবিধ বর্ণযুক্ত, বিস্তৃত মুখমণ্ডল ও উজ্জ্বল আয়ত চক্ষুবিশিষ্ট তোমাকে দেখে আমার হৃদয় ব্যথিত হচ্ছে এবং আমি ধৈর্য ও শম অবলম্বন করতে পারছি না।

শ্লোক ২৫

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি ।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫ ॥

দংষ্ট্রা—দন্তযুক্ত; করালানি—ভীষণ; চ—ও; তে—তোমার; মুখানি—মুখসমূহ; দৃষ্ট্বা—দেখে; এব—এভাবে; কালানল—প্রলয়াগ্নি; সন্নিভানি—সদৃশ; দিশঃ—দিকসমূহ; ন জানে—জানি না; ন লভে—পাচ্ছি না; চ—ও; শর্ম—সুখ; প্রসীদ—প্রসন্ন হও; দেবেশ—হে দেবেশ; জগন্নিবাস—হে জগদাশ্রয়।

গীতার গান

করাল দাঁতের পাটি, মুখে তব আটিসাটি,
কালানল জ্বেলেছে যেমন ।
দিকভ্রম সব কর্ম, বুঝি না আমার শর্ম,
রক্ষা কর ওহে ভগবান ॥

অনুবাদ

হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! ভয়ংকর দন্তযুক্ত ও প্রলয়াগ্নি তুল্য তোমার মুখসকল দেখে আমার দিকভ্রম হচ্ছে এবং আমি শান্তি পাচ্ছি না। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

শ্লোক ২৬-৩০

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬ ॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।
কেচিদ্ বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭ ॥
যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি ।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥ ২৮ ॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ ।
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০ ॥

অমী—এই সমস্ত; চ—ও; ত্বাম্—তোমার; ধৃতরাষ্ট্রস্য—ধৃতরাষ্ট্রের; পুত্রাঃ—পুত্রগণ; সর্বে—সমস্ত; সহ—সহ; এব—বাস্তবিকপক্ষে; অবনিপাল—নৃপতিগণ; সঙ্ঘৈঃ—দলবদ্ধভাবে; ভীষ্মঃ—ভীষ্মদেব; দ্রোণঃ—দ্রোণাচার্য; সূতপুত্রঃ—কর্ণ; তথা—ও; অসৌ—সেই; সহ—সহ; অস্মদীয়ৈঃ—আমাদের; অপি—ও; যোধমুখ্যৈঃ—প্রধান যোদ্ধাগণ; বক্ত্রাণি—মুখসমূহের মধ্যে; তে—তোমার; ত্বরমাণাঃ—দ্রুতবেগে; বিশন্তি—প্রবেশ করছে; দংষ্ট্রা—দন্তবিশিষ্ট; করালানি—করাল; ভয়ানকানি—অত্যন্ত

ভয়ঙ্কর; **কেচিৎ**—কেউ কেউ; **বিলগ্নাঃ**—বিলগ্ন হয়ে; **দশনান্তরেষু**—দন্ত মধ্যে; **সংদৃশ্যন্তে**—দেখা যাচ্ছে; **চূর্ণিতৈঃ**—চূর্ণিত; **উত্তমাঙ্গৈঃ**—মস্তক দ্বারা; **যথা**—যেমন; **নদীনাম্**—নদীসমূহের; **বহবঃ**—বহু; **অম্বুবেগাঃ**—জলপ্রবাহ; **সমুদ্রম্**—সমুদ্র; **এব**—অবশ্যই; **অভিমুখাঃ**—অভিমুখী হয়ে; **দ্রবন্তি**—প্রবেশ করে; **তথা**—তেমনই; **তব**—তোমার; **অমী**—এই সকল; **নরলোকবীরাঃ**—নরলোকের বীরগণ; **বিশন্তি**—প্রবেশ করছে; **বক্ত্রাণি**—মুখসমূহে; **অভিবিজ্বলন্তি**—জ্বলন্ত; **যথা**—যেমন; **প্রদীপ্তম্**—প্রজ্বলিত; **জ্বলনম্**—অগ্নি; **পতঙ্গাঃ**—পতঙ্গগণ; **বিশন্তি**—প্রবেশ করে; **নাশায়**—মরণের জন্য; **সমৃদ্ধবেগাঃ**—প্রবল বেগে; **তথা এব**—তেমনই; **নাশায়**—মরণের জন্য; **বিশন্তি**—প্রবেশ করছে; **লোকাঃ**—সমস্ত মানুষ; **তব**—তোমার; **অপি**—ও; **বক্ত্রাণি**—মুখসমূহের মধ্যে; **সমৃদ্ধবেগাঃ**—অতি বেগে; **লেলিহ্যসে**—লেহন করছ; **গ্রসমানঃ**—গ্রাস করছ; **সমন্তাৎ**—চারি দিকে; **লোকান্**—লোকসমূহকে; **সমগ্রান্**—সমগ্র; **বদনৈঃ**—মুখসমূহের দ্বারা; **জ্বলদ্ভিঃ**—প্রদীপ্ত; **তেজোভিঃ**—তেজোরাশির দ্বারা; **আপূর্য**—আবৃত করে; **জগৎ**—জগৎ; **সমগ্রম্**—সমগ্র; **ভাসঃ**—দীপ্তিসমূহ; **তব**—তোমার; **উগ্রাঃ**—ভয়ংকর; **প্রতপন্তি**—সন্তপ্ত করছ; **বিষ্ণো**—হে সর্বব্যাপ্ত ভগবান।

গীতার গান

ধৃতরাষ্ট্র পুত্র যত, তারা সব অবিরত,
সঙ্গে লয়ে যত দিক্‌পাল।
ভীষ্ম দ্রোণ আর কর্ণ, আমাদের যত সৈন্য,
পিষ্ট তব দন্তেতে করাল ॥
সবাই প্রবেশ করে, ভয়ানক দন্ত স্তরে,
চূর্ণ হয়ে থাকে সে লাগিয়া।
ভাবি সে দেখিয়া মনে, নদীস্রোত ধাবমানে,
গেল বুঝি সমুদ্রে মিশিয়া ॥
যত নর লোকবীর, জ্বলে গেল হল স্থির,
তোমার মুখের যে গহ্বরে।
যেমন পতঙ্গ জ্বলে, অগ্নিতে প্রবেশ কালে,
ধ্বংস হয় নিজের বেগেতে ॥
তুমি ত করিছ গ্রাস, যত লোক ইতিহাস,
জ্বলিত তোমার এই মুখে।

সে তেজেতে ভাসমান, জগতের নাহি ত্রাণ,
হে বিষ্ণু সবাই মরে দুঃখে ॥

অনুবাদ

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা, তাদের মিত্র সমস্ত রাজন্যবর্গ এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এবং আমাদের পক্ষের সমস্ত সৈন্যেরা তোমার করাল দন্তবিশিষ্ট মুখের মধ্যে দ্রুতবেগে প্রবেশ করছে এবং সেই দন্তমধ্যে বিলগ্ন হয়ে তাদের মস্তক চূর্ণিত হচ্ছে। নদীসমূহ যেমন সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করে, তেমনই নরলোকের বীরগণ তোমার জ্বলন্ত মুখবিবরে প্রবেশ করছে। পতঙ্গগণ যেমন দ্রুত গতিতে ধাবিত হয়ে মরণের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, তেমনই এই লোকেরাও মৃত্যুর জন্য অতি বেগে তোমার মুখবিবরে প্রবেশ করছে। হে বিষ্ণু! তুমি তোমার জ্বলন্ত মুখসমূহের দ্বারা সকল লোককে গ্রাস করছ এবং তোমার তেজোরাশির দ্বারা সমগ্র জগৎকে আবৃত করে সন্তপ্ত করছ।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে ভগবান প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি অর্জুনকে অত্যন্ত কৌতূহল উদ্দীপক কিছু দেখাবেন। এখন অর্জুন দেখছেন যে, তাঁর বিপক্ষ দলের সমস্ত নেতারা (ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা) এবং তাদের সৈন্যেরা এবং অর্জুনের নিজের সৈন্যেরা সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হতে চলেছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, কুরুক্ষেত্রে সমবেত প্রায় সকলেরই মৃত্যুর পর অর্জুনের জয় অবশ্যম্ভাবী। এখানে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অপরাজেয় ভীষ্মও বিনাশ প্রাপ্ত হবেন। তেমনই কর্ণও বিনাশ প্রাপ্ত হবেন। ভীষ্ম আদি বিপক্ষের মহারথীরাই কেবল বিনাশ প্রাপ্ত হবেন না, অর্জুনের স্বপক্ষের অনেক রথী-মহারথীরাও বিনাশ প্রাপ্ত হবেন।

শ্লোক ৩১

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১ ॥

আখ্যাহি—দয়া করে বল; **মে**—আমাকে; **কঃ**—কে; **ভবান্**—তুমি; **উগ্ররূপঃ**—উগ্রমূর্তি; **নমঃ অস্তু**—নমস্কার করি; **তে**—তোমাকে; **দেববর**—হে দেবশ্রেষ্ঠ; **প্রসীদ**—প্রসন্ন হও; **বিজ্ঞাতুম্**—বিশেষভাবে জানতে; **ইচ্ছামি**—ইচ্ছা করি; **ভবন্তম্**—তোমাকে; **আদ্যম্**—আদিপুরুষ; **ন**—না; **হি**—অবশ্যই; **প্রজানামি**—জানতে পারছি; **তব**—তোমার; **প্রবৃত্তিম্**—প্রচেষ্টা।

গীতার গান

কৃপা করি বল মোরে, কেবা তুমি উগ্রঘোরে,
প্রণমি প্রসাদ তুমি প্রভু ।
কি কারণ এ অদ্ভুত, ধরিয়াছ বিশ্বরূপ,
দেখি নাই বুঝি নাই কভু ॥
কিবা সে প্রবৃত্তি তব, জিজ্ঞাসি তোমারে সব,
ইচ্ছা হয় জানিবার তরে ।
যদি কৃপা তব হয়, বিবরণ সে নিশ্চয়,
কৃপা করি কহ প্রভু মোরে ॥

অনুবাদ

উগ্রমূর্তি তুমি কে, কৃপা করে আমাকে বল। হে দেবশ্রেষ্ঠ! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি প্রসন্ন হও। তুমি হচ্ছ আদিপুরুষ। আমি তোমার প্রবৃত্তি অবগত নই, আমি তোমাকে বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছা করি।

শ্লোক ৩২

শ্রীভগবানুবাচ

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **কালঃ**—কাল; **অস্মি**—হই; **লোক**—লোক; **ক্ষয়কৃৎ**—ধ্বংসকারী; **প্রবৃদ্ধঃ**—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; **লোকান্**—লোকসমূহকে; **সমাহর্তুম্**—সংহার করতে; **ইহ**—এক্ষণে; **প্রবৃত্তঃ**—প্রবৃত্ত হয়েছি; **ঋতে**—ব্যতীত; **অপি**—ও; **ত্বাম্**—তোমাকে; **ন**—না; **ভবিষ্যন্তি**—থাকবে; **সর্বে**—সকলে; **যে**—যে; **অবস্থিতাঃ**—অবস্থিত আছে; **প্রত্যনীকেষু**—বিপক্ষ দলে; **যোধাঃ**—যোদ্ধাগণ।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

মহাকাল আমি সেই, প্রবৃদ্ধ ইচ্ছায় হই,
যত লোক গ্রাস করিবারে ।
প্রবৃত্ত হয়েছি আমি, আমি সেই অন্তর্যামী,
লোকক্ষয় অন্তরে অন্তরে ॥

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—আমি লোকক্ষয়কারী প্রবৃদ্ধ কাল এবং এই সমস্ত লোক সংহার করতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হয়েছি। তোমরা (পাণ্ডবেরা) ছাড়া উভয়-পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধারাই নিহত হবে।

তাৎপর্য

অর্জুন যদিও জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাঁর বন্ধু এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবান, কিন্তু তবুও তাঁর বিবিধ রূপ দর্শনে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তাই তিনি জানতে চাইলেন, এই ভয়ংকর ধ্বংস সাধনকারী শক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। *বেদে* বলা হয়েছে যে, পরমতত্ত্ব ভগবান সব কিছুই বিনাশ করেন, এমন কি ব্রাহ্মণদেরও। *কঠ উপনিষদে* (১/২/২৫) বলা হয়েছে—

যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥

কালক্রমে সমস্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং অন্য সকলকেই পরমেশ্বর ভগবান গ্রাস করবেন। পরমেশ্বর ভগবানের এই রূপ সর্বগ্রাসী দানবের মতো এবং এখানে তিনি সর্বগ্রাসী কালরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। কয়েকজন পাণ্ডব ব্যতীত এই যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত সকলকেই ভগবান গ্রাস করবেন।

অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইছিলেন না। তিনি মনে করেছিলেন যে, যুদ্ধ না করাই ভাল হবে। তা হলে কোন রকম নৈরাশ্য বা বিষাদের সূচনা হবে না। তার উত্তরে ভগবান বললেন যে, তিনি যদি যুদ্ধ নাও করেন, তবুও সকলেরই বিনাশ হবে। কারণ সেটিই হচ্ছে তাঁর পরিকল্পনা। অর্জুন যদি যুদ্ধ থেকে বিরত হন,

তা হলে অন্য কোনভাবে তাদের মৃত্যু হবে। মৃত্যুকে রোধ করা যাবে না। এমন কি অর্জুন যদি যুদ্ধ না করেন, তবুও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতপক্ষে, তাদের সকলেরই মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। সময় সর্বগ্রাসী, সংহারক। পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে সব কিছুই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সেটিই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম।

শ্লোক ৩৩

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্ ।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩ ॥

তস্মাৎ—অতএব; ত্বম্—তুমি; উত্তিষ্ঠ—উঠ; যশঃ—যশ; লভস্ব—লাভ কর; জিত্বা—জয় করে; শত্রূন্—শত্রুদের; ভুঙ্‌ক্ষ্ব—ভোগ কর; রাজ্যম্—রাজ্য; সমৃদ্ধম্—সমৃদ্ধশালী; ময়া—আমার দ্বারা; এব—অবশ্যই; এতে—এই সমস্ত; নিহতাঃ—নিহত হয়েছে; পূর্বমেব—পূর্বেই; নিমিত্তমাত্রম্—নিমিত্ত মাত্র; ভব—হও; সব্যসাচিন্—হে সব্যসাচী।

গীতার গান

অতএব যারা হেথা, যুদ্ধ লাগি সমবেতা,
তুমি বিনা সকলে মরিবে ।
যত যোদ্ধা আসিয়াছে, সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে,
কেহ নাহি জীবিত সে রবে ॥
অতএব কর যুদ্ধ, যশলাভ হবে শুদ্ধ,
শত্রু জিনি সুখে রাজ্য কর ।
আমি সেই প্রথমেতে, মারিয়া রেখেছি এতে
নিমিত্তমাত্র সে তুমি যুদ্ধ কর ॥

অনুবাদ

অতএব, তুমি যুদ্ধ করার জন্য উত্থিত হও, যশ লাভ কর এবং শত্রুদের পরাজিত করে সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ভোগ কর। আমার দ্বারা এরা পূর্বেই নিহত হয়েছে। হে সব্যসাচী! তুমি নিমিত্ত মাত্র হও।

তাৎপর্য

সব্যসাচিন্ তাঁকেই বলা হয়, যিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে তীর ছুঁড়তে পারেন। এভাবেই অর্জুনকে সুদক্ষ যোদ্ধারূপে সম্বোধন করা হয়েছে, যিনি তীর ছুঁড়ে শত্রু সংহার করতে সমর্থ। 'নিমিত্ত মাত্র হও'—*নিমিত্তমাত্রম্*। এই কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই জগতে সব কিছুই সাধিত হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছানুসারে। যারা মূর্খ, যাদের জ্ঞান নেই, তারা মনে করে যে, কোনও পরিকল্পনার দ্বারা চালিত না হয়েই প্রকৃতিতে সব কিছু ঘটে চলেছে এবং এই প্রকৃতিতে সব কিছুই যেন আকস্মিক ঘটনাচক্রে উদ্ভূত হয়েছে। আধুনিক যুগে তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে, হয়ত এটি এই রকম ছিল অথবা এই রকম হলেও হতে পারে, কিন্তু আসলে 'হয়ত' বা 'হতে পারে'—এই রকম কোন প্রশ্নই উঠে না। এই জড় জগতে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কাজ করছে। এই পরিকল্পনাটি কি? জড় জগতে বদ্ধ জীবাত্মারা ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দাম্ভিক মনোভাব থাকে, যার প্রভাবে তারা জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায়, ততক্ষণ তারা বদ্ধ। কিন্তু কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের পরিকল্পনা উপলব্ধি করতে পারেন এবং কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবানের সেবায় প্রবৃত্ত হন, তখন তিনিই হচ্ছেন যথার্থ বুদ্ধিমান। এই জগতের সৃষ্টিকার্য ও বিনাশকার্য সাধিত হয় ভগবানের নিখুঁত পরিচালনায়। এভাবেই ভগবানের পরিকল্পনা অনুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আয়োজন হয়েছিল। অর্জুন যুদ্ধ করতে চাইছিলেন না। কিন্তু তাঁকে বলা হয়েছিল যে, পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে তাঁর যুদ্ধ করা উচিত। তা হলেই তিনি সুখী হবেন। কেউ যখন সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করেন এবং ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় তাঁর জীবনকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেন, তিনিই সার্থকতা লাভ করেন।

শ্লোক ৩৪

দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্ ।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥ ৩৪ ॥

দ্রোণম্ চ—দ্রোণাচার্যও; ভীষ্মম্ চ—ভীষ্মদেবও; জয়দ্রথম্ চ—জয়দ্রথও; কর্ণম্—কর্ণ; তথা—এবং; অন্যান্—অন্যান্য; অপি—অবশ্যই; যোধবীরান্—যুদ্ধবীরগণ;

ময়া—আমার দ্বারা; **হতান্**—নিহত হয়েছে; **ত্বম্**—তুমি; **জহি**—বধ কর; **মা**—না; **ব্যথিষ্ঠাঃ**—বিচলিত হয়ো; **যুধ্যস্ব**—যুদ্ধ কর; **জেতাসি**—জয় করবে; **রণে**—যুদ্ধে; **সপত্নান্**—শত্রুদের।

গীতার গান

দ্রোণ আর ভীষ্ম কর্ণ, জয়দ্রথ তথা অন্য,
যত যোদ্ধা বীর আসিয়াছে।
মরিয়াছে জান তারা, আমার ইচ্ছার দ্বারা,
কিবা দুঃখ করিবার আছে ॥

অনুবাদ

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ এবং অন্যান্য যুদ্ধ বীরগণ পূর্বেই আমার দ্বারা নিহত হয়েছে। সুতরাং, তুমি তাদেরই বধ কর এবং বিচলিত হয়ো না। তুমি যুদ্ধে শত্রুদের নিশ্চয়ই জয় করবে, অতএব যুদ্ধ কর।

তাৎপর্য

পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ইচ্ছা অনুসারেই সমস্ত পরিকল্পনা সাধিত হয়। কিন্তু তাঁর ভক্তদের প্রতি তিনি এতই করুণাময় যে, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর ভক্তেরা যখন তাঁর পরিকল্পনার রূপদান করেন, তখন তিনি তাঁর সমস্ত কৃতিত্ব তাঁর ভক্তদেরই দিতে চান। অতএব জীবনকে এমনভাবে পরিচালিত করা উচিত যে, প্রতিটি মানুষই যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হতে পারেন এবং সদ্গুরুর মাধ্যমে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পরিকল্পনাগুলি তাঁর কৃপার দ্বারাই কেবল বুঝতে পারা যায়। ভগবানের পরিকল্পনা ও ভগবদ্ভক্তের পরিকল্পনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং এই পরিকল্পনা অনুসরণ করলেই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হওয়া যায়।

শ্লোক ৩৫

সঞ্জয় উবাচ

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ—সঞ্জয় বললেন; **এতৎ**—এই; **শ্রুত্বা**—শুনে; **বচনম্**—বাণী; **কেশবস্য**—কেশবের; **কৃতাঞ্জলিঃ**—হাত জোড় করে; **বেপমানঃ**—কম্পিত কলেবরে; **কিরীটী**—অর্জুন; **নমস্কৃত্বা**—নমস্কার করে; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **এব**—ও; **আহ**—বললেন; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **সগদ্গদম্**—গদ্গদভাবে; **ভীতভীতঃ**—ভীতচিত্তে; **প্রণম্য**—প্রণাম করে।

গীতার গান

সঞ্জয় কহিলেন ঃ

অর্জুন শুনিয়া তাহা, কৃতাঞ্জলিপুটে ইহা,
কম্পিত শরীর পুনঃ পুনঃ।
নমস্কার করে ভূমে, ভয়ভীত সসম্ভ্রমে,
যে কহিল বলি তাহা শুন ॥

অনুবাদ

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—হে রাজন্! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বাণী শ্রবণ করে অর্জুন অত্যন্ত ভীত হয়ে কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করে গদ্গদ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন।

তাৎপর্য

আমরা আগেই বিশ্লেষণ করেছি, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের বিশ্বরূপের প্রভাবে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাতে অর্জুন বিস্ময়ে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তাই, তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে বারবার শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করতে থাকেন এবং গদ্গদ স্বরে তাঁর স্তব করতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের এই ব্যবহার সখ্য-রসের অভিব্যক্তি নয়, তা হচ্ছে ভক্তের অদ্ভুত রসের ব্যবহার।

শ্লোক ৩৬

অর্জুন উবাচ

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; **স্থানে**—যুক্তিযুক্ত; **হৃষীকেশ**—হে হৃষীকেশ; **তব**—তোমার; **প্রকীর্ত্যা**—মহিমা কীর্তন দ্বারা; **জগৎ**—সমগ্র বিশ্ব; **প্রহৃষ্যতি**—হৃষ্ট হচ্ছে; **অনুরজ্যতে**—অনুরক্ত হচ্ছে; **চ**—এবং; **রক্ষাংসি**—রাক্ষসেরা; **ভীতানি**—ভীত হয়ে; **দিশঃ**—দিকসমূহে; **দ্রবন্তি**—পলায়ন করছে; **সর্বে**—সমস্ত; **নমস্যন্তি**—নমস্কার করছে; **চ**—ও; **সিদ্ধসঙ্ঘাঃ**—সিদ্ধগণ।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

তব কীর্তি হৃষীকেশ, শুনিয়াছে যে অশেষ,
জগতের যেবা যেথা আছে।
আনন্দিত হয়ে তারা, অনুগত হয় যারা,
পাগল হইয়া ধায় পাছে ॥
রাক্ষসাদি ভয়ে ভীত, যদি চাহে নিজ হিত,
পলায় সে দিগ্-দিগন্তরে।
যারা হয় সিদ্ধ জন, সদা প্রণমিত মন,
যুক্ত হয় সে কার্য তাদেরে ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হে হৃষীকেশ! তোমার মহিমা কীর্তনে সমস্ত জগৎ প্রহৃষ্ট হয়ে তোমার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছে। রাক্ষসেরা ভীত হয়ে নানা দিকে পলায়ন করছে এবং সিদ্ধরা তোমাকে নমস্কার করছে। এই সমস্তই যুক্তিযুক্ত।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরিণতি সম্বন্ধে অবগত হওয়ার ফলে অর্জুন ভগবানের অনন্য ভক্তে পরিণত হলেন। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের মহান ভক্ত ও সখারূপে তিনি স্বীকার করলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যা করেন তা আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন। অর্জুন প্রতিপন্ন করলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা, তিনি হচ্ছেন তাঁর ভক্তদের আরাধ্য ভগবান এবং তিনি হচ্ছেন অবাঞ্ছিতদের বিনাশকর্তা। তিনি যাই করেন তা সকলের মঙ্গলের জন্যই করেন। অর্জুন এখানে বুঝতে পারছেন যে, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় আকাশ-মার্গের

উচ্চতর গ্রহলোকের অনেক দেব-দেবী, সিদ্ধ ও মহাত্মারা সেই যুদ্ধ দর্শন করতে এসেছিলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অর্জুন যখন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করলেন, তখন দেব-দেবীরা প্রীতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু অন্যেরা, যারা ছিলেন আসুরিক ভাবাপন্ন রাক্ষস ও ভগবৎ-বিদ্বেষী দৈত্য-দানব, তারা ভগবানের সেই মহিমা সহ্য করতে পারল না। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ধ্বংস সাধনকারী ভয়ঙ্কর এই রূপ দর্শন করে, তারা তাদের স্বাভাবিক ভয়ের বশবর্তী হয়ে পলায়ন করতে শুরু করেছিল। ভগবান তাঁর ভক্ত ও অভক্তের সঙ্গে যেভাবে আচরণ করেন, অর্জুন তার প্রশংসা করছেন। সর্ব অবস্থাতেই ভক্ত ভগবানের মহিমা কীর্তন করেন। কারণ তিনি জানেন যে, ভগবান যা করেন তা সকলের মঙ্গলের জন্যই করেন।

শ্লোক ৩৭

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥ ৩৭ ॥

কস্মাৎ—কেন; **চ**—ও; **তে**—তোমাকে; **ন**—না; **নমেরন্**—নমস্কার করিবেন; **মহাত্মন্**—হে মহাত্মা; **গরীয়সে**—গরীয়ান; **ব্রহ্মণঃ**—ব্রহ্মা অপেক্ষা; **অপি**—যদিও; **আদিকর্ত্রে**—আদিকর্তা; **অনন্ত**—হে অনন্ত; **দেবেশ**—হে দেবেশ; **জগন্নিবাস**—হে জগদাশ্রয়; **ত্বম্**—তুমি; **অক্ষরম্**—ব্রহ্ম; **সদসৎ**—কারণ ও কার্য; **তৎ পরম্**—উভয়ের অতীত; **যৎ**—যে।

গীতার গান

কেন না হে মহাত্মন, নাহি লবে সে শরণ,
তুমি হও সর্ব গরীয়সী।
ব্রহ্মার আদি কর্তা, তুমি হও তার ভর্তা,
তব কীর্তি অতি মহীয়সী ॥
হে অনন্ত দেব ঈশ, তুমি হও জগদীশ,
সদসদ্ পরে যে অক্ষর।

তুমি হও সেই তত্ত্ব, কে বুঝিবে সে মহত্ত্ব,
নহ তুমি ভৌতিক বা জড় ॥

অনুবাদ

হে মহাত্মন্! তুমি এমন কি ব্রহ্মা থেকেও শ্রেষ্ঠ এবং আদি সৃষ্টিকর্তা। সকলে তোমাকে কেন নমস্কার করবেন না? হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি সৎ ও অসৎ উভয়ের অতীত অক্ষরতত্ত্ব ব্রহ্ম।

তাৎপর্য

এভাবেই প্রণাম করার মাধ্যমে অর্জুন বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সকলের পূজনীয়। তিনি সর্বব্যাপ্ত এবং তিনি সকল আত্মার পরম আত্মা। অর্জুন এখানে শ্রীকৃষ্ণকে *মহাত্মা* বলে সম্বোধন করছেন, যার অর্থ হচ্ছে তিনি সবচেয়ে মহৎ এবং তিনি অসীম। *অনন্ত* বলতে বোঝাচ্ছে যে, এমন কিছুই নেই যা পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির ও প্রভাবের দ্বারা আচ্ছাদিত নয়। *দেবেশ* কথাটির অর্থ হচ্ছে তিনি হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের নিয়ন্তা এবং তাদের সকলের ঊর্ধ্বে। তিনি হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বচরাচরের আশ্রয়। অর্জুন এটিও বুঝতে পেরেছিলেন যে, সমস্ত সিদ্ধ মহাপুরুষ এবং অত্যন্ত শক্তিশালী দেব-দেবীরা যে ভগবানকে তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছিলেন, তা খুবই স্বাভাবিক। কারণ তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই। অর্জুন বিশেষভাবে উল্লেখ করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার চেয়েও বড়। কারণ ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্ট। ব্রহ্মার জন্ম হয় গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে উদ্গত কমলের মধ্যে এবং গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ-প্রকাশ। তাই ব্রহ্মা ও শিব, যিনি ব্রহ্মা থেকে উদ্ভূত হয়েছেন এবং সমগ্র দেব-দেবীরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ভগবানকে অবশ্যই প্রণাম জানাবেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা, শিব আদি সমস্ত দেব-দেবীদের পূজনীয়। এখানে *অক্ষরম্* কথাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই জড় জগতের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ভগবান এই জড় সৃষ্টির অতীত। তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ। তাই, তিনি এই জগতের সমস্ত বদ্ধ জীব, এমন কি এই জড় সৃষ্টির থেকেও গরীয়ান। তাই তিনি পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ৩৮

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।

বেত্তাসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ ॥

ত্বম্—তুমি; **আদিদেবঃ**—আদি পরমেশ্বর ভগবান; **পুরুষঃ**—পুরুষ; **পুরাণঃ**—পুরাতন; **ত্বম্**—তুমি; **অস্য**—এই; **বিশ্বস্য**—বিশ্বের; **পরম্**—পরম; **নিধানম্**—আশ্রয়; **বেত্তা**—জ্ঞাতা; **অসি**—হও; **বেদ্যম্ চ**—এবং জ্ঞেয়; **পরং চ ধাম**—এবং পরম ধাম; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **ততম্**—ব্যাপ্ত; **বিশ্বম্**—জগৎ; **অনন্তরূপ**—হে অনন্ত-রূপ।

গীতার গান

তুমি আদি দেব হও সকলের সাধ্য নও
পুরাণ পুরুষ সবা হতে ।
জগতের যাহা কিছু সম্ভব হয়েছে পিছু
স্থির এই জগৎ তোমাতে ॥
তুমি জান সব প্রভু সনাতন তুমি বিভু
তুমি হও পরম নিধান ।
এ বিশ্ব তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত হয়েছে সারা
অনন্ত সে তোমার বিধান ॥

অনুবাদ

তুমি আদি দেব, পুরাণ পুরুষ এবং এই বিশ্বের পরম আশ্রয়। তুমি সব কিছুর জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞেয় এবং তুমিই গুণাতীত পরম ধামস্বরূপ। হে অনন্তরূপ! এই জগৎ তোমার দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

তাৎপর্য

সব কিছুই পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে আশ্রয় করে বর্তমান। তাই ভগবান হচ্ছেন পরম আশ্রয়। *নিধানম্* মানে হচ্ছে—সব কিছু, এমন কি ব্রহ্মজ্যোতিও পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত। এই জগতে যা ঘটছে সব কিছুরই জ্ঞাতা হচ্ছেন তিনি এবং জ্ঞানের যদি কোন অন্ত থাকে, তবে তিনিই সমস্ত জ্ঞানের অন্ত। তাই, তিনি হচ্ছেন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। সমস্ত জ্ঞানের বিষয়বস্তু হচ্ছেন তিনি, কারণ তিনি সর্বব্যাপ্ত। যেহেতু তিনি চিৎ-জগতেরও পরম কারণ, তাই তিনি অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত জগতেও তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ।

শ্লোক ৩৯

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ ॥

বায়ুঃ—বায়ু; **যমঃ**—যম; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **বরুণঃ**—বরুণ; **শশাঙ্কঃ**—চন্দ্র; **প্রজাপতিঃ**—ব্রহ্মা; **ত্বম্**—তুমি; **প্রপিতামহঃ**—প্রপিতামহ; **চ**—ও; **নমঃ**—নমস্কার; **নমস্তে**—তোমাকে নমস্কার করি; **অস্তু**—হোক; **সহস্রকৃত্বঃ**—সহস্রবার; **পুনঃ চ**—এবং পুনরায়; **ভূয়ঃ**—বারবার; **অপি**—ও; **নমঃ**—নমস্কার; **নমস্তে**—তোমাকে নমস্কার করি।

গীতার গান

বায়ু যম বহ্নি চন্দ্র সকলের তুমি কেন্দ্র
বরুণ যে তুমি হও সব ।
তুমি হও প্রজাপতি প্রপিতামহ সে অতি
যাহা হয় তোমার বৈভব ॥
সহস্র সে নমস্কার করি প্রভু বার বার
তোমার চরণে আমি ধরি ।
পুনঃ পুনঃ নমস্কার ভূয় ভূয় বার বার
কৃপা দৃষ্টি কর হে শ্রীহরি ॥

অনুবাদ

তুমিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি ব্রহ্মা ও প্রপিতামহ। অতএব, তোমাকে আমি সহস্রবার প্রণাম করি, পুনরায় নমস্কার করি এবং বারবার নমস্কার করি।

তাৎপর্য

ভগবানকে এখানে বায়ুরূপে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ বায়ু হচ্ছে সর্বব্যাপ্ত, তাই তা দেব-দেবীদের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি। অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণকে প্রপিতামহ বলে সম্বোধন করছেন, কারণ তিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মার পিতা।

শ্লোক ৪০

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব ।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ॥ ৪০ ॥

নমঃ—নমস্কার; **পুরস্তাৎ**—সম্মুখে; **অথ**—ও; **পৃষ্ঠতঃ**—পশ্চাতে; **তে**—তোমাকে; **নমঃ অস্তু**—নমস্কার করি; তে—তোমাকে; **সর্বতঃ**—সব দিক থেকে; **এব**—বস্তুত; **সর্ব**—হে সর্বাত্মা; **অনন্তবীর্য**—অন্তহীন শক্তি; **অমিতবিক্রমঃ**—অসীম বিক্রমশালী; **ত্বম্**—তুমি; **সর্বম্**—সমগ্র জগতে; **সমাপ্নোষি**—পরিব্যাপ্ত আছ; ততঃ—সেই হেতু; অসি—তুমি হও; **সর্বঃ**—সব কিছু।

গীতার গান

সম্মুখে পশ্চাতে তব সর্বতো প্রণামে রব
নমস্কার তব পাদপদ্মে ।
অন্তর্যামী উরুক্রম তুমি বিনা সব ভ্রম
প্রকাশিত তুমি নিজ ছদ্মে ॥

অনুবাদ

হে সর্বাত্মা! তোমাকে সম্মুখে পশ্চাতে ও সমস্ত দিক থেকেই নমস্কার করছি। হে অনন্তবীর্য! তুমি অসীম বিক্রমশালী। তুমি সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত, অতএব তুমিই সর্ব-স্বরূপ।

তাৎপর্য

ভগবৎ-প্রেমানন্দে বিহ্বল হয়ে অর্জুন তাঁর বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে সব দিক থেকে প্রণাম নিবেদন করছেন। অর্জুন বুঝতে পেরেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত শক্তির প্রভু, তিনি অনন্ত বীর্য, তিনি উরুক্রম। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত সমস্ত রথী-মহারথীদের শক্তির থেকে তাঁর শক্তি অনেক অনেক গুণ বেশি। *বিষ্ণু পুরাণে* (১/৯/৬৯) বলা হয়েছে—

যোঽয়ং তবাগতো দেব সমীপং দেবতাগণঃ ।
স ত্বমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ সর্বগতো ভবান্ ॥

"হে পরম পুরুষোত্তম ভগবান! যে-ই তোমার সামনে আসুক, তা সে দেবতাই হোক, সে তোমারই সৃষ্ট।"

শ্লোক ৪১-৪২

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি ।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু ।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২ ॥

সখা—সখা; **ইতি**—এভাবে; **মত্বা**—মনে করে; **প্রসভম্**—প্রগল্‌ভভাবে; **যৎ**—যা কিছু; **উক্তম্**—বলা হয়েছে; **হে কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **হে যাদব**—হে যাদব; **হে সখে**—হে সখা; **ইতি**—এভাবেই; **অজানতা**—না জেনে; **মহিমানম্**—মহিমা; **তব**—তোমার; **ইদম্**—এই; **ময়া**—আমার দ্বারা; **প্রমাদাৎ**—অজ্ঞতাবশত; **প্রণয়েন**—প্রণয়বশত; **বা অপি**—অথবা; **যৎ**—যা কিছু; **চ**—ও; **অবহাসার্থম্**—পরিহাস ছলে; **অসৎকৃতঃ**—অসম্মান; **অসি**—করা হয়েছে; **বিহার**—বিহার; **শয্যা**—শয়ন; **আসন**—উপবেশন; **ভোজনেষু**—অথবা একত্রে আহার করার সময়; **একঃ**—একাকী; **অথবা**—অথবা; **অপি**—ও; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত; **তৎসমক্ষম্**—তাদের সামনে; **তৎ**—সেই সব; **ক্ষাময়ে**—ক্ষমা প্রার্থনা করছি; **ত্বাম্**—তোমার কাছে; **অহম্**—আমি; **অপ্রমেয়ম্**—অপরিমেয়।

গীতার গান

মানিয়া তোমাকে সখা প্রগল্‌ভ করেছি বৃথা
হে কৃষ্ণ হে যাদব কত বলেছি ।

না জানি এই মহিমা আশ্চর্য সে নাহি সীমা
সামান্যত তোমাকে ভেবেছি ॥
পরিহাস করি সখা অসৎকার যথাতথা
সে প্রমাদ যা কিছু বলেছি ।
বিহার শয্যা আসনে পরোক্ষ বা সামনে
ক্ষম অপরাধ যা করেছি ॥

অনুবাদ

তোমার মহিমা না জেনে, সখা মনে করে তোমাকে আমি প্রগল্‌ভভাবে "হে কৃষ্ণ", "হে যাদব," "হে সখা," বলে সম্বোধন করেছি। প্রমাদবশত অথবা প্রণয়বশত আমি যা কিছু করেছি তা তুমি দয়া করে ক্ষমা কর। বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজনের সময় কখন একাকী এবং কখন বন্ধুদের সমক্ষে আমি যে তোমাকে অসম্মান করেছি, হে অচ্যুত! আমার সে সমস্ত অপরাধের জন্য তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যদিও অর্জুনের সামনে তাঁর বিশ্বরূপ প্রকাশ করেছেন, তবুও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা অর্জুনের মনে পড়ে যায় এবং বন্ধুত্বের বশবর্তী হয়ে তিনি যে ভগবানকে রীতিবিরুদ্ধ অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করে কত যে অসম্মান করেছেন, সেই জন্য তিনি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইছেন। তিনি স্বীকার করছেন যে, তিনি পূর্বে জানতেন না যে, শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার বিশ্বরূপ ধারণ করতে সমর্থ, যদিও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে তিনি সেই কথা পূর্বেই তাঁকে বলেছেন। অর্জুন মনে করতে পারছেন না, কতবার তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত বৈভবের কথা বিস্মৃত হয়ে তাঁকে "হে কৃষ্ণ", "হে বন্ধু", "হে যাদব" আদি সম্বোধন করে তাঁকে অশ্রদ্ধা করেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এতই করুণাময় যে, এই প্রকার ঐশ্বর্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অর্জুনের সঙ্গে বন্ধুর মতো খেলা করেছেন। এমনভাবেই ভগবানের সঙ্গে তাঁর ভক্তের অপ্রাকৃত প্রেমের বিনিময় হয়ে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীবের যে সম্পর্ক তা নিত্য, শাশ্বত। তা কখনই বিস্মৃত হওয়া যায় না, যেমন আমরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের ব্যবহারের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারি। ভগবানের বিশ্বরূপের বৈভব দর্শন করা সত্ত্বেও অর্জুন ভগবানের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা ভুলে যাননি।

শ্লোক ৪৩

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্‌ ।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ ॥

পিতা—পিতা; **অসি**—হও; **লোকস্য**—জগতের; **চরাচরস্য**—স্থাবর ও জঙ্গমের; **ত্বম্‌**—তুমি; **অস্য**—এই; **পূজ্যঃ**—পূজনীয়; **চ**—ও; **গুরুঃ**—গুরু; **গরীয়ান্‌**—গুরুশ্রেষ্ঠ; **ন**—না; **ত্বৎসমঃ**—তোমার সমকক্ষ; **অস্তি**—আছে; **অভ্যধিকঃ**—মহত্তর; **কুতঃ**—কিভাবে সম্ভব; **অন্যঃ**—অন্য; **লোকত্রয়ে**—ত্রিলোকে; **অপি**—ও; **অপ্রতিম**—অপ্রমেয়; **প্রভাব**—প্রভাব।

গীতার গান

যত লোক চরাচর তুমি পিতা সে সবার
তুমি পূজ্য গুরু সে প্রধান ।
সমান অধিক তব অন্য কেহ অসম্ভব
অপ্রতিম তোমার প্রভাব ॥

অনুবাদ

হে অমিত প্রভাব! তুমি এই চরাচর জগতের পিতা, পূজ্য, গুরু ও গুরুশ্রেষ্ঠ। ত্রিভুবনে তোমার সমান আর কেউ নেই, অতএব তোমার থেকে শ্রেষ্ঠ অন্য কে হতে পারে?

তাৎপর্য

পুত্রের কাছে পিতা যেমন পূজনীয়, তেমনই পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সকলেরই পূজনীয়। তিনি সকলের গুরু, কারণ তিনি সর্বপ্রথম ব্রহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান দান করেন এবং এখানে তিনি অর্জুনকে *ভগবদ্গীতার* তত্ত্বজ্ঞান দান করছেন। তাই তিনি হচ্ছেন আদিগুরু। সদ্‌গুরু হচ্ছেন তিনি, যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্তিত পরম্পরায় অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি না হলে, কেউই অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান দানকারী গুরুপদবাচ্য হতে পারেন না।

ভগবানকে সর্বতোভাবে প্রণাম নিবেদন করা হয়েছে। ভগবানের মহত্ত্ব অপরিমেয়। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই।

কারণ, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় জগতে এমন কেউ নেই যিনি ভগবানের সমকক্ষ অথবা ভগবানের চেয়ে শ্রেয়। সবাই ভগবানের অধস্তন। কেউই ভগবানকে অতিক্রম করতে পারে না। এই কথা *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৬/৮) বলা হয়েছে—

ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে ।
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ॥

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় ও দেহ একজন সাধারণ মানুষেরই মতো, কিন্তু ভগবানের ইন্দ্রিয়, দেহ, মন এবং ভগবান স্বয়ং অভিন্ন। যে সমস্ত মূর্খ মানুষ ভগবান সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়নি, তারা বলে যে, শ্রীকৃষ্ণের আত্মা, হৃদয়, মন ও সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমতত্ত্ব; তাই তাঁর ক্রিয়াকলাপ ও শক্তি পরম শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, যদিও তাঁর ইন্দ্রিয় আমাদের মতো নয়, তবুও তাঁর প্রতিটি অঙ্গই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে পারে। তাই, তাঁর ইন্দ্রিয় অপূর্ণ অথবা সীমিত নয়। কেউই তাঁর থেকে মহত্তর হতে পারে না। কেউই তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না। তাই, সকলেই তাঁর থেকে নিম্নতর স্তরে অবস্থিত।

পরম পুরুষোত্তমের জ্ঞান, শক্তি ও ক্রিয়াকলাপ সবই অপ্রাকৃত। *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) বলা হয়েছে—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

যাঁরা জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ চিন্ময় এবং তাঁর ক্রিয়াকলাপ দিব্য, তাঁরা মৃত্যুর পর ভগবৎ-ধামে শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যান এবং তাঁদের আর এই দুঃখময় জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। তাই আমাদের জানতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ অন্য সকলের কার্যকলাপের থেকে ভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। এভাবেই জীবন যাপন করার ফলে আমরা আমাদের জীবন সার্থক করে তুলতে পারি। শাস্ত্রে আরও বলা হয়েছে, এমন কেউ নেই যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রভু। সকলেই তাঁর ভৃত্য। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*আদি* ৫/১৪২) বলা হয়েছে, *একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য*—শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন ভগবান এবং আর সকলেই তাঁর ভৃত্য। সকলেই তাঁর আদেশ পালন করে চলেছে। এমন কেউ নেই যিনি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অমান্য করতে পারে। তাঁর অধ্যক্ষতায়, তাঁরই পরিচালনায় সকলে পরিচালিত হচ্ছে। *ব্রহ্মসংহিতাতে* বলা হয়েছে—তিনি হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ।

শ্লোক ৪৪

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্ ।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্ ॥ ৪৪ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **প্রণম্য**—প্রণাম করে; **প্রণিধায়**—দণ্ডবৎ পতিত হয়ে; **কায়ম্**—দেহ; **প্রসাদয়ে**—কৃপাভিক্ষা করছি; **ত্বাম্**—তোমার কাছে; **অহম্**—আমি; **ঈশম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ঈড্যম্**—পরমপূজ্য; **পিতা ইব**—পিতা যেমন; **পুত্রস্য**—পুত্রের; **সখা ইব**—সখা যেমন; **সখ্যুঃ**—সখার; **প্রিয়ঃ**—প্রেমিক; **প্রিয়ায়াঃ**—প্রিয়ার; **অর্হসি**—সমর্থ; **দেব**—হে দেব; **সোঢুম্**—ক্ষমা করতে।

গীতার গান

দণ্ডবৎ নমস্কার করি আমি বার বার
হে ঈশ, হে পূজ্য জগতে সবার ।
কৃপা তব ভিক্ষা চাই অন্যথা সে গতি নাই
পিতা পুত্রে যথা ব্যবহার ॥
অথবা সখার সাথে প্রিয় আর সে প্রিয়াতে
দোষ ক্ষমা হয় সে সর্বদা ।

অনুবাদ

তুমি সমস্ত জীবের পরমপূজ্য পরমেশ্বর ভগবান। তাই, আমি তোমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে তোমার কৃপাভিক্ষা করছি। হে দেব! পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, প্রেমিক যেমন প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করেন, তুমিও সেভাবেই আমার অপরাধ ক্ষমা করতে সমর্থ।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নানা রকম সম্বন্ধের দ্বারা সম্পর্কিত। কেউ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পুত্র বলে মনে করেন, কেউ তাঁকে তাঁর পতি বলে মনে করেন। কেউ আবার তাঁকে সখা অথবা প্রভু বলে মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন বন্ধুত্বের দ্বারা সম্পর্কিত। পিতা যেমন সহ্য করেন এবং পতি অথবা প্রভু যেমন সহ্য করেন, তেমনই শ্রীকৃষ্ণও সহ্য করেন।

শ্লোক ৪৫

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে ।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫ ॥

অদৃষ্টপূর্বম্—অদৃষ্টপূর্ব; **হৃষিতঃ**—আনন্দিত; **অস্মি**—হয়েছি; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **ভয়েন**—ভয়ে; **চ**—ও; **প্রব্যথিতম্**—ব্যথিত হয়েছে; **মনঃ**—মন; **মে**—আমার; **তৎ**—সেই; **এব**—অবশ্যই; **মে**—আমাকে; **দর্শয়**—দেখাও; **দেব**—হে দেব; **রূপম্**—রূপ; **প্রসীদ**—প্রসন্ন হও; **দেবেশ**—হে দেবেশ; **জগন্নিবাস**—হে জগন্নিবাস।

গীতার গান

হে দেবেশ জগন্নাথ সে সমৃদ্ধ মোর সাথ
তুষ্ট হও তথা হে ভূরীদা ॥

অনুবাদ

তোমার এই বিশ্বরূপ, যা পূর্বে কখনও দেখিনি, তা দর্শন করে আমি আনন্দিত হয়েছি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মন ভয়ে ব্যথিত হয়েছে। তাই, হে দেবেশ। হে জগন্নিবাস! আমার প্রতি প্রসন্ন হও এবং পুনরায় তোমার সেই রূপই আমাকে দেখাও।

তাৎপর্য

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিশ্বস্ত, কারণ তিনি তাঁর অন্তরঙ্গ প্রিয়সখা। প্রিয় সখা যেমন তার সখার বৈভব দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়, অর্জুনও তেমন আনন্দিত হন, যখন তিনি দেখলেন তাঁর প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান, যিনি তাঁর অমন বিস্ময়কর বিশ্বরূপ প্রদর্শন করতে পারেন। কিন্তু তখন আবার সেই বিশ্বরূপ দর্শন করে তাঁর মনে ভয় হয়, কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর বিশুদ্ধ বন্ধুত্বের ফলে না জানি কত অপরাধ তিনি করেছেন। এভাবেই ভীত হয়ে তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠে, যদিও ভয় পাবার তাঁর কোন কারণ ছিল না। অর্জুন তাই শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করছেন তাঁর চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ দেখাবার জন্য। কারণ তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যে কোন রূপ ধারণ করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের এই বিশ্বরূপ এই জগতের মতো জড় ও অনিত্য। কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে তাঁর যে দিব্য রূপ তা হচ্ছে চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ। চিদাকাশে অসংখ্য গ্রহ রয়েছে এবং সেই প্রতিটি গ্রহে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর

অংশ-প্রকাশ রূপে ভিন্ন ভিন্ন নামে বিরাজ করেন। তাই, অর্জুন বৈকুণ্ঠে যে সমস্ত রূপ প্রকাশিত তাঁর একটি রূপ দেখতে চাইলেন। যদিও প্রত্যেকটি বৈকুণ্ঠলোকে ভগবানের নারায়ণ রূপ চতুর্ভুজ, তবে তাঁর সেই চার হাতে বিভিন্নভাবে তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম প্রতীক চিহ্নগুলি ধারণ করেন। এই চারটি প্রতীক কোন্ হাতে কিভাবে তিনি ধারণ করে আছেন, সেই অনুসারে নারায়ণ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হন। এই সমস্ত রূপগুলি শ্রীকৃষ্ণের থেকে অভিন্ন। তাই, অর্জুন তাঁর সেই চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা করছেন।

শ্লোক ৪৬

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্
ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব ।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ৪৬ ॥

কিরীটিনম্—কিরীটধারী; **গদিনম্**—গদাধারী; **চক্রহস্তম্**—চক্রধারী; **ইচ্ছামি**—ইচ্ছা করি; **ত্বাম্**—তোমাকে; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করতে; **অহম্**—আমি; **তথা এব**—পূর্বের মতো; **তেন এব**—সেই; **রূপেণ**—রূপে; **চতুর্ভুজেন**—চতুর্ভুজ; **সহস্রবাহো**—হে সহস্রবাহো; **ভব**—হও; **বিশ্বমূর্তে**—হে বিশ্বমূর্তি।

গীতার গান

চতুর্ভুজ যে স্বরূপ দেখিবারে যে ইচ্ছুক
শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী ।
যে বিষ্ণু স্বরূপ হতে বিশ্বরূপ এ বিশ্বেতে
হও সে সহস্র বাহুধারী ॥

অনুবাদ

হে বিশ্বমূর্তি! হে সহস্রবাহো! আমি তোমাকে পূর্ববৎ সেই কিরীট, গদা ও চক্রধারীরূপে দেখতে ইচ্ছা করি। এখন তুমি তোমার সেই চতুর্ভুজ রূপ ধারণ কর।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতাতে (৫/৩৯) বলা হয়েছে যে, *রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্*—ভগবান শত-সহস্র রূপে নিত্যকাল বিরাজমান এবং তাঁদের মধ্যে রাম, নৃসিংহ, নারায়ণ

আদি রূপগুলিই হচ্ছে প্রধান। ভগবানের অসংখ্য রূপ আছে। কিন্তু অর্জুন জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন আদি পরমেশ্বর ভগবান, যিনি ক্ষণিকের জন্য তাঁর বিশ্বরূপ ধারণ করেছেন। এখন তিনি তাঁর চিন্ময় নারায়ণ রূপ দেখতে চাইছেন। এই শ্লোকটিতে নিঃসন্দেহে *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনা প্রতিষ্ঠিত করছে যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান এবং সমস্ত অংশ ও কলা অবতারেরা তাঁর থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ভগবান তাঁর অংশ-প্রকাশ থেকে অভিন্ন এবং সমস্ত অগণিত রূপেই তিনি ভগবান। এই সমস্ত রূপেই তিনি নবযৌবন-সম্পন্ন। সেটিই হচ্ছে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের নিত্যরূপ। শ্রীকৃষ্ণকে যিনি জানেন, তিনি তৎক্ষণাৎ এই জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ৪৭

শ্রীভগবানুবাচ
ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ময়া**—আমার দ্বারা; **প্রসন্নেন**—প্রসন্ন হয়ে; **তব**—তোমাকে; **অর্জুন**—হে অর্জুন; **ইদম্**—এই; **রূপম্**—রূপ; **পরম্**—পরম; **দর্শিতম্**—দর্শিত হল; **আত্মযোগাৎ**—আমার অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **তেজোময়ম্**—তেজোময়; **বিশ্বম্**—সমগ্র জগৎরূপী; **অনন্তম্**—অন্তহীন; **আদ্যম্**—আদি; **যৎ**—যা; **মে**—আমার; **ত্বৎ অন্যেন**—তুমি ছাড়া; **ন দৃষ্টপূর্বম্**—পূর্বে কেউ দেখেনি।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

তোমার প্রসন্ন লাগি হে অর্জুন আমি যোগী
এই জড় বিশ্বরূপ দেখ ।
আমার যোগ প্রভাবে তাহা সেই সসম্ভবে
অসম্ভব নাহি যার লেখ ॥
সেই তেজোময় বপু না দেখিল কেহ কভু
তোমার সেই প্রথম দর্শন ।

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—হে অর্জুন! আমি প্রসন্ন হয়ে তোমাকে আমার অন্তরঙ্গা শক্তি দ্বারা জড় জগতের অন্তর্গত এই শ্রেষ্ঠ রূপ দেখালাম। তুমি ছাড়া পূর্বে আর কেউই এই অনন্ত, আদি ও তেজোময় রূপ দেখেনি।

তাৎপর্য

অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন। তাই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত অর্জুনের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে তাঁকে তাঁর জ্যোতির্ময় ও ঐশ্বর্যময় বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। তাঁর এই রূপ ছিল সহস্র সূর্যের মতো উজ্জ্বল এবং তাঁর অসংখ্য মুখমণ্ডল ক্ষিপ্র গতিতে পরিবর্তিত হচ্ছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় সখা অর্জুনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্যই তাঁকে তাঁর এই রূপ দেখিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা চিৎ-শক্তির প্রভাবে এই রূপ প্রকাশ করেছিলেন, যা মানুষের বুদ্ধির অগম্য। অর্জুনের আগে কেউই ভগবানের এই বিশ্বরূপ দর্শন করেননি। কিন্তু অর্জুনকে দেখানোর ফলে অন্তরীক্ষে স্বর্গলোক ও অন্যান্য গ্রহলোকের ভক্তেরাও তাঁর এই রূপ দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর আগে কখনই তাঁরা এই রূপ দেখেননি, কিন্তু অর্জুনের জন্যই তাঁরা এই রূপ দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে অর্জুনকে তাঁর যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, পরম্পরা ধারায় অধিষ্ঠিত অন্যান্য গ্রহলোকের ভক্তেরাও তাঁর সেই রূপ দর্শন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন শান্তির প্রস্তাব নিয়ে দুর্যোধনের কাছে গিয়েছিলেন, তখন তিনি তাকেও এই রূপ দেখিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, দুর্যোধন সেই শান্তির প্রস্তাব গ্রহণ করেনি, কিন্তু সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ কতকটা তাঁর বিশ্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই রূপ অর্জুনকে যে রূপ দেখিয়েছিলেন তার থেকে ভিন্ন। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এই রূপ এর আগে কখনও কেউ দেখেনি।

শ্লোক ৪৮

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ ॥

ন—না; **বেদ**—বৈদিক জ্ঞান; **যজ্ঞ**—যজ্ঞ; **অধ্যয়নৈঃ**—অধ্যয়নের দ্বারা; **ন**—না; **দানৈঃ**—দানের দ্বারা; **ন**—না; **চ**—ও; **ক্রিয়াভিঃ**—পুণ্যকর্মের দ্বারা; **ন**—না; **তপোভিঃ**

—তপস্যার দ্বারা; **উগ্রৈঃ**—কঠোর; **এবংরূপঃ**—এই রূপে; **শক্যঃ**—যোগ্য; **অহম্**—আমি; **নৃলোকে**—এই জড় জগতে; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করতে; **ত্বৎ**—তুমি ছাড়া; **অন্যেন**—অন্য কারও দ্বারা; **কুরুপ্রবীর**—হে কুরুশ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

বেদ যজ্ঞ কিংবা দান অতি পটু অধ্যয়ন
অসমর্থ সে সব বর্ণন ॥
কিংবা উগ্র তপোবল ক্রিয়াকাণ্ড যে সকল
সাধ্য নাই এরূপ দর্শনে ।
হে কুরুপ্রবীর শুন না দেখিবে তুমি ভিন্ন
আমার সে রূপ ত্রিভুবনে ॥

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! বেদ অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, পুণ্যকর্ম ও কঠোর তপস্যার দ্বারা এই জড় জগতে তুমি ছাড়া অন্য কেউ আমার এই বিশ্ব রূপ দর্শন করতে সমর্থ নয়।

তাৎপর্য

যে দিব্যদৃষ্টি দিয়ে অর্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন, সেই দিব্য দৃষ্টি কি, তা আমাদের যথাযথভাবে বুঝতে হবে। কে দিব্যদৃষ্টির অধিকারী হতে পারেন? 'দিব্য' কথাটির অর্থ হচ্ছে দেবতুল্য। যতক্ষণ না আমরা দেবতাদের মতো দিব্য গুণাবলীতে ভূষিত হচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা দিব্যদৃষ্টি লাভ করতে পারি না। এখন কথা হচ্ছে দেবতা কারা? বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যাঁরা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ভক্ত, তাঁরাই হচ্ছেন দেবতা (*বিষ্ণুভক্তাঃ স্মৃতা দেবাঃ*)। যারা ভগবৎ-বিদ্বেষী অর্থাৎ যারা শ্রীবিষ্ণুকে বিশ্বাস করে না, অথবা যারা শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ রূপকেই পরমতত্ত্ব বলে মনে করে, তাদের পক্ষে দিব্যদৃষ্টি লাভ করা কখনই সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করা এবং সেই সঙ্গে দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া কখনই সম্ভব নয়। দৈব গুণাবলীতে বিভূষিত না হলে কখনই দিব্যদৃষ্টি লাভ করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে বলা যায়, যাঁরা দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁরাও অর্জুনের মতো দর্শন করতে পারেন।

ভগবদ্গীতায় ভগবানের বিশ্বরূপের বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও অর্জুনের পূর্বে এই বিবরণ সকলের কাছে অজ্ঞাত ছিল, এখন এই ঘটনার পরে ভগবানের বিশ্বরূপ

সম্পর্কে আমরা কিছুটা ধারণা করতে পারি। যাঁরা যথার্থ দৈবগুণ-সম্পন্ন, তাঁরা ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করতে পারেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত না হলে কেউই দিব্য পদবাচ্য হতে পারেন না। ভগবদ্ভক্ত, যাঁরা যথার্থ দিব্য প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত এবং যাঁদের দিব্যদৃষ্টি আছে, তাঁরা কিন্তু ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য উৎসুক নন। পূর্ববর্তী শ্লোকে যে কথা বলা হয়েছে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন এবং ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে তিনি প্রকৃতপক্ষে ভীত হয়েছিলেন।

এই শ্লোকে *বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ* কথাগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, যা বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন এবং যজ্ঞবিধির বিষয়বস্তুকে উল্লেখ করে। *বেদ* বলতে সব রকমের বৈদিক শাস্ত্রকে বোঝায়, যেমন—চতুর্বেদ (ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব), অষ্টাদশ *পুরাণ, উপনিষৎ* ও *বেদান্তসূত্র*। এই সমস্ত শাস্ত্র গৃহে অথবা অন্য কোথাও পাঠ করা যায়। তেমনই, বৈদিক যজ্ঞবিধির অনুশীলন করবার জন্য *কল্পসূত্র* ও *মীমাংসাসূত্র* রয়েছে। *দানৈঃ* শব্দে যোগ্য পাত্রে দান করার কথা বলা হয়েছে, যেমন ভক্তিভরে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের দান করা। তেমনই, 'পুণ্যকর্ম' বলতে অগ্নিহোত্র ও বর্ণাশ্রম ধর্মকে উল্লেখ করে। আর ইচ্ছাকৃত দৈহিক ক্লেশ স্বীকার করাকে বলা হয় তপস্যা। সুতরাং, সকলেই এই সমস্ত আচরণ করতে পারেন—দৈহিক ক্লেশ স্বীকার করতে পারেন, দান করতে পারেন, *বেদ* পাঠ করতে পারেন—কিন্তু যতক্ষণ না তিনি অর্জুনের মতো ভগবদ্ভক্তে পরিণত হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর পক্ষে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করা সম্ভব নয়। যাঁরা নির্বিশেষবাদী, তাঁরাও কল্পনা করছেন যে, তাঁরা ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করছেন। কিন্তু *ভগবদ্গীতা* থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, নির্বিশেষবাদীরা ভগবদ্ভক্ত নয়। তাই, তাদের পক্ষে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করা কখনই সম্ভব নয়।

অনেক মানুষ আছে যারা অবতার তৈরি করে। তারা ভ্রান্তভাবে কোন সাধারণ মানুষকে ভগবানের অবতার বলে অপপ্রচার করে। কিন্তু এগুলি হচ্ছে নিতান্তই মূর্খতা। আমাদের *ভগবদ্গীতার* তত্ত্ব গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে পূর্ণরূপে দিব্যজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে না। যদিও *ভগবদ্গীতাকে* ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞানের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা বলে মনে করা হয়, তবুও এটি এতই নিখুঁত যে, তাঁর মাধ্যমে আমরা কোন্‌টা কি সেই বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারি। কোন নকল অবতারের চেলাও বলতে পারে যে, তারাও ভগবানের দিব্য অবতার বা বিশ্বরূপ দর্শন করেছে, কিন্তু তাঁদের সেই দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত না হলে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করা সম্ভব

নয়। সুতরাং সর্বপ্রথমে তাঁকে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হতে হবে; তার পরে তিনি দাবি করতে পারেন যে, বিশ্বরূপ বা অন্য যে রূপ তিনি দর্শন করেছেন, তা তিনি অন্যদের দেখাতে পারেন। কৃষ্ণভক্ত কখনই মেকি অবতার ও তাদের চেলাদের মেনে নিতে পারেন না।

শ্লোক ৪৯

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্ ।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥

মা—না হোক; তে—তোমার; **ব্যথা**—কষ্ট; মা—না হোক; চ—ও; **বিমূঢ়ভাবঃ**—মোহাচ্ছন্নতা; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **রূপম্**—রূপ; **ঘোরম্**—ভয়ংকর; **ঈদৃক্**—এই প্রকার; মম—আমার; ইদম্—এই; ব্যপেতভীঃ—সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়ে; **প্রীতমনাঃ**—প্রসন্নচিত্তে; পুনঃ—পুনরায়; **ত্বম্**—তুমি; তৎ—তা; এব—এভাবে; মে—আমার; রূপম্—রূপ; ইদম্—এই; প্রপশ্য—দর্শন কর।

গীতার গান

দিব না তোমাকে ব্যথা বিভ্রম হয়েছে যথা
দেখি মোর এই ঘোর রূপ ।
ছাড় ভয় প্রীত হও পুনঃ শান্তি প্রাপ্ত হও
দেখ মোর যে নিত্য স্বরূপ ॥

অনুবাদ

আমার এই প্রকার ভয়ঙ্কর বিশ্বরূপ দেখে তুমি ব্যথিত ও মোহাচ্ছন্ন হয়ো না। সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়ে এবং প্রসন্ন চিত্তে তুমি পুনরায় আমার এই চতুর্ভুজ রূপ দর্শন কর।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার প্রারম্ভে অর্জুন তাঁর পরম পূজ্য পিতামহ ভীষ্মদেব ও গুরুদেব দ্রোণাচার্যকে হত্যা করার কথা চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ

তাঁকে বললেন যে, তাঁর পিতামহকে হত্যা করার ব্যাপারে তাঁর আতঙ্কিত হওয়া উচিত নয়। কৌরবদের রাজসভায় যখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করছিল, তখন ভীষ্ম ও দ্রোণ নীরব ছিলেন। ধর্ম আচরণে এই অবহেলার জন্য তাঁদের হত্যা করাই উচিত। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখালেন, কেবল তাঁকে এটি বুঝিয়ে দেবার জন্য যে, তাঁদের অনৈতিক আচরণের ফলে তাঁরা ইতিমধ্যেই হত হয়েছেন। অর্জুনকে এই দৃশ্য দেখানো হয়েছিল কারণ ভক্তেরা সর্বদাই শান্তিপ্রিয় এবং তাঁরা এই ধরনের বীভৎস কাজ করতে পারেন না। সেই উদ্দেশ্যে তাঁকে বিশ্বরূপ দেখানো হয়েছিল। এখন অর্জুন ভগবানের চতুর্ভুজ রূপ দেখতে চাইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তাও দেখালেন। ভক্ত ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে তেমন আগ্রহী নন, কেন না এই রূপের সঙ্গে প্রেমানুভূতির আদান-প্রদানের কোন সম্ভাবনা থাকে না। ভক্ত সর্বদাই শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ভগবানকে তাঁর হৃদয়ের ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করতে চান। তাই, তিনি দ্বিভুজধারী শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করতে চান, যাতে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে তিনি তাঁর প্রেমভক্তি বিনিময় করতে পারেন।

শ্লোক ৫০

সঞ্জয় উবাচ

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০ ॥

সঞ্জয়ঃ উবাচ—সঞ্জয় বললেন; **ইতি**—এভাবে; **অর্জুনম্**—অর্জুনকে; **বাসুদেবঃ**—কৃষ্ণ; **তথা**—সেভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **স্বকম্**—তাঁর নিজের; **রূপম্**—রূপ; **দর্শয়ামাস**—দেখালেন; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **আশ্বাসয়ামাস**—আশ্বস্ত করলেন; **চ**—ও; **ভীতম্**—ভীত; **এনম্**—তাঁকে; **ভূত্বা**—হয়ে; **পুনঃ**—পুনর্বার; **সৌম্যবপুঃ**—প্রসন্নমূর্তি; **মহাত্মা**—মহাত্মা।

গীতার গান

সঞ্জয় কহিলেন ঃ

সে কথা বলিয়া হরি অর্জুনকে লক্ষ্য করি
বাসুদেব ভগবান পুনঃ।

নিজ চতুর্ভুজ রূপ দেখাইছ অপরূপ
পূর্ণ ব্রহ্ম অপ্রাকৃত গুণ ॥
তারপর নিত্যরূপ শ্রীকৃষ্ণের যেই রূপ
দ্বিভুজ মূরতি আবির্ভাব।
পুনর্বার হল সৌম স্বরূপের যে মাহাত্ম্য
আশ্বাসনে ফিরিল স্বভাব ॥

অনুবাদ

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন—মহাত্মা বাসুদেব অর্জুনকে এভাবেই বলে তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দেখালেন এবং পুনরায় দ্বিভুজ সৌম্যমূর্তি ধারণ করে ভীত অর্জুনকে আশ্বস্ত করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ যখন বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হন, তখন তিনি সর্বপ্রথমে চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে প্রকাশিত হন, কিন্তু তাঁর পিতা-মাতা যখন তাঁকে অনুরোধ করলেন, তখন তিনি নিজেকে একটি সাধারণ শিশুতে রূপান্তরিত করেন। তেমনই শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে, অর্জুন তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দর্শনে আগ্রহী নন। কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁর চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি তাঁকে আবার সেই রূপ দেখালেন এবং তার পরে তাঁর দ্বিভুজ রূপ দেখালেন। এখানে *সৌম্যবপুঃ* কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *সৌম্যবপুঃ* কথাটির অর্থ হচ্ছে অত্যন্ত সুন্দর রূপ। ভগবানের দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপ হচ্ছে তাঁর সবচেয়ে সুন্দর রূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে প্রকট ছিলেন, তখন সকলেই তাঁর রূপে আকৃষ্ট হতেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বচরাচরের নিয়ন্তা, তাই তিনি তাঁর ভক্ত অর্জুনের সমস্ত ভয় বিদূরিত করলেন এবং তাঁকে আবার তাঁর দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপ দেখালেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৩৮) বলা হয়েছে, *প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন*—প্রেমাঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত ভক্তি নয়নেই কেবল শ্রীকৃষ্ণের শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করা যায়।

শ্লোক ৫১

অর্জুন উবাচ

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **ইদম্**—এই; **মানুষম্**—মানুষ; **রূপম্**—রূপ; **তব**—তোমার; **সৌম্যম্**—সৌম্য; **জনার্দন**—হে জনার্দন; **ইদানীম্**—এখন; **অস্মি**—হই; **সংবৃত্তঃ**—স্থির হল; **সচেতাঃ**—চিত্ত; **প্রকৃতিম্**—প্রকৃতিস্থ; **গতঃ**—হলাম।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

দেখিয়া তোমার এই মনুষ্য-স্বরূপ ।
হে জনার্দন পেয়েছি ফিরি মোর রূপ ॥
সংবৃত্ত হয়েছি আমি সচেতা প্রকৃতি ।
ইদানীং সে চিত্ত স্থির স্বাভাবিক গতি ॥

অনুবাদ

অর্জুন বললেন—হে জনার্দন! তোমার এই সৌম্য মানুষমূর্তি দর্শন করে এখন আমার চিত্ত স্থির হল এবং আমি প্রকৃতিস্থ হলাম।

তাৎপর্য

এখানে *মানুষং রূপম্* কথাটির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বোঝানো হচ্ছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের আদি স্বরূপ হচ্ছে দ্বিভুজ। যারা শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তাঁকে অবজ্ঞা করে, এখানে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, তারা তাঁর দিব্য প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণ যদি একজন সাধারণ মানুষ হতেন, তা হলে তাঁর পক্ষে বিশ্বরূপ এবং তারপর চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ দেখানো কি করে সম্ভব হত? *ভগবদ্গীতাতে* তাই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করে যারা নির্বোধের মতো প্রচার করে যে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে নির্বিশেষ যে ব্রহ্ম, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমে কথা বলছেন, তারা অত্যন্ত অন্যায় করছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিশ্বরূপ ও তাঁর চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ দেখিয়েছেন। তা হলে শ্রীকৃষ্ণ কি করে একজন সাধারণ মানুষ হতে পারেন? *ভগবদ্গীতার* ভ্রান্ত ব্যাখ্যার দ্বারা শুদ্ধ ভক্তেরা কখনই বিভ্রান্ত হন না, কারণ তাঁরা জানেন কোন্‌টি কি। *ভগবদ্গীতার* মূল শ্লোকগুলি সূর্যের মতো উজ্জ্বল। তাই, তা দর্শন করবার জন্য মূর্খ ভাষ্যকারদের ভাষ্যরূপ মশালের আলোর প্রয়োজন হয় না।

শ্লোক ৫২

শ্রীভগবানুবাচ

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম ।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ৫২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **সুদুর্দর্শম্**—অতি দুর্লভ দর্শন; **ইদম্**—এই; **রূপম্**—রূপ; **দৃষ্টবান্ অসি**—দেখলে; **যৎ**—যে; **মম**—আমার; **দেবাঃ**—দেবতারা; **অপি**—ও; **অস্য**—এই; **রূপস্য**—রূপের; **নিত্যম্**—সর্বদা; **দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ**—দর্শনাকাঙ্ক্ষী।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

আমার দ্বিভুজ রূপ দুর্লভ দর্শন ।
তুমি যা হেরিছ আজ হয়ে একমন ॥
ব্রহ্মা শিব আদি দেব সে আকাঙ্ক্ষা করে ।
শুদ্ধ ভক্ত হয় যারা বুঝিবারে পারে ॥

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—তুমি আমার যে রূপ এখন দেখছ তা অত্যন্ত দুর্লভ দর্শন। দেবতারাও এই রূপের সর্বদা দর্শনাকাঙ্ক্ষী।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের অষ্টচত্বারিংশতি শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিশ্বরূপ প্রকাশ করে উপসংহারে অর্জুনকে বললেন যে, তাঁর সেই রূপ বহু পুণ্যকর্ম, বেদ অধ্যয়ন, যজ্ঞ কিংবা দানের মাধ্যমে দর্শন করা সম্ভব নয়। এখানে *সুদুর্দর্শম্* কথাটির মাধ্যমে বুঝানো হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ রূপটি আরও গোপনীয়। বেদ অধ্যয়ন, জ্ঞান, তপশ্চর্যা আদি বিবিধ ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে একটু ভক্তিযোগ মিশিয়ে দিলে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করা যেতে পারে। তা সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু ভক্তির সংযোগ না থাকলে তা কোন মতেই সম্ভব নয়। সেই কথা আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু এই বিশ্বরূপের ঊর্ধ্বে শ্রীকৃষ্ণের যে দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপ তা

দর্শন করা ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের পক্ষেও দুর্লভ। তাঁরাও তাঁকে দর্শন করতে চান এবং *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি যখন তাঁর মাতা দেবকীর গর্ভে অবস্থান-লীলা করছিলেন, তখন তাঁর বিস্ময়কর লীলা দর্শন করবার জন্য স্বর্গের সমস্ত দেব-দেবীরা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁরা ভগবানের উদ্দেশ্যে মনোরম স্তবস্তুতি নিবেদন করছিলেন, যদিও তিনি তখনও তাঁদের সম্মুখে দৃশ্যমান হননি। এমন কি তাঁর দর্শন লাভ করার জন্য তাঁরা প্রতীক্ষা করেছিলেন। মূর্খ লোকেরা তাঁকে সাধারণ মানুষ মনে করে অবজ্ঞা করতে পারে এবং শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়ে তাঁর অন্তরস্থিত নির্বিশেষ কোনও কিছু কাল্পনিক সত্তাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারে, কিন্তু সেই সবই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। ব্রহ্মা, শিব আদি মহান দেবতারাও শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করবার জন্য আকুল হয়ে আছেন।

ভগবদ্গীতাতে (৯/১১) এই কথাও প্রতিপন্ন হয়েছে, *অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্*—যারা তাঁকে অবজ্ঞা করে, সেই সমস্ত মূঢ় ব্যক্তির কাছে তিনি দৃষ্টিগোচর হন না। শ্রীকৃষ্ণের দেহ সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়, আনন্দময় ও নিত্য এবং সেই কথা *ব্রহ্মসংহিতাতে* প্রতিপন্ন হয়েছে এবং *ভগবদ্গীতাতে* শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রতিপন্ন করেছেন, তাঁর দেহ কখনই জড় দেহের মতো নয়। কিন্তু যারা *ভগবদ্গীতা* অথবা অনুরূপ বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করে বুদ্ধির মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে, তাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, তারা যখন জড় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে চেষ্টা করে, তখন তাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক পুরুষ এবং মস্ত বড় দার্শনিক পণ্ডিতরূপে প্রতীত হয়। কিন্তু তিনি কোন সাধারণ মানুষ নন। তবুও কিছু মানুষ মনে করে যে, যদিও তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন, তবুও তাঁকে জড় দেহ ধারণ করতে হয়েছিল। পরিণামে তারা মনে করে যে, পরমতত্ত্ব হচ্ছেন নির্বিশেষ, নিরাকার। তাই তারা মনে করে যে, সেই নিরাকার রূপ থেকে এই জড় জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি সবিশেষ রূপ তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে এটি একটি জড়-জাগতিক বিচার-বিবেচনা। আর একটি বিচার-বিবেচনা হচ্ছে কল্পনাপ্রসূত। যারা জ্ঞানের অন্বেষণ করছে, তারাও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নানা রকম কল্পনা করে এবং তারা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর বিশ্বরূপের থেকেও কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। এভাবেই অনেকে মনে করে, অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, তা তাঁর স্বরূপ থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মতে, পরমেশ্বরের সাকার রূপ কল্পনা মাত্র। তারা বিশ্বাস করে যে, চরম স্তরে পরমতত্ত্ব কোন পুরুষ নন। কিন্তু *ভগবদ্গীতার* চতুর্থ অধ্যায়ে অপ্রাকৃত তত্ত্ব লাভের পন্থা

যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ করাকেই বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেটিই হচ্ছে যথার্থ বৈদিক পন্থা এবং যাঁরা যথাযথভাবে সেই বৈদিক ধারার অনুসরণ করেছেন, তাঁরা ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞানীর কাছে কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ করেন এবং বারবার তাঁর কথা শুনতে শুনতে তাঁদের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি জন্মায়। আমরা পূর্বে কয়েকবার আলোচনা করেছি যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর যোগমায়া শক্তির দ্বারা আবৃত থাকেন। তিনি যার-তার কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না। যাঁর কাছে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন, তিনিই কেবল তাঁকে দেখতে পান। বৈদিক শাস্ত্রে সেই কথা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। যিনি নিজেকে সর্বতোভাবে ভগবানের চরণে সমর্পণ করেছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারেন। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তায় মগ্ন থেকে এবং ভক্তিযোগে কৃষ্ণসেবা করার ফলে সাধকের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হয় এবং তিনি তখন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে পারেন। এই ধরনের দিব্য দর্শন স্বর্গের দেব-দেবীদের পক্ষেও সচরাচর সম্ভব হয় না। তাই, কৃষ্ণতত্ত্ব উপলব্ধি করা এমন কি দেব-দেবীদের পক্ষেও দুষ্কর এবং উন্নত স্তরের দেবতারা শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ রূপ দর্শন করবার জন্য সর্বদাই উৎসুক হয়ে থাকেন। এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করা খুবই দুষ্কর এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু তাঁর শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করা তাঁর থেকে অনেক অনেক বেশি দুষ্কর।

শ্লোক ৫৩

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ ॥

ন—না; **অহম্**—আমি; **বেদৈঃ**—বেদ অধ্যয়নের দ্বারা; **ন**—না; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **ন**—না; **দানেন**—দানের দ্বারা; **ন**—না; **চ**—ও; **ইজ্যয়া**—পূজার দ্বারা; **শক্যঃ**—সমর্থ হয়; **এবংবিধঃ**—এই প্রকার; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করতে; **দৃষ্টবান্**—দেখছ; **অসি**—তুমি; **মাম্**—আমার; **যথা**—যেরূপ।

গীতার গান

বেদ নিষ্ঠা জপ তপ কিংবা দান পুণ্য।
পূজাপাঠ যত কিছু ধর্মপথ অন্য ॥
কোনটাই নহে যোগ্য এ রূপ দেখিতে।
যদ্যপি সে অবতীর্ণ আমি পৃথিবীতে ॥

অনুবাদ

তুমি তোমার দিব্য চক্ষুর দ্বারা আমার যেরূপ দর্শন করছ, সেই প্রকার আমাকে বেদ অধ্যয়ন, তপস্যা, দান ও পূজার দ্বারা কেউই দর্শন করতে সমর্থ হয় না।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁর মাতা দেবকী ও পিতা বসুদেবের সামনে চতুর্ভুজ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হন এবং তার পরে তিনি তাঁর দ্বিভুজ রূপে রূপান্তরিত হন। যারা ভগবৎ-বিদ্বেষী নাস্তিক অথবা ভক্তিবিহীন, তাদের পক্ষে এই রহস্যের মর্ম উপলব্ধি করা অত্যন্ত দুষ্কর। যে সমস্ত পণ্ডিতেরা ব্যাকরণের জ্ঞানের দ্বারা অথবা পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করেছেন, তাঁদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে জানা অত্যন্ত দুষ্কর। এমন কি যাঁরা কেবল নামে মাত্র মন্দিরে গিয়ে পূজা অর্চনা করেন, তাঁদের পক্ষেও ভগবানকে জানা সম্ভব নয়। তাঁরা কেবল মন্দিরেই যান, কিন্তু তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর স্বরূপে জানতে পারেন না। কেবল মাত্র ভক্তিযোগের মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারা যায়। সেই কথা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই পরবর্তী শ্লোকে ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্লোক ৫৪

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন ।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥

ভক্ত্যা—ভক্তির দ্বারা; **তু**—কিন্তু; **অনন্যয়া**—কর্ম ও জ্ঞানের আবরণ থেকে মুক্ত; **শক্যঃ**—সমর্থ; **অহম্**—আমি; **এবংবিধঃ**—এই প্রকার; **অর্জুন**—হে অর্জুন; **জ্ঞাতুম্**—জানতে; **দ্রষ্টুম্**—দেখতে; **চ**—ও; **তত্ত্বেন**—তত্ত্বত; **প্রবেষ্টুম্**—প্রবেশ করতে; **চ**—ও; **পরন্তপ**—হে পরন্তপ।

গীতার গান

অনন্য ভক্তি যে হয় একমাত্র কাম ।
হে অর্জুন দেখিবারে যোগ্য মোর ধাম ॥
সেই সে বুঝিতে পারে তত্ত্বে দেখিবারে ।
নিত্য লীলাতে মোর সে প্রবেশ করে ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! হে পরন্তপ! অনন্য ভক্তির দ্বারাই কিন্তু এই প্রকার আমাকে তত্ত্বত জানতে, প্রত্যক্ষ করতে এবং আমার চিন্ময় ধামে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়।

তাৎপর্য

অনন্য ভক্তির মাধ্যমেই কেবল শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারা যায়। এই শ্লোকে ভগবান নিজেই স্পষ্টভাবে সেই কথার বিশ্লেষণ করেছেন, যাতে তত্ত্বজ্ঞান-বর্জিত ভাষ্যকারেরা, যাঁরা মনোধর্ম-প্রসূত জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে *ভগবদ্গীতার* তত্ত্ব জানবার চেষ্টা করেন, তাঁরা বুঝতে পারেন যে, *ভগবদ্গীতার* ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে তাঁরা কেবল তাঁদের সময়েরই অপচয় করছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে কে, তা কেউই জানতে পারে না। কেউই বুঝতে পারে না কিভাবে তিনি তাঁর চতুর্ভুজ রূপ নিয়ে তাঁর জনক-জননীর সামনে আবির্ভূত হলেন এবং তার পরেই তাঁর দ্বিভুজ রূপে রূপান্তরিত হলেন। *বেদ* অধ্যয়ন করে কিংবা দার্শনিক জল্পনা-কল্পনা করে এই সব ব্যাপার বুঝতে পারা খুবই কঠিন। এখানে তাই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কেউই তাঁকে দেখতে পায় না কিংবা এই সব তত্ত্ব-উপলব্ধিতে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু যাঁরা বৈদিক শাস্ত্রের অভিজ্ঞ ছাত্র, তাঁরাই কেবল বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে নানাভাবে তাঁকে জানতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্রে নানা রকম বিধি-নিষেধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণকে জানতে চায়, তা হলে তাকে শাস্ত্রের এই সমস্ত নির্দেশগুলি মানতে হবে। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কৃচ্ছ্রসাধন করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করতে হলে আমরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উপলক্ষ্যে জন্মাষ্টমীতে এবং প্রতি মাসে দুটি একাদশীতে উপবাস-ব্রত পালন করতে পারি। দান সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, দান তাঁদেরকেই করতে হবে, যাঁরা সারা বিশ্ব জুড়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচারে রত। কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে মানব-সমাজের প্রতি ভগবানের আশীর্বাদ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ মহাবদান্য অবতার বলে সম্ভাষণ করেছেন, কারণ ব্রহ্মার দুর্লভ যে কৃষ্ণপ্রেম তা তিনি অকাতরে সকলকে বিতরণ করেছেন। সুতরাং, কেউ যদি তাঁর রোজগারের কিছু অংশ শ্রীকৃষ্ণের বাণী প্রচারে রত ভক্তদের দান করেন এবং সেই দান যদি কৃষ্ণভাবনামৃত বিস্তারের জন্য নিয়োজিত হয়, তবে সেটি হবে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দান। আর কেউ যদি মন্দিরের বিধিবিধান অনুযায়ী আরাধনা করেন (ভারতবর্ষের মন্দিরগুলিতে সাধারণত শ্রীবিষ্ণুর বা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ বিরাজ করেন), তা হলে পরমেশ্বর ভগবানকে পূজা ও সম্মান নিবেদন করার দ্বারা উন্নতি সাধনের এটি একটি বিরাট

সুযোগ। কনিষ্ঠ অধিকারী অর্থাৎ ভক্তিমার্গে যারা নবীন, তাদের পক্ষে মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা অর্চন করা আবশ্যক। বৈদিক শাস্ত্রে (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/২৩) সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

ভগবানের প্রতি যিনি অপ্রতিহতা ভক্তিসম্পন্ন এবং ভগবানের প্রতি যেই রকম গুরুদেবের প্রতিও সেই রকম ভক্তিসম্পন্ন, তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। কেবল মাত্র মানসিক জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে বুঝা যায় না। যে সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা লাভ করেনি, তার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জানা অসম্ভব। এখানে *তু* শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে অন্য কোনও পন্থা ব্যবহার করা যাবে না, অনুমোদন করতে পারা যাবে না, কিংবা সফল হবে না।

শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ রূপ অর্জুনকে প্রদর্শিত বিশ্বরূপ থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। চতুর্ভুজধারী নারায়ণ রূপ এবং দ্বিভুজধারী শ্রীকৃষ্ণরূপ হচ্ছেন নিত্য ও অপ্রাকৃত, কিন্তু অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখানো হয়েছিল তা হচ্ছে অনিত্য। *সুদুর্দর্শম্* শব্দটির অর্থ 'দর্শন করা অত্যন্ত দুষ্কর'। অর্থাৎ তাঁর সেই বিশ্বরূপ কেউই দর্শন করেননি। ভগবান এখানে এটিও বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, তাঁর ভক্তকে তাঁর সেই রূপ দেখাবার কোন প্রয়োজনও হয় না। অর্জুনের অনুরোধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই রূপ দেখিয়েছিলেন, যাতে ভবিষ্যতে কেউ যদি ভগবানের অবতার বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে চান, তা হলে তিনি সত্যি সত্যি ভগবানের অবতার কি না তা জানবার জন্য মানুষ তাঁকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখানোর কথা বলতে পারে।

পূর্ববর্তী শ্লোকটিতে *ন* শব্দটি বারে বারে ব্যবহার করা হয়েছে যাতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বৈদিক শাস্ত্রে পুঁথিগত শিক্ষা লাভের প্রশংসা অর্জনের প্রতি বেশি গর্বিত হওয়া কারও পক্ষে উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তি অনুশীলনেই নিবিষ্ট থাকা প্রয়োজন। কেবল মাত্র তবেই *ভগবদ্গীতার* ভাষ্য রচনায় প্রচেষ্টা করা যেতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিশ্বরূপ থেকে চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপে রূপান্তরিত হলেন এবং তার পরে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ দ্বিভুজ শ্যামসুন্দরে রূপান্তরিত হলেন। এর থেকে বুঝা যায় যে, বৈদিক শাস্ত্রে তাঁর যে চতুর্ভুজ এবং অন্যান্য রূপের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ রূপ থেকে প্রকাশিত হয়েছেন। দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সব কিছুর উৎস। নির্বিশেষ ব্রহ্মের কথা

তো দূরে থাক, তাঁর এই সমস্ত রূপ থেকেও শ্রীকৃষ্ণ স্বতন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ রূপ সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তাঁর অভিন্ন চতুর্ভুজ প্রকাশ (যাঁকে মহাবিষ্ণু নামে সম্বোধন করা হয়, যিনি কারণ সমুদ্রে শয়ন করে আছেন এবং যাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হচ্ছে এবং লয় হচ্ছে), তিনিও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ। তাই *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪৮) বলা হয়েছে—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলোজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"মহাবিষ্ণু, যাঁর মধ্যে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রবেশ করছে এবং কেবল মাত্র যাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেগুলি আবার তাঁর মধ্য থেকে প্রকাশিত হচ্ছে, তিনিও হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ।" তাই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সবিশেষ রূপ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম আরাধ্য এবং তিনি হচ্ছেন সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। তিনিই হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত রূপের উৎস, তিনি হচ্ছেন সমস্ত অবতারের রূপের উৎস এবং তিনি হচ্ছেন আদিপুরুষ। সেই তত্ত্ব *ভগবদ্গীতায়* সর্বতোভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে।

বৈদিক শাস্ত্রে (*গোপালতাপনী উপনিষদ* ১/১) উল্লেখ আছে—

সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে ।
নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে ॥

"আমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপন করছি, যাঁর অপ্রাকৃত রূপ হচ্ছে সৎ, চিৎ ও আনন্দময়। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি, কারণ তাঁকে জানার অর্থ সমগ্র *বেদকে* জানা এবং সেই কারণেই তিনি হচ্ছেন পরম গুরু।" তার পরে বলা হয়েছে, *কৃষ্ণো বৈ পরমং দৈবতম্*—"শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান।" (*গোপালতাপনী* ১/৩) *একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ*—"সেই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম ভগবান এবং তিনিই আরাধ্য।" *একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি*—"শ্রীকৃষ্ণ এক, কিন্তু তিনি অনন্ত রূপ ও অবতারের মাধ্যমে প্রকাশিত হন।" (*গোপালতাপনী* ১/২১)

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/১) বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"পরম পুরুষোত্তম ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর নিত্য, জ্ঞানময় ও আনন্দময় একটি শরীর আছে। তাঁর কোনও আদি নেই, কেন না তিনি সব কিছুরই উৎস। তিনি হচ্ছেন সকল কারণের কারণ।"

অন্যত্র বলা হয়েছে, *যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি* —"সেই পরমতত্ত্ব হচ্ছেন সবিশেষ পুরুষ, তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি কখনও কখনও এই জগতে অবতরণ করেন।" তেমনই, *শ্রীমদ্ভাগবতে* পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সমস্ত অবতারের বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেই তালিকায় শ্রীকৃষ্ণের নামও আছে। কিন্তু তারপর সেখানে বলা হয়েছে যে, এই শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অবতার নন, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম ভগবান (*এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্*)। তেমনই, *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলছেন, *মত্তঃ পরতরং নান্যৎ*—"আমার পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রূপের থেকে উত্তম আর কিছুই নেই।" *ভগবদ্গীতায়* তিনি আরও বলেছেন, *অহমাদির্হি দেবানাম্* —"সমস্ত দেবতাদের আদি উৎস হচ্ছি আমি।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে ভগবৎ-তত্ত্ব অবগত হওয়ার ফলে অর্জুনও সেই সম্বন্ধে বলছেন, *পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্*—"এখন আমি সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পেরেছি যে, তুমি হচ্ছ পরম পুরুষোত্তম ভগবান, পরমতত্ত্ব এবং তুমি হচ্ছ সকলের পরম আশ্রয়।" তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, তা ভগবানের আদি স্বরূপ নয়। তাঁর আদি স্বরূপে তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। সহস্র সহস্র হস্ত ও পদবিশিষ্ট তাঁর যে বিশ্বরূপ, তা কেবল তাদেরকেই আকৃষ্ট করবার জন্য যাদের ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তি নেই। এটি ভগবানের আদি স্বরূপ নয়।

যাঁরা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, যাঁরা ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত রসে প্রেমভক্তিতে যুক্ত, বিশ্বরূপ তাঁদের আকৃষ্ট করে না। শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে ভগবান তাঁর ভক্তদের সঙ্গে অপ্রাকৃত প্রেম বিনিময় করেন। তাই অর্জুন, যিনি সখ্যরসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁর কাছে এই বিশ্বরূপের প্রকাশ মোটেই আনন্দদায়ক ছিল না। বরং, তা ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল। অর্জুন, যিনি হচ্ছেন ভগবানের নিত্য সহচর, অবশ্যই দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি কোন সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তাই, তিনি বিশ্বরূপের দ্বারা আকৃষ্ট হননি। যারা সকাম কর্মের দ্বারা নিজেদের উন্নীত করতে চান, তাদের কাছে এই রূপ অতি আশ্চর্যজনক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যাঁরা ভক্তিযোগে ভগবানের সেবায় রত, তাঁদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ রূপই হচ্ছে সবচেয়ে প্রিয়।

শ্লোক ৫৫

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ ॥

মৎকর্মকৃৎ—আমার কর্মে যুক্ত; **মৎপরমঃ**—মৎপরায়ণ; **মদ্ভক্তঃ**—আমাতে ভক্তিযুক্ত; **সঙ্গবর্জিতঃ**—জড় বিষয়ে আসক্তি রহিত; **নির্বৈরঃ**—শত্রুভাব রহিত; **সর্বভূতেষু**—সর্ব জীবের প্রতি; **যঃ**—যিনি; **সঃ**—তিনি; **মাম্**—আমাকে; **এতি**—লাভ করেন; **পাণ্ডব**—হে পাণ্ডুপুত্র।

গীতার গান

আমার সন্তোষ লাগি কর সব কর্ম ।
নিত্য যুক্ত মোর ভক্ত সে পরম ধর্ম ॥
তার কোন শত্রু নাই সর্বভূত মাঝে ।
সেই মোর শুদ্ধ ভক্ত থাকে মোর কাছে ॥

অনুবাদ

হে অর্জুন! যিনি আমার অকৈতব সেবা করেন, আমার প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ, আমার ভক্ত, জড় বিষয়ে আসক্তি রহিত এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি শত্রুভাব রহিত, তিনিই আমাকে লাভ করেন।

তাৎপর্য

কেউ যদি চিৎ-জগতের কৃষ্ণলোকে সমস্ত ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত হতে চান, তা হলে তাঁকে এই বিধি অনুশীলন করতেই হবে, যা পরমেশ্বর ভগবান নিজেই বলে দিয়েছেন। তাই, এই শ্লোকটিকে *ভগবদ্গীতার* নির্যাস বলে মনে করা হয়। *ভগবদ্গীতা* এমনই একটি শাস্ত্রগ্রন্থ, যা বদ্ধ জীবদের সঠিক পথে পরিচালিত করে। এই সমস্ত বদ্ধ জীব পারমার্থিক জীবনের যথার্থ লক্ষ্য সম্বন্ধে বিস্মৃত হয়ে প্রকৃতির উপরে প্রভুত্ব করবার উদ্দেশ্যে জড় জগতে নিরন্তর সংগ্রাম করে চলেছে। *ভগবদ্গীতার* উদ্দেশ্য হচ্ছে কিভাবে আমরা দিব্য জীবন লাভ করতে পারি এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি তা প্রদর্শন করা এবং কিভাবে আমরা ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারি, সেই সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া। এখানে এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে যথার্থ

পদ্ধতির ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যার দ্বারা আমরা পারমার্থিক ক্রিয়াকলাপ—ভক্তিযোগে সাফল্য লাভ করতে পারি।

আমাদের সমস্ত শক্তি সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপে রূপান্তরিত করা উচিত। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (পূর্ব ২/২৫৫) বলা হয়েছে—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধযুক্ত ছাড়া অন্য কোন রকম কাজ করাই উচিত নয়। এই ধরনের কাজকে বলা হয় *কৃষ্ণকর্ম*। আমরা নানা রকমের কাজকর্মে লিপ্ত হতে পারি, কিন্তু সেই কর্মফল ভোগ করার প্রতি আমাদের আসক্ত হওয়া উচিত নয়। আমাদের সমস্ত কর্মের ফল তাঁকেই অর্পণ করা উচিত। যেমন, কেউ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁর সেই কার্যকলাপ কৃষ্ণভাবনামৃতে রূপান্তরিত করতে হলে, তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যবসা করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ যদি সেই ব্যবসায়ের মালিক হন, তা হলে সেই ব্যবসায়ের সমস্ত লাভের ভোক্তা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। কোন ব্যবসায়ীর যদি লক্ষ লক্ষ টাকা থাকে এবং তিনি যদি তা শ্রীকৃষ্ণকে দান করতে চান, তা হলে তিনি তা করতে পারেন। এটিই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের জন্য কর্ম। নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য বড় বড় প্রাসাদ তৈরি না করে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্য সুন্দর একটি মন্দির তৈরি করতে পারেন। তিনি সেই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন এবং শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজার আয়োজন করতে পারেন এবং ভগবদ্ভক্তি সংক্রান্ত প্রামাণিক গ্রন্থাবলীতে সেই সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া আছে। এই সমস্তই হচ্ছে কৃষ্ণকর্ম। কর্মফলের প্রতি আসক্ত না হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে সেই ফল অর্পণ করা উচিত। খাদ্যদ্রব্য শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করে ভগবানের প্রসাদরূপে তা গ্রহণ করা উচিত। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের জন্য একটি বিরাট বাড়ি তৈরি করে দেন এবং সেখানে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপন করেন, তা হলে সেখানে বসবাস করতেও কোন বাধা নেই, তবে মনে রাখতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণই বাড়িটির মালিক। এই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের মন্দির নির্মাণ না করতে পারেন, তা হলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের মন্দির মার্জন করার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারেন। সেটিও কৃষ্ণকর্ম। আমরা একটি বাগান করতে পারি। যারই এক ফালি জমি আছে—ভারতবর্ষে সকলেরই, এমন কি নিতান্ত গরিব লোকেরও কিছু না কিছু জমি আছে, সেই জমিতে বাগান করে তার ফুল শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করতে পারি। আমরা তুলসী বৃক্ষ রোপণ করতে পারি, কারণ তুলসীর পাতা, তুলসীর মঞ্জরী ভগবানের সেবার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। *ভগবদ্গীতায়* শ্রীকৃষ্ণ তা

অনুমোদন করেছেন। *পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্*। তিনি বলেছেন যে, কেউ যদি পত্র, পুষ্প, ফল অথবা একটু জল ভক্তি সহকারে তাঁকে অর্পণ করেন, তা হলে তিনি প্রীত হন। এই 'পত্র' বলতে তুলসী পত্রকেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আমরা তুলসী বৃক্ষ রোপণ করতে পারি এবং তাতে জল দিতে পারি। এভাবেই অত্যন্ত দরিদ্র যে মানুষ, তিনিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হতে পারেন। এগুলি শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হবার কয়েকটি দৃষ্টান্ত।

মৎপরমঃ কথাটি তাঁকেই উল্লেখ করে, যিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম ধামে তাঁর সঙ্গ লাভ করাটাই জীবনের পরম ধর্ম বলে মনে করেন। এই ধরনের মানুষ চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, স্বর্গলোক অথবা এমন কি এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকেও উন্নীত হবার আকাঙ্ক্ষা করেন না। এই সবের প্রতি তাঁর কোনই আকর্ষণ নেই। তাঁর একমাত্র বাসনা হচ্ছে অপ্রাকৃত জগতের চিদাকাশে প্রবিষ্ট হওয়া। আর এমন কি সেই অপ্রাকৃত জগতের চিদাকাশে দেদীপ্যমান ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতেও তিনি চান না। কারণ তাঁর একমাত্র বাসনা হচ্ছে অপ্রাকৃত জগতের সর্বোচ্চ গ্রহলোক শ্রীকৃষ্ণলোক বা গোলোক বৃন্দাবনে প্রবেশ করা। সেই গ্রহলোক সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণভাবে অবগত, তাই তিনি আর অন্য কিছুর জন্য আগ্রহী নন। *মদ্ভক্তঃ* কথাটির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনি সর্বতোভাবে ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবায় নিয়োজিত থাকেন, বিশেষ করে নববিধা ভক্তি—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, পাদসেবন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনের মাধ্যমে। যে কেউই ভক্তিযোগের এই নয়টি পন্থা অথবা আটটি অথবা সাতটি অথবা যে কোন একটির সেবায় যুক্ত হতে পারেন, এবং তাঁর ফলে অবশ্যই তিনি সিদ্ধি লাভ করতে পারেন।

সঙ্গবর্জিতঃ কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষ্ণবিমুখ মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করা উচিত। ভগবৎ-বিদ্বেষী নাস্তিকেরাই কেবল কৃষ্ণবিমুখ নয়, যারা ফলাশ্রিত কর্ম ও জল্পনা-কল্পনাপ্রসূত জ্ঞানের প্রতি আসক্ত, তারাও কৃষ্ণবিমুখ। সুতরাং, *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* (পূর্ব ১/১১) শুদ্ধ ভক্তির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

এই শ্লোকে শ্রীল রূপ গোস্বামী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তি অনুশীলন করতে চান, তাঁকে সমস্ত জড়-জাগতিক কলুষ থেকে মুক্ত হতে হবে। তাঁকে অবশ্যই সকাম কর্ম ও মানসিক জল্পনা-কল্পনার প্রতি আসক্তচিত্ত ব্যক্তির সঙ্গ থেকে মুক্ত হতে হবে। যখন কেউ এই প্রকার অবাঞ্ছিত সঙ্গ ও

জড়-জাগতিক বাসনার কলুষ থেকে মুক্ত হন, তখন তিনি অনুকূলভাবে কৃষ্ণবিজ্ঞান অনুশীলন করেন। তাকেই বলা হয় শুদ্ধ ভক্তি। *আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্* (*হরিভক্তিবিলাস* ১১/৬৭৬)। শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে হবে, কৃষ্ণসেবার যা অনুকূল তা সংকল্প করতে হবে এবং কৃষ্ণসেবার যা প্রতিকূল তা বর্জন করতে হবে। কংস ছিল শ্রীকৃষ্ণের শত্রু। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময় থেকেই কংস কতভাবে শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করবার পরিকল্পনা করত। কিন্তু যেহেতু সে শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে পারত না, তাই সে সব সময় শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করত। এভাবেই খেতে, বসতে, শুতে সব সময় সে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে থাকত। কিন্তু তার সেই কৃষ্ণভাবনা অনুকূল ছিল না এবং তাই যদিও সে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করত, তা সত্ত্বেও তাকে অসুর বলে গণ্য করা হত এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ তাকে হত্যা করেছিলেন। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের হাতে মৃত্যু হলে সঙ্গে সঙ্গে তার মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তের সেটি কাম্য নয়। শুদ্ধ ভক্ত মুক্তি চান না, এমন কি তিনি সর্বোচ্চলোক গোলোক বৃন্দাবনেও যেতে চান না। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে যেখানেই তিনি থাকুন না কেন, তিনি যেন সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে যেতে পারেন।

কৃষ্ণভক্ত সকলেরই বন্ধু ভাবাপন্ন হন। তাই এখানে বলা হয়েছে যে, তাঁর কোন শত্রু নেই (*নির্বৈরঃ*)। এটি কেমনভাবে হয়? কৃষ্ণভাবনাময় ভক্ত জানেন যে, কৃষ্ণভক্তিই কেবল মানব-জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। তিনি নিজেই ব্যক্তিগতভাবে সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। তাই তিনি মানব-সমাজে কৃষ্ণভাবনার এই পন্থা প্রচলন করতে চান। নিজের জীবন বিপন্ন করে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করার বহু দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত যিশুখ্রিস্ট। ভগবৎ-বিদ্বেষীরা তাঁকে ক্রুশে বিদ্ধ করেছিল। কিন্তু তিনি তাঁর জীবন দিয়ে ভগবানের বাণী প্রচার করেছিলেন। আমাদের অবশ্য কখনই মনে করা উচিত নয় যে, যিশুখ্রিস্টকে হত্যা করা হয়েছিল। ভগবানের ভক্তের কখনই বিনাশ হয় না। ভারতবর্ষেও তেমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেমন ঠাকুর হরিদাস ও প্রহ্লাদ মহারাজ। এঁরা কেন এভাবে নিজেদের জীবন বিপন্ন করেছিলেন? কারণ, তাঁরা কৃষ্ণভাবনার অমৃত বিতরণ করতে চেয়েছিলেন এবং তা ছিল কষ্টসাধ্য। কৃষ্ণভক্ত জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যাওয়ার ফলেই মানুষ এই জগতে নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। সুতরাং, মানব-সমাজে তাঁর শ্রেষ্ঠ উপকার হচ্ছে প্রতিবেশী মানুষকে সব রকম জড়-জাগতিক সমস্যাগুলির হাত থেকে মুক্তি দেওয়া। এভাবেই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের সেবা করে চলেন। এখন আমরা অনুমান করতে পারি যে, ভগবানের যে সমস্ত ভক্ত সব রকমের ঝুঁকি

নিয়ে ভগবানের সেবা করে চলেন; তাঁদের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কতই না কৃপাময়। তাই এটি নিশ্চিত যে, এই প্রকার ব্যক্তিরা দেহ ত্যাগ করার পরে ভগবানের পরম ধামে ফিরে যান।

এই অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ, যা হচ্ছে একটি অস্থায়ী প্রকাশ এবং কালরূপে যা সব কিছুই গ্রাস করে এবং এমন কি চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপ সবই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রদর্শিত হয়েছে। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এই সমস্ত প্রকাশের আদি উৎস হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। এমন নয় যে, আদি বিশ্বরূপ অথবা শ্রীবিষ্ণুর থেকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ হয়। শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত রূপের আদি উৎস। শত সহস্র বিষ্ণু আছেন, কিন্তু ভক্তের কাছে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর আদিরূপ ছাড়া আর কোন রূপেরই গুরুত্ব নেই। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, প্রেম ও ভক্তি সহকারে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের শ্যামসুন্দর রূপের প্রতি ঐকান্তিকভাবে আসক্ত, তাঁরা সর্বদাই তাঁকে হৃদয়ে অবলোকন করেন এবং এ ছাড়া তাঁরা আর কিছুই দেখতে পান না। তাই, আমাদের বুঝা উচিত, এই একাদশ অধ্যায়ের তাৎপর্য হচ্ছে যে, ভগবানের শ্রীকৃষ্ণরূপই হচ্ছে পরম ও গুরুত্বপূর্ণ রূপ।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—'বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তিযোগ

শ্লোক ১

অর্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে ।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ ॥

অর্জুনঃ উবাচ—অর্জুন বললেন; **এবম্**—এভাবেই; **সতত**—সর্বদা; **যুক্তাঃ**—নিযুক্ত; **যে**—যে সমস্ত; **ভক্তাঃ**—ভক্তেরা; **ত্বাম্**—তোমার; **পর্যুপাসতে**—যথাযথভাবে আরাধনা করেন; **যে**—যাঁরা; **চ**—ও; **অপি**—পুনরায়; **অক্ষরম্**—ইন্দ্রিয়াতীত; **অব্যক্তম্**—অব্যক্ত; **তেষাম্**—তাঁদের মধ্যে; **কে**—কারা; **যোগবিত্তমাঃ**—যোগীশ্রেষ্ঠ।

গীতার গান

অর্জুন কহিলেন ঃ

যে শুদ্ধ ভক্ত সে কৃষ্ণ তোমাতে সতত ।
অনন্য ভক্তির দ্বারা হয়ে থাকে যুক্ত ॥
আর যে অব্যক্তবাদী অব্যক্ত অক্ষরে ।
নিষ্কাম করম করি সদা চিন্তা করে ॥
তার মধ্যে কেবা উত্তম যোগবিৎ হয় ।
জানিবার ইচ্ছা মোর করহ নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন—এভাবেই নিরন্তর ভক্তিযুক্ত হয়ে যে সমস্ত ভক্তেরা যথাযথভাবে তোমার আরাধনা করেন এবং যাঁরা ইন্দ্রিয়াতীত অব্যক্ত ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁদের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ যোগী।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ সবিশেষ-তত্ত্ব, নির্বিশেষ-তত্ত্ব ও বিশ্বরূপ-তত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সব রকমের ভক্ত ও যোগীদের কথা বর্ণনা করেছেন। সাধারণত, পরমার্থবাদীদের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তাঁরা হচ্ছেন নির্বিশেষবাদী ও সবিশেষবাদী। সবিশেষবাদী ভক্তেরা তাঁদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন। নির্বিশেষবাদীরা সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হন না। তাঁরা নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা অব্যক্ত তার ধ্যানে মগ্ন হওয়ার চেষ্টা করেন।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে, পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করার যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া আছে, তার মধ্যে ভক্তিযোগই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। যদি কেউ পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য লাভের প্রয়াসী হন, তা হলে তাঁকে ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করতেই হবে।

ভক্তিযোগে প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা ভগবানের সেবা করেন, তাঁদের বলা হয় সবিশেষবাদী। নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যানে যাঁরা নিযুক্ত তাঁদের বলা হয় নির্বিশেষবাদী। অর্জুন এখানে জিজ্ঞেস করছেন, এদের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়? পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করবার ভিন্ন ভিন্ন পন্থা আছে। কিন্তু এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, ভক্তিযোগ অথবা ভক্তির মাধ্যমে তাঁর সেবা করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এটি হচ্ছে সবচেয়ে সহজ ও প্রত্যক্ষ পন্থা।

ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান আমাদের বুঝিয়েছেন যে, জড় দেহটি জীবের স্বরূপ নয়। জীবের স্বরূপ হচ্ছে চিৎস্ফুলিঙ্গ। আর পরমতত্ত্ব হচ্ছেন বিভুচৈতন্য। সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ জীবকে ভগবানের বিভিন্ন অংশ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, সেই বিভুচৈতন্য ভগবানের প্রতি তার চেতনাকে নিবদ্ধ করাই হচ্ছে জীবের ধর্ম। তারপর অষ্টম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, মৃত্যুর সময় যিনি শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ অপ্রাকৃত জগতে শ্রীকৃষ্ণের ধামে উত্তীর্ণ হন। আর ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সমস্ত যোগীদের মধ্যে যিনি তাঁর অন্তরে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। সুতরাং, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক অধ্যায়ের উপসংহারে

বলা হয়েছে যে, সবিশেষ কৃষ্ণরূপের প্রতি সকলের আসক্ত হওয়া উচিত, কেন না সেটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ পারমার্থিক উপলব্ধি।

তবুও কিছু লোক আছে, যারা শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত নয়। তারা এই বিষয়ে এমনই প্রচণ্ডভাবে আগ্রহহীন যে, *ভগবদ্গীতার* ভাষ্য রচনা কালেও তারা পাঠকমহলকে কৃষ্ণবিমুখ করতে চায় এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির দিকে তাদের সমস্ত ভক্তি পরিচালিত করে থাকে। যে পরমতত্ত্ব অব্যক্ত ও ইন্দ্রিয়াতীত, সেই নির্বিশেষ রূপের ধ্যানে মনোনিবেশ করতেই তারা পছন্দ করে।

বাস্তবিকপক্ষে, পরমার্থবাদীরা দুই রকমের হয়ে থাকেন। এখন অর্জুন জানতে চাইছেন, এই দুই রকমের পরমার্থবাদীদের মধ্যে কোন্ পন্থাটি সহজতর এবং কোন্‌টি শ্রেয়তম। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি তাঁর নিজের অবস্থাটি যাচাই করে নিচ্ছেন, কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ রূপের প্রতি আসক্তযুক্ত। নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতি তিনি আকৃষ্ট নন। তিনি জানতে চাইছেন যে, তাঁর অবস্থা নিরাপদ কি না। এই জড় জগতেই হোক বা চিৎ-জগতেই হোক, ভগবানের নির্বিশেষ প্রকাশ ধ্যানের পক্ষে একটি সমস্যাস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে, কেউই পরম-তত্ত্বের নির্বিশেষ রূপ সম্বন্ধে যথাযথভাবে চিন্তা করতে পারে না। তাই অর্জুন বলতে চাইছেন, "এভাবে সময় নষ্ট করে কি লাভ?" একাদশ অধ্যায়ে অর্জুন উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সবিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত থাকাই হচ্ছে উত্তম, কারণ তা হলে অনায়াসে তাঁর অন্য সমস্ত রূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় এবং তাতে কৃষ্ণপ্রেমে কোন বিঘ্ন ঘটে না। শ্রীকৃষ্ণের কাছে অর্জুনের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে ভগবান স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলেন, পরম-তত্ত্বের নির্বিশেষ ও সবিশেষ ধারণার মধ্যে পার্থক্য কোথায়।

শ্লোক ২

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ময়ি**—আমাতে; **আবেশ্য**—নিবিষ্ট করে; **মনঃ**—মন; **যে**—যাঁরা; **মাম্**—আমাকে; **নিত্য**—সর্বদা; **যুক্তাঃ**—নিযুক্ত হয়ে; **উপাসতে**—উপাসনা করেন; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **পরয়া**—অপ্রাকৃত; **উপেতাঃ**—যুক্ত হয়ে; **তে**—তাঁরা; **মে**—আমার; **যুক্ততমাঃ**—সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী; **মতাঃ**—মতে।

গীতার গান

শ্রীভগবান কহিলেন ঃ

আমার স্বরূপ এই যার মন সদা ।
আবিষ্ট হইয়া থাকে উপাসনা হৃদা ॥
শ্রদ্ধার সহিত করে প্রাণ ভক্তিময় ।
উত্তম যোগীর শ্রেষ্ঠ কহিনু নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

শ্রীভগবান বললেন—যাঁরা তাঁদের মনকে আমার সবিশেষ রূপে নিবিষ্ট করেন এবং অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা সহকারে নিরন্তর আমার উপাসনা করেন, আমার মতে তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

তাৎপর্য

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলছেন যে, যাঁর মন তাঁর সবিশেষ রূপে আবিষ্ট এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে যিনি তাঁর উপাসনা করেন, তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। এভাবেই যিনি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়েছেন, তিনি আর কখনও জাগতিক কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না, কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সাধনের জন্যই সব কিছু তখন করা হয়। শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই ভগবানের সেবায় যুক্ত। কখনও তিনি ভগবানের নাম কীর্তন করেন, কখনও তিনি ভগবানের কথা শ্রবণ করেন অথবা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করেন, কখনও বা তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ রন্ধন করেন, কখনও বা তিনি বাজারে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্য কোন কিছু খরিদ করেন, কখনও তিনি মন্দির অথবা বাসন পরিষ্কার করেন—অর্থাৎ, কৃষ্ণসেবায় কর্ম না করে তিনি এক মুহূর্তও নষ্ট করেন না। এই ধরনের কর্মই হচ্ছে পূর্ণ সমাধি।

শ্লোক ৩-৪

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে ।
সর্বত্রগমচিন্ত্যং চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥

যে—যাঁরা; তু—কিন্তু; **অক্ষরম্**—ইন্দ্রিয় অনুভূতির অতীত যা; **অনির্দেশ্যম্**—অনির্বচনীয়; **অব্যক্তম্**—অব্যক্ত; পর্যুপাসতে—উপাসনা করেন; **সর্বত্রগম্**—সর্বব্যাপী;

অচিন্ত্যম্—অচিন্ত্য; চ—ও; **কূটস্থম্**—অপরিবর্তনীয়; **অচলম্**—অচল; **ধ্রুবম্**—শাশ্বত; সংনিয়ম্য—সংযত করে; **ইন্দ্রিয়গ্রামম্**—সমস্ত ইন্দ্রিয়; **সর্বত্র**—সর্বত্র; সমবুদ্ধয়ঃ—সমভাবাপন্ন; তে—তাঁরা; **প্রাপ্নুবন্তি**—প্রাপ্ত হন; **মাম্**—আমাকে; এব—অবশ্যই; **সর্বভূতহিতে**—সমস্ত জীবের কল্যাণে; **রতাঃ**—রত হয়ে।

গীতার গান

অক্ষর অব্যক্তসক্ত নির্দিষ্টভাব ।
ইন্দ্রিয় সংযম করি হিতৈষী স্বভাব ॥
সর্বব্যাপী অচিন্ত্য যে কূটস্থ অচল ।
ধ্রুব নির্বিশেষ সত্ত্বে থাকিয়া অটল ॥
সমবুদ্ধি হয়ে সব করে উপাসনা ।
সে আমাকে প্রাপ্ত হয় করিয়া সাধনা ॥

অনুবাদ

যাঁরা সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে, সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন হয়ে এবং সর্বভূতের কল্যাণে রত হয়ে আমার অক্ষর, অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব ও নির্বিশেষ স্বরূপকে উপাসনা করেন, তাঁরা অবশেষে আমাকেই প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন না, কিন্তু পরোক্ষ পন্থায় সেই একই উদ্দেশ্য সাধন করার চেষ্টা করেন, তাঁরাও পরিণামে সেই পরম লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন। সেই বিষয়ে বলা হয়েছে, "বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর জ্ঞানী যখন জানতে পারে যে, বাসুদেবই হচ্ছেন সব কিছুর পরম কারণ, তখন সে আমার চরণে প্রপত্তি করে।" বহু জন্মের পরে কোন মানুষ যখন পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মনিবেদন করেন। এই শ্লোকগুলিতে যে পন্থার বর্ণনা করা হয়েছে, সেই অনুসারে কেউ যদি ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে চান, তা হলে তাঁকে ইন্দ্রিয় দমন করতে হবে, সকলের প্রতি সেবাপরায়ণ হতে হবে এবং সমস্ত প্রাণীর কল্যাণ সাধনে ব্রতী হতে হবে। এই শ্লোকের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হতে হবে, তা না হলে কখনই পূর্ণ উপলব্ধি হবে না। প্রায়ই দেখা যায় যে, অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করার পরই কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শরণাগতি আসে।

স্বতন্ত্র আত্মার অন্তস্তলে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে হলে দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন আদি সব রকমের ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকলাপ থেকে নিবৃত্ত হতে হয়। তখন উপলব্ধি করা যায় যে, পরমাত্মা সর্বত্রই বিরাজমান। এই উপলব্ধির ফলে আর কারও প্রতি হিংসাভাব থাকে না। তখন আর মানুষে ও পশুতে ভেদবুদ্ধি থাকে না। কারণ, তখন কেবল আত্মারই দর্শন হয়, বাইরের আবরণটিকে তখন আর দেখা যায় না। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এই নির্বিশেষ উপলব্ধি অত্যন্ত দুষ্কর।

শ্লোক ৫

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥

ক্লেশঃ—ক্লেশ; **অধিকতরঃ**—অধিকতর; **তেষাম্**—তাদের; **অব্যক্ত**—অব্যক্ত; **আসক্ত**—আসক্ত; **চেতসাম্**—যাদের মন; **অব্যক্তা**—অব্যক্ত; **হি**—অবশ্যই; **গতিঃ**—গতি; **দুঃখম্**—দুঃখময়; **দেহবদ্ভিঃ**—দেহাভিমানী জীব দ্বারা; **অবাপ্যতে**—লাভ হয়।

গীতার গান

কিন্তু এইমাত্র ভেদ জান উভয়ের মধ্যে ।
ভক্ত পায় অতি শীঘ্র আর কষ্টে সিদ্ধে ॥
অব্যক্ত আসক্ত সেই বহু ক্লেশ তার ।
অব্যক্ত যে গতি দুঃখ দেহীর অপার ॥

অনুবাদ

যাদের মন ভগবানের অব্যক্ত নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, তাদের ক্লেশ অধিকতর। কারণ, অব্যক্তের উপাসনার ফলে দেহধারী জীবদের কেবল দুঃখই লাভ হয়।

তাৎপর্য

যে সমস্ত অধ্যাত্মবাদীরা ভগবানের অচিন্ত্য, অব্যক্ত ও নির্বিশেষ তত্ত্ব জানবার প্রয়াসী, তাদের বলা হয় জ্ঞানযোগী এবং যাঁরা সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ভক্তিযুক্ত চিত্তে ভগবানের সেবা করেন, তাঁদের বলা হয় ভক্তিযোগী। এখন, এখানে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মধ্যে যে পার্থক্য তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা

হয়েছে। জ্ঞানযোগের পন্থা যদিও পরিণামে একই লক্ষ্যে গিয়ে উপনীত হয়, তবুও তা অত্যন্ত ক্লেশসাপেক্ষ। কিন্তু ভক্তিযোগের পন্থা, সরাসরিভাবে ভগবানের সেবা করার যে পন্থা, তা অত্যন্ত সহজ এবং তা হচ্ছে দেহধারী জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। অনাদিকাল ধরে আত্মা দেহের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। সে যে তার দেহ নয়, সেই ধারণা করাও তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তাই, ভক্তিযোগী শ্রীকৃষ্ণের অর্চা-বিগ্রহের অর্চনা করার পন্থা অবলম্বন করেন, কারণ তাতে একটি সবিশেষ রূপের ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়। আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, মন্দিরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্চা-বিগ্রহের যে পূজা, তা মূর্তিপূজা নয়। বৈদিক শাস্ত্রে সগুণ ও নির্গুণ উপাসনার উল্লেখ পাওয়া যায়। মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের যে উপাসনা তা সগুণ উপাসনা, কেন না জড় গুণাবলীর দ্বারা ভগবান প্রকাশিত হয়েছেন। কিন্তু ভগবানের রূপ যদিও পাথর, কাঠ অথবা তৈলচিত্র আদি জড় গুণের দ্বারা প্রকাশিত হয়, প্রকৃতপক্ষে তা জড় নয়। সেটিই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত তত্ত্ব।

সেই সম্বন্ধে একটি স্থূল উদাহরণ এখানে দেওয়া যায়। যেমন, রাস্তার পাশে আমরা ডাকবাক্স দেখতে পাই এবং সেই বাক্সে আমরা যদি চিঠিপত্র ফেলি, তা হলে সেগুলি স্বাভাবিকভাবে তাদের গন্তব্যস্থলে অনায়াসে পৌঁছে যাবে। কিন্তু যে কোন একটি পুরানো বাক্সে অথবা ডাকবাক্সের অনুকরণে তৈরি কোন বাক্স, যা পোস্ট অফিসের অনুমোদিত নয়, তাতে চিঠি ফেললে কোন কাজ হবে না। তেমনই, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ভগবানের শ্রীমূর্তি হচ্ছেন ভগবানের অনুমোদিত প্রতিনিধি, যাঁকে বলা হয় অর্চাবিগ্রহ। এই অর্চাবিগ্রহ হচ্ছেন ভগবানের অবতার। ভগবান সেই রূপের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করেন। ভগবান সর্বশক্তিমান, তাই তিনি তাঁর অর্চা-বিগ্রহরূপ অবতারের মাধ্যমে তাঁর ভক্তের সেবা গ্রহণ করতে পারেন। জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষদের সুবিধার জন্য তিনি এই বন্দোবস্ত করে রেখেছেন।

সুতরাং, ভক্তের পক্ষে সরাসরিভাবে অনতিবিলম্বে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু যাঁরা অধ্যাত্ম উপলব্ধির নির্বিশেষবাদের পন্থা অবলম্বন করেন, তাঁদের সেই পথ অত্যন্ত কষ্টসাপেক্ষ। তাঁদের *উপনিষদ* আদি বৈদিক গ্রন্থের মাধ্যমে পরমেশ্বরের অব্যক্ত রূপ উপলব্ধি করতে হয়, তাঁদের সেই ভাষা শিক্ষা করতে হয়, অতীন্দ্রিয় অনুভূতিগুলি উপলব্ধি করতে হয় এবং এই সবগুলিই সম্যক্‌ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে এই পন্থা অবলম্বন করা খুব সহজ নয়। কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত যে মানুষ সদ্‌গুরুর দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করছেন, তিনি কেবলমাত্র

ভক্তিভরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম করে, ভগবানের লীলা শ্রবণ করে এবং ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ করে অনায়াসে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন। নির্বিশেষবাদীরা যে অনর্থক ক্লেশদায়ক পন্থা অবলম্বন করেন, তাতে পরিণামে যে তাঁদের পরম-তত্ত্বের চরম উপলব্ধি না-ও হতে পারে, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সবিশেষবাদীরা কোন রকম বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে, কোন রকম ক্লেশ অথবা দুঃখ স্বীকার না করে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণারবিন্দের সান্নিধ্য লাভ করেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* এই ধরনের একটি শ্লোক আছে, তাতে বলা হয়েছে যে, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করাই যদি পরম উদ্দেশ্য হয় (এই আত্মনিবেদনের পন্থাকে বলা হয় ভক্তি), তা হলে তা না করে কোন্‌টি ব্রহ্ম আর কোন্‌টি ব্রহ্ম নয়, এই তত্ত্ব জানবার জন্য সারাটি জীবন নষ্ট করলে তার ফল অবশ্যই ক্লেশদায়ক হয়। তাই, অধ্যাত্ম উপলব্ধির এই ক্লেশদায়ক পন্থা গ্রহণ না করতে এখানে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ তার পরিণতি অনিশ্চিত।

জীব হচ্ছে নিত্য, স্বতন্ত্র আত্মা এবং সে যদি ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চায়, তা হলে সে তার স্বরূপের সৎ ও চিৎ প্রবৃত্তির উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু আনন্দময় প্রবৃত্তির উপলব্ধি হয় না। জ্ঞানযোগের পথে বিশেষভাবে অগ্রণী এই প্রকার অধ্যাত্মবিৎ কোন ভক্তের কৃপায় ভক্তিযোগের পথে আসতে পারেন। সেই সময়, নির্বিশেষবাদের দীর্ঘ সাধনা তাঁর ভক্তিযোগের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, কারণ তিনি তখন তাঁর পূর্বার্জিত ধারণাগুলি ত্যাগ করতে পারেন না। তাই, দেহধারী জীবের পক্ষে নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা সর্ব অবস্থাতেই ক্লেশদায়ক, তার অনুশীলন ক্লেশদায়ক এবং তার উপলব্ধিও ক্লেশদায়ক। প্রতিটি জীবেরই আংশিক স্বাতন্ত্র্য আছে এবং আমাদের নিশ্চিতভাবে জানা উচিত যে, এই নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপলব্ধি আমাদের চিন্ময় সত্তার আনন্দময় প্রবৃত্তির বিরোধী। এই পন্থা গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ প্রতিটি স্বতন্ত্র জীবের পক্ষে কৃষ্ণভাবনাময় পন্থা, যার ফলে সে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হতে পারে, সেটিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই ভগবদ্ভক্তিকে যদি কেউ অবহেলা করে, তা হলে তার ভগবৎ-বিমুখ নাস্তিকে পরিণত হবার সম্ভাবনা থাকে। অতএব অব্যক্ত, অচিন্ত্য, ইন্দ্রিয়ানুভূতির ঊর্ধ্বে যে তত্ত্বের কথা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপলব্ধির প্রতি, বিশেষ করে এই কলিযুগে আকৃষ্ট হওয়া উচিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তা করতে নিষেধ করছেন।

শ্লোক ৬-৭

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

যে—যাঁরা; **তু**—কিন্তু; **সর্বাণি**—সমস্ত; **কর্মাণি**—কর্ম; **ময়ি**—আমাতে; **সংন্যস্য**—ত্যাগ করে; **মৎপরাঃ**—মৎপরায়ণ হয়ে; **অনন্যেন**—অবিচলিতভাবে; **এব**—অবশ্যই; **যোগেন**—ভক্তিযোগ দ্বারা; **মাম্**—আমাকে; **ধ্যায়ন্তঃ**—ধ্যান করে; **উপাসতে**—উপাসনা করেন; **তেষাম্**—তাঁদের; **অহম্**—আমি; **সমুদ্ধর্তা**—উদ্ধারকারী; **মৃত্যু**—মৃত্যুর; **সংসার**—সংসার; **সাগরাৎ**—সাগর থেকে; **ভবামি**—হই; **ন চিরাৎ**—অচিরেই; **পার্থ**—হে পৃথাপুত্র; **ময়ি**—আমাতে; **আবেশিত**—আবিষ্ট; **চেতসাম্**—চিত্ত।

গীতার গান

যে আমার সম্বন্ধেতে সব কর্ম করে ।
আমার স্বরূপ এই নিত্য ধ্যান করে ॥
জীবন যে মোরে সঁপি আমাতে আসক্ত ।
অনন্য যে ভাব ভক্তি তাহে অনুরক্ত ॥
সে ভক্তকে মৃত্যুরূপ এ সংসার হতে ।
উদ্ধার করিব শীঘ্র জান ভাল মতে ॥

অনুবাদ

যারা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে, মৎপরায়ণ হয়ে অনন্য ভক্তিযোগের দ্বারা আমার ধ্যান করে উপাসনা করেন, হে পার্থ! আমাতে আবিষ্টচিত্ত সেই সমস্ত ভক্তদের আমি মৃত্যুময় সংসার-সাগর থেকে অচিরেই উদ্ধার করি।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবদ্ভক্তেরা অত্যন্ত ভাগ্যবান, কেন না ভগবানের কৃপায় তাঁরা অনায়াসে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন। শুদ্ধ ভক্তির প্রভাবে ভক্ত উপলব্ধি করতে পারেন যে, ভগবান হচ্ছেন মহান এবং প্রতিটি স্বতন্ত্র জীবাত্মাই হচ্ছে তাঁর অধীন। প্রতিটি জীবের কর্তব্য ভগবানের সেবা করা, কিন্তু সে যদি তা না করে, তা হলে তাকে মায়ার দাসত্ব করতে হয়।

পূর্বে বলা হয়েছে, কেবলমাত্র ভক্তিযুক্ত সেবার মাধ্যমেই পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তাই, আমাদের পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করতে হলে আমাদের মনকে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণে নিবদ্ধ করতে হবে। কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্য আমাদের সমস্ত কর্ম করতে হবে। যে কাজকর্মই আমরা করি না কেন তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু সেই কাজ কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্যই করা উচিত। সেটিই হচ্ছে ভক্তিযোগের মানদণ্ড। পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করা ছাড়া ভক্ত আর কিছুই কামনা করেন না। তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করা এবং সেই জন্য তিনি সব কিছু ত্যাগ করতে পারেন—যেমনটি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন করেছিলেন। এই পন্থাটি অত্যন্ত সরল। আমরা আমাদের বৃত্তিগত কাজকর্ম করে যেতে পারি এবং সেই সঙ্গে **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—এই মহামন্ত্র কীর্তন করতে পারি। এই অপ্রাকৃত কীর্তন ভক্তকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট করে।

ভগবান এখানে প্রতিজ্ঞা করছেন যে, যে শুদ্ধ ভক্ত এভাবেই তাঁর সেবায় নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁকে তিনি অচিরেই ভবসমুদ্র থেকে উদ্ধার করবেন। যাঁরা যোগসিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁরা ইচ্ছা অনুসারে তাঁদের ঈপ্সিত লোকে স্থানান্তরিত করতে পারেন এবং অন্যেরা নানাভাবে এই সমস্ত পন্থার সুযোগ নিয়ে থাকেন। কিন্তু ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে বলছেন যে, তাঁর ভক্তকে তিনি নিজেই তাঁর কাছে নিয়ে যান। অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশ করবার জন্য ভক্তকে নানা রকম সিদ্ধি লাভের অপেক্ষা করতে হয় না।

বরাহ পুরাণে বলা হয়েছে—

নয়ামি পরমং স্থানমর্চিরাদিগতিং বিনা ।
গরুড়স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছমনিবারিতঃ ॥

অর্থাৎ, অপ্রাকৃত লোকে প্রবেশ করবার জন্য ভক্তকে অষ্টাঙ্গ-যোগের অনুশীলন করতে হয় না। পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে নিজেই অপ্রাকৃত জগতে নিয়ে যান। এখানে তিনি সুস্পষ্টভাবে নিজেকে ত্রাণকর্তা রূপে বর্ণনা করেছেন। শিশুকে যেমন তার বাবা-মা সর্বতোভাবে লালন পালন করেন এবং তার ফলে সে নিরাপদে থাকে, ঠিক তেমনই ভক্তকে যোগানুশীলনের মাধ্যমে অন্যান্য গ্রহলোকে যাবার জন্য কোনও রকম চেষ্টা করার প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর মহান কৃপাবলে তাঁর বাহন গরুড়ের পিঠে চড়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর ভক্তের কাছে উপস্থিত হন এবং তাঁকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। মাঝ সমুদ্রে

পতিত হয়েছে যে মানুষ, সে যতই দক্ষ সাঁতারু হোক না কেন, শত চেষ্টা করেও সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু কেউ যদি এসে তাকে সেই সমুদ্র থেকে তুলে নেয়, তা হলে সে অনায়াসেই রক্ষা পেতে পারে। তেমনই, ভগবানও তাঁর ভক্তকে জড় জগতের বন্ধন থেকে উদ্ধার করেন। আমাদের কেবল ভক্তিযুক্ত ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হয়ে কৃষ্ণভাবনার অতি সরল পন্থা অনুশীলন করতে হবে। যে কোন বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য অন্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তির এই পন্থাটির প্রতি সর্বদাই অধিক গুরুত্ব প্রদান করা। *নারায়ণীয়তে* এর যথার্থতা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

যা বৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে ।
তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ ॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য হচ্ছে যে, সকাম কর্মের বিভিন্ন পন্থায় ব্রতী না হয়ে অথবা মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞানের অনুশীলন না করে, ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করলেই সব রকমের ধর্মাচরণ—দান, ধ্যান, যজ্ঞ, তপশ্চর্যা, যোগ আদির সমস্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেটিই হচ্ছে ভক্তিযোগের বিশেষত্ব।

কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম সমন্বিত মহামন্ত্র—**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**—কীর্তন করার ফলে ভগবদ্ভক্ত অনায়াসে পরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেন, যা অন্য কোন ধর্ম আচরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নয়।

ভগবদ্গীতার উপসংহারে অষ্টাদশ অধ্যায়ে পরম উপদেশ দান করে ভগবান বলেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

আত্মজ্ঞান লাভের জন্য সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি বর্জন করে কেবলমাত্র কৃষ্ণভাবনাময় ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করতে হবে। তা হলেই জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধিত হবে। তখন অতীত জীবনের পাপময় কর্মের জন্য চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ ভগবান আমাদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবেন। সুতরাং, আর অন্য কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মজ্ঞান লাভ করে মুক্তি লাভের ব্যর্থ প্রয়াস করার কোন প্রয়োজন নেই। পরম সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে আশ্রয় গ্রহণ করা সকলেরই কর্তব্য। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম পূর্ণতা।

শ্লোক ৮

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

ময়ি—আমাতে; **এব**—অবশ্যই; **মনঃ**—মন; **আধৎস্ব**—স্থির কর; **ময়ি**—আমাতে; **বুদ্ধিম্**—বুদ্ধি; **নিবেশয়**—অর্পণ কর; **নিবসিষ্যসি**—বাস করবে; **ময়ি**—আমার নিকটে; **এব**—অবশ্যই; **অতঃ ঊর্ধ্বম্**—তার ফলে; **ন**—নেই; **সংশয়ঃ**—সন্দেহ।

গীতার গান

অতএব তুমি এই দ্বিভুজ স্বরূপে ।
এ মন বুদ্ধি স্থির কর ভগবৎ স্বরূপে ॥
আমার এ নিত্যরূপে নিত্যযুক্ত হলে ।
অবশ্য পাইবে প্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ ফলে ॥
ঊর্ধ্বগতি সেই জান না কর সংশয় ।
সর্বোচ্চ ফল তাহা কহিনু নিশ্চয় ॥

অনুবাদ

অতএব আমাতেই তুমি মন সমাহিত কর এবং আমাতেই বুদ্ধি অর্পণ কর। তার ফলে তুমি সর্বদাই আমার নিকটে বাস করবে, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিযুক্ত সেবায় রত, তিনি ভগবানের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত হয়ে জীবন ধারণ করেন। তিনি যে প্রথম থেকেই অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। ভক্ত জড়-জাগতিক স্তরে জীবন যাপন করেন না—তাঁর জীবন কৃষ্ণভাবনাময়। ভগবানের নাম স্বয়ং ভগবান থেকে অভিন্ন। তাই, ভক্ত যখন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি ভক্তের জিহ্বায় নর্তন করেন। ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই ভোগ সরাসরিভাবে গ্রহণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সেই উচ্ছিষ্ট প্রসাদ খেয়ে ভক্ত কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠেন। ভগবানের সেবায় ব্রতী না হলে সেটি যে কি করে সম্ভব হয়, তা বুঝতে পারা যায় না, যদিও *ভগবদ্গীতা* ও অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে এই পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৯

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্ ।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

অথ—আর যদি; **চিত্তম্**—মন; **সমাধাতুম্**—স্থাপন করতে; **ন**—না; **শক্নোষি**—সক্ষম হও; **ময়ি**—আমাতে; **স্থিরম্**—স্থিরভাবে; **অভ্যাস**—অভ্যাস; **যোগেন**—যোগের দ্বারা; **ততঃ**—তা হলে; **মাম্**—আমাকে; **ইচ্ছা**—ইচ্ছা কর; **আপ্তুম্**—প্রাপ্ত হতে; **ধনঞ্জয়**—হে অর্জুন।

গীতার গান

যদি সে সহজভাবে হও অসমর্থ ।
অভ্যাস যোগেতে কর লাভ পরমার্থ ॥
বিধিমার্গে রাগমার্গে যেবা মোরে চায় ।
অচিরাৎ সে অভ্যাসে লোক মোরে পায় ॥

অনুবাদ

হে ধনঞ্জয়! যদি তুমি স্থিরভাবে আমাতে চিত্ত সমাহিত করতে সক্ষম না হও, তা হলে অভ্যাস যোগের দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হতে ইচ্ছা কর।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ভক্তিযোগের দুটি ক্রমোন্নতির কথা বলা হয়েছে। তার প্রথমটি তাঁদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাঁরা অপ্রাকৃত প্রেমে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন। আর অপরটি হচ্ছে যাঁরা অপ্রাকৃত প্রেমে ভগবানের প্রতি আসক্ত হতে পারেননি। এই দ্বিতীয় স্তরের ভক্তদের জন্য নানা রকম বিধি-নিষেধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা অনুশীলন করার ফলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়।

ভক্তিযোগ হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে নির্মল করার পন্থা। ভবসংসারে বর্তমান সময়ে ইন্দ্রিয়তর্পণে নিরত থাকার ফলে মায়াবদ্ধ জীবের ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদা কলুষিত হয়ে থাকে। কিন্তু ভক্তিযোগ অনুশীলন করার ফলে এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি নির্মল হতে থাকে এবং অবশেষে তা যখন পূর্ণরূপে নির্মল হয়, তখন তারা সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সংস্পর্শে আসে। মায়াবদ্ধ বিষয়াসক্ত জীবনে আমি কোন

না কোন মালিকের চাকরি করতে পারি, কিন্তু সেই দাসত্ব ভালবাসার নয়। আমি কেবল মাত্র কিছু টাকা পাওয়ার জন্য সেই চাকরি করি এবং সেই মালিকও আমাকে ভালবাসে না; আমার কাছ থেকে কাজ আদায় করে আমাকে মাহিনা দেয়। সুতরাং, সেখানে ভালবাসার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু পারমার্থিক জীবনের চরম পরিণতি হচ্ছে সেই নির্মল দিব্য প্রেমের স্তরে উন্নীত হওয়া। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে ভগবানের সেবা করার মাধ্যমেই সেই প্রেমভক্তির স্তর লাভ করা যায়।

সকলের হৃদয়ে এই ভগবৎ-প্রেম সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে এবং সেখানে ভগবৎ-প্রেম বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়, কিন্তু জড়-জাগতিক সঙ্গের প্রভাবে তা কলুষিত। এখন জড় বিষয়ের প্রভাব থেকে আমাদের হৃদয়কে নির্মল করতে হবে এবং তা হলে যে কৃষ্ণপ্রেম আমাদের হৃদয়ে সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, তা পুনরুজ্জীবিত হবে। সেটিই হচ্ছে ভক্তিযোগের পূর্ণ পন্থা।

ভক্তিযোগ অনুশীলন করতে হলে সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে কতকগুলি বিধিবিধান পালন করা কর্তব্য—খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠা, স্নান করে মন্দিরে গিয়ে আরতি করা, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা, তারপর ফুল তুলে ভগবানের শ্রীচরণে তা নিবেদন করা, ভোগ রান্না করে তা ভগবানকে নিবেদন করা, প্রসাদ গ্রহণ করা ইত্যাদি। নানা রকমের বিধিনিয়ম আছে যেগুলি অনুশীলন করতে হয়। আর নিরন্তর শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে *শ্রীমদ্ভাগবত* ও *ভগবদ্‌গীতা* শ্রবণ করতে হয়। এই পন্থা অনুশীলন করার ফলে যে কেউ প্রেমভক্তির স্তরে উন্নীত হতে পারে এবং তার ফলে অবশ্যই চিন্ময় ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করতে পারা যায়। সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে বিধিবদ্ধভাবে ভক্তিযোগ অনুশীলন করলে অবশ্যই ভগবৎ-প্রেম লাভ করা যায়।

শ্লোক ১০

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব ।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥

অভ্যাসে—অভ্যাস করতে; **অপি**—এমন কি যদি; **অসমর্থঃ**—অসমর্থ; **অসি**—হও; **মৎকর্ম**—আমার কর্ম; **পরমঃ**—পরায়ণ; **ভব**—হও; **মদর্থম্**—আমার জন্য; **অপি**—ও; **কর্মাণি**—কর্ম; **কুর্বন্**—করে; **সিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; **অবাপ্স্যসি**—লাভ করবে।

গীতার গান

অভ্যাসেও অসমর্থ যদি তুমি হও ।
আমার লাগিয়া কর্মে সদাযুক্ত রও ॥
আমার সন্তোষ জন্য যেবা কার্য হয় ।
জানিও সেসব মোরে প্রাপ্তির উপায় ॥

অনুবাদ

যদি তুমি এমন কি অভ্যাস করতেও অসমর্থ হও, তা হলে আমার প্রতি কর্ম পরায়ণ হও। আমার জন্য কর্ম করেও তুমি সিদ্ধি লাভ করবে।

তাৎপর্য

যিনি সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে বৈধীভক্তি অনুশীলন করতে সমর্থ নন, তিনি কেবল মাত্র ভগবানের জন্য কর্ম করার মাধ্যমে সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। এই কর্ম কিভাবে সাধন করা যায়, তা *ভগবদ্‌গীতার* একাদশ অধ্যায়ের ৫৫তম শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে সকলকেই সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত। বহু ভক্ত কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে নিযুক্ত আছেন এবং তাঁরা নানা রকম সাহায্যের আবশ্যকতা বোধ করে থাকেন। সুতরাং, কেউ যদি সরাসরিভাবে ভক্তিযোগের বিধি-নিয়মগুলি পালন না করতে পারেন, তিনি অন্তত ভগবানের বাণী প্রচারে সহায়তা করতে পারেন। প্রতিটি প্রচেষ্টাতেই জায়গা-জমি, অর্থ, সংগঠন ও শ্রমের প্রয়োজন হয়। ঠিক যেমন ব্যবসা করবার জন্য জায়গার দরকার হয়, মূলধনের প্রয়োজন হয়, শ্রমের প্রয়োজন হয় এবং তা প্রসারের জন্য সংগঠনের প্রয়োজন হয়, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেও এগুলির প্রয়োজন আছে। পার্থক্যটি হচ্ছে যে, বৈষয়িক কর্মগুলি সাধিত হয় কেবল ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য, কিন্তু সেই একই কর্ম যখন শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অনুষ্ঠিত হয়, তখন তা পারমার্থিক কর্মে পরিণত হয়। যদি কারও যথেষ্ট টাকা থাকে, তা হলে তিনি কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য মন্দির অথবা অফিস তৈরি করতে সাহায্য করতে পারেন। কিংবা তিনি গ্রন্থাদি প্রকাশনায় সাহায্য করতে পারেন। ভগবানের সেবার জন্য নানা রকম কাজ করবার সুযোগ রয়েছে, তবে সেই কাজগুলি করতে উৎসাহী হতে হবে। কেউ যদি তার কর্মের ফল সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ না করতে পারেন, তা হলেও তিনি অন্তত তার কিছু অংশ ভগবানের বাণী প্রচারের কাজে দান করতে পারেন।

ভগবানের বাণী বা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের কাজে স্বেচ্ছাকৃতভাবে সেবা করার ফলে ক্রমান্বয়ে ভগবৎ-প্রেমের উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত হওয়া যায়, যার ফলে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়।

শ্লোক ১১

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১ ॥

অথ—আর যদি; **এতৎ**—এই; অপি—ও; অশক্তঃ—অক্ষম; অসি—হও; **কর্তুম্**—করতে; **মৎ**—আমাতে; **যোগম্**—সর্বকর্ম অর্পণরূপ যোগ; **আশ্রিতঃ**—আশ্রয় করে; **সর্বকর্ম**—সমস্ত কর্মের; **ফল**—ফল; **ত্যাগম্**—ত্যাগ; **ততঃ**—তবে; **কুরু**—কর; **যতাত্মবান্**—সংযতচিত্তে।

গীতার গান

তাহাতেও যদি তব শক্তির অভাব ।
ভক্তিযোগ আশ্রয়েতে বিরুদ্ধ স্বভাব ॥
তবে সে বৈদিক কর্ম ত্যজি কর্মফল ।
অবশ্য সাধিবে তুমি যত্নেতে প্রবল ॥

অনুবাদ

আর যদি তাও করতে অক্ষম হও, তবে আমাতে সমস্ত কর্ম অর্পণ করে সংযতচিত্তে কর্মের ফল ত্যাগ কর।

তাৎপর্য

এমনও হতে পারে যে, সামাজিক, পারিবারিক, ধর্মীয় অথবা অন্য কোন রকম প্রতিবন্ধকের ফলে কেউ কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের কাজে সহায়তা করতে অসমর্থ। এমনও হতে পারে যে, সরাসরিভাবে কেউ যদি কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের কাজে যুক্ত হন, তা হলে তাঁর পরিবারের কাছ থেকে নানা রকম ওজর আপত্তি আসতে পারে অথবা নানা রকমের বাধাবিপত্তিও দেখা দিতে পারে। কারও যদিও এই রকমের সমস্যা থাকে, তাঁর প্রতি উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁর কর্মের সঞ্চিত ফল কোন সৎ উদ্দেশ্যে তিনি অর্পণ করতে পারেন। বৈদিক শাস্ত্রে এই ধরনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে নানা রকম যজ্ঞবিধির বর্ণনা করা হয়েছে এবং

সেখানে বিশেষ পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে পূর্বকৃত কর্মের ফল অর্পণ করা যায়। এভাবেই ধীরে ধীরে দিব্যজ্ঞান লাভের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, কৃষ্ণভাবনাময় কার্যকলাপে নিরুৎসাহী লোকেরা হাসপাতাল অথবা অন্য কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য দান করে থাকেন। এভাবেই তাঁরা বহু কষ্টে উপার্জিত অর্থ দান করার মাধ্যমে তাঁদের কর্মের ফল দান করে থাকেন। এই পন্থাকেও এখানে অনুমোদন করা হয়েছে, কারণ এভাবেই কর্মফল দান করার মাধ্যমে চিত্ত ক্রমশ নির্মল হতে থাকে এবং চিত্ত নির্মল হলে কৃষ্ণভাবনার অমৃত উপলব্ধি করা যায়। কৃষ্ণভাবনামৃত অবশ্য অন্য কোন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। কারণ কৃষ্ণভাবনামৃতই চিত্তকে নির্মল করতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণের পথে যদি কোন প্রতিবন্ধক দেখা দেয়, তা হলে কর্মফল ত্যাগ করার পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সেই সূত্রে সমাজসেবা, সম্প্রদায়-সেবা, জাতির সেবা, দেশের জন্য ত্যাগধর্ম আদি গ্রহণ করা যেতে পারে, যাতে এভাবেই কর্মফল ত্যাগ করার পরিণামে কোন এক সময়ে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যেতে পারে। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৪৬) বলা হয়েছে, *যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাম্*—কেউ যদি সর্ব কারণের পরম কারণ যে শ্রীকৃষ্ণ তা উপলব্ধি না করে, পরম কারণের উদ্দেশ্যে কোন কিছু অর্পণ করতে মনস্থ করে থাকেন, তা হলে সেই কর্ম অর্পণের মাধ্যমে তিনি ধীরে ধীরে এক সময় জানতে পারবেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্ব কারণের পরম কারণ।

শ্লোক ১২

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে ।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২ ॥

শ্রেয়ঃ—শ্রেষ্ঠ; হি—অবশ্যই; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; অভ্যাসাৎ—অভ্যাস অপেক্ষা; **জ্ঞানাৎ**—জ্ঞান অপেক্ষা; **ধ্যানম্**—ধ্যান; **বিশিষ্যতে**—শ্রেষ্ঠ; **ধ্যানাৎ**—ধ্যান থেকে; **কর্মফলত্যাগঃ**—কর্মফল ত্যাগ; **ত্যাগাৎ**—এই প্রকার ত্যাগ থেকে; **শান্তিঃ**—শান্তি; **অনন্তরম্**—তারপর।

গীতার গান

ভক্তিযোগে অসমর্থ যেবা অভ্যাসই ভাল ।
তাহাতে যে অসমর্থ জ্ঞানেতে সুফল ॥

তাহাতেও অসমর্থ আত্মচিন্তা শ্রেয় ।
তাহাতেও অসমর্থ কর্মযোগ শ্রেয় ॥
কাম্য কর্মে সুখ নাই ত্যাগই উত্তম ।
ত্যাগই শান্তির মূল তাতে নাহি ভ্রম ॥

অনুবাদ

তুমি যদি এই প্রকার অভ্যাস করতে সক্ষম না হও, তা হলে জ্ঞানের অনুশীলন কর। জ্ঞান থেকে ধ্যান শ্রেষ্ঠ এবং ধ্যান থেকে কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, কেন না এই প্রকার কর্মফল ত্যাগে শান্তি লাভ হয়।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভক্তি দুই রকমের—বৈধীভক্তির পন্থা ও পরম পুরুষোত্তম ভগবানের প্রতি আসক্তি-জনিত প্রেমভক্তির পন্থা। যাঁরা ভক্তিযোগের বিধি-নিয়মগুলি আচরণ করতে অসমর্থ, তাঁদের পক্ষে জ্ঞানের অনুশীলন করাই শ্রেয়, কারণ জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন। জ্ঞানের প্রভাবেই তাঁরা ধীরে ধীরে ধ্যানের স্তরে উন্নীত হতে পারেন এবং ধ্যানের প্রভাবে ধীরে ধীরে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে জানতে পারেন। কতকগুলি পন্থা আছে যা অনুশীলন করার ফলে পরমেশ্বর ভগবানকে নির্বিশেষ নিরাকার বলে মনে হয় এবং সেই প্রকার ধ্যানের পন্থা প্রয়োজন হয় তখনই, যখন কেউ ভক্তিযোগ অনুশীলন করতে অসমর্থ হন। যদি কেউ এভাবে ধ্যান করতে সক্ষম না হন, তা হলে বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের জন্য নির্দিষ্ট বর্ণাশ্রম-ধর্ম অনুশীলন করা যেতে পারে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতার* শেষ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই কর্মফল ত্যাগ করতে হয়। অর্থাৎ, কোন সৎ উদ্দেশ্যে কর্মফল নিবেদন করতে হয়।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, জীবনের পরম উদ্দেশ্য, ভগবানের সমীপবর্তী হবার দুটি পন্থা আছে—তার একটি হচ্ছে ক্রমিক উন্নতি সাধন এবং অপরটি হচ্ছে সরাসরি পন্থা। কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযোগ হচ্ছে সরাসরি পন্থা এবং অপরটি হচ্ছে কর্মফল ত্যাগের পন্থা। এভাবেই কর্মফল ত্যাগ করার ফলে জ্ঞানের স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, তার পরে ধ্যানের স্তরে, তার পরে পরমাত্মা উপলব্ধির স্তরে এবং সব শেষে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধির স্তরে। এখন, কেউ ধাপে ধাপে এগোতে

পারেন, অথবা সরাসরি পন্থা গ্রহণ করতে পারে। সরাসরি পন্থাটি গ্রহণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই ক্রমিক উন্নতির পন্থা গ্রহণ করাই মঙ্গলজনক। কিন্তু এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে, ভগবান অর্জুনকে পরোক্ষ পন্থাটি গ্রহণ করার নির্দেশ দেননি, কারণ তিনি ইতিপূর্বেই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু যাঁরা প্রেমভক্তিতে যুক্ত হয়ে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হতে পারেননি, তাঁদের জন্যই কেবল এভাবে বৈরাগ্য, জ্ঞান, ধ্যান, ব্রহ্ম-উপলব্ধি, পরমাত্মা-উপলব্ধি আদির মাধ্যমে ক্রমিক উন্নতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে *ভগবদ্গীতায়* প্রত্যক্ষ পন্থার উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেককে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সকলেই যেন এই সরাসরি পন্থা অবলম্বন করে পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন করেন।

শ্লোক ১৩-১৪

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অদ্বেষ্টা—দ্বেষবর্জিত; **সর্বভূতানাম্**—সমস্ত জীবের প্রতি; **মৈত্রঃ**—বন্ধু-ভাবাপন্ন; **করুণঃ**—কৃপালু; **এব**—অবশ্যই; **চ**—ও; **নির্মমঃ**—মমতাশূন্য; **নিরহঙ্কারঃ**—অহঙ্কার রহিত; **সম**—সম-ভাবাপন্ন; **দুঃখ**—দুঃখে; **সুখঃ**—সুখে; **ক্ষমী**—ক্ষমাশীল; **সন্তুষ্টঃ**—পরিতুষ্ট; **সততম্**—সর্বদা; **যোগী**—ভক্তিযোগে যুক্ত; **যতাত্মা**—সংযত স্বভাব; **দৃঢ়নিশ্চয়ঃ**—দৃঢ় সংকল্পযুক্ত; **ময়ি**—আমাতে; **অর্পিত**—অর্পিত; **মনঃ**—মন; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **যঃ**—যিনি; **মদ্ভক্তঃ**—আমার ভক্ত; **সঃ**—তিনি; **মে**—আমার; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়।

গীতার গান

আমার যে ভক্ত সর্বগুণের আধার ।
সকলের মিত্র হয় হিংসা নাহি তার ॥
ভক্ত নহে হিংসার পাত্র ভক্ত সে করুণ ।
জীবের দুর্দশা হেরি সদা দুঃখী মন ॥

দেহে আত্ম বুদ্ধি ভ্রম ভক্তের সে নাই ।
নির্মমোনিরহঙ্কার দুঃখের বালাই ॥
সর্বত সন্তুষ্ট যোগী সে দৃঢ় নিশ্চয় ।
যত্নশীল নিজ কার্যে আমাতে বিলয় ॥
তার কার্য মন প্রাণ আমাতে নিযুক্ত ।
আমার সে প্রিয় ভক্ত সর্বদাই মুক্ত ॥

অনুবাদ

যিনি সমস্ত জীবের প্রতি দ্বেষশূন্য, বন্ধু-ভাবাপন্ন, কৃপালু, মমত্ববুদ্ধিশূন্য, নিরহঙ্কার, সুখে ও দুঃখে সম-ভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সর্বদা সন্তুষ্ট, সর্বদা ভক্তিযোগে যুক্ত, সংযত স্বভাব, দৃঢ় সংকল্পযুক্ত এবং যাঁর মন ও বুদ্ধি সর্বদা আমাতে অর্পিত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্তির বর্ণনার পর, এই শ্লোক দুটিতে ভগবান আবার শুদ্ধ ভক্তের অপ্রাকৃত গুণাবলীর বর্ণনা করেছেন। শুদ্ধ ভক্ত কোন অবস্থাতেই বিচলিত হন না। তিনি কারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন, এমন কি তিনি তাঁর শত্রুর প্রতিও শত্রুতা করেন না; তিনি মনে করেন, "আমার পূর্বকৃত কর্মের দোষে এই লোকটি আমার প্রতি শত্রুবৎ আচরণ করছে। তাই, কোন রকম প্রতিবাদ না করে নীরবে সেই কষ্ট সহ্য করাই শ্রেয়।" *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১৪/৮) বলা হয়েছে—*তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্*। ভক্ত যখনই কোন দুঃখকষ্ট ভোগ করেন, তখন তিনি মনে করেন যে, এটি তাঁর প্রতি ভগবানেরই কৃপা। তিনি মনে করেন, "আমার পূর্বকৃত অপকর্মের ফলস্বরূপ আমার দুঃখের বোঝা আরও বেশি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার ফলে আমার সেই দুঃখের ভার লাঘব হয়ে গেছে। পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কৃপায় আমি কেবল অল্প একটু কষ্ট পাচ্ছি।" তাই, নানা দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও তিনি সর্বদাই শান্ত, নীরব ও সহনশীল। ভগবদ্ভক্ত সকলের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন, এমন কি তাঁর শত্রুর প্রতিও। *নির্মম* বলতে বোঝায় যে, ভক্ত দেহ সম্পর্কিত দুঃখ-যন্ত্রণাকে তত গুরুত্ব দেন না, কারণ তিনি ভালভাবে জানেন যে, জড় দেহটি তিনি নন। তিনি তাঁর জড় দেহটিকে তাঁর স্বরূপ বলে মোটেই মনে করেন না। তাই, তিনি সর্বতোভাবে অহঙ্কারমুক্ত এবং দুঃখ ও সুখ উভয় অবস্থাতেই সম-ভাবাপন্ন। তিনি সহিষ্ণু এবং পরমেশ্বর

ভগবানের কৃপায় তিনি যা পান, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। অত্যধিক কষ্ট স্বীকার করে কোন কিছু পাওয়ার জন্য তিনি অধিক প্রয়াস করেন না। তাই তিনি সর্বদাই উৎফুল্ল। তিনিই হচ্ছেন যথার্থ যোগী, কারণ তিনি তাঁর গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য করে তা পালন করতে স্থিরসংকল্প এবং যেহেতু তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি সংযত, তাই তিনি দৃঢ়সংকল্প। তিনি কখনই কুতর্কের দ্বারা প্রভাবিত হন না, কারণ ভগবদ্ভক্তির প্রতি তাঁর দৃঢ় নিষ্ঠা থেকে কেউই তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। তিনি সর্বতোভাবে সচেতন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন শাশ্বত চিরন্তন ভগবান। তাই, কেউ তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। তাঁর এই সমস্ত গুণাবলী থাকার জন্য তিনি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণে নিজের সমস্ত মন ও বুদ্ধি সর্বতোভাবে অর্পণ করতে পারেন। এই প্রকার উন্নতমানের ভগবদ্ভক্তি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুর্লভ। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ভক্তিযোগের বিধি-নিষেধ পালন করে সেই স্তরে অধিষ্ঠিত হন। অধিকন্তু, ভগবান বলেছেন যে, এই ধরনের ভক্ত তাঁর অতি প্রিয়, কারণ পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় তাঁর সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি ভগবান সর্বদাই সন্তুষ্ট।

শ্লোক ১৫

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

যস্মাৎ—যাঁর থেকে; **ন**—না; **উদ্বিজতে**—উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়; **লোকঃ**—লোক; **লোকাৎ**—লোক থেকে; **ন**—না; **উদ্বিজতে**—উদ্বেগ প্রাপ্ত হন; **চ**—ও; **যঃ**—যিনি; **হর্ষ**—হর্ষ; **অমর্ষ**—ক্রোধ ; **ভয়**—ভয়; **উদ্বেগৈঃ**—উদ্বেগ থেকে; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **যঃ**—যিনি; **সঃ**—তিনি; **চ**—ও; **মে**—আমার; **প্রিয়ঃ**—অত্যন্ত প্রিয়।

গীতার গান

তার দ্বারা কোন লোক দুঃখ নাহি পায় ।
কাহাকেও মনে প্রাণে দুঃখ নাহি দেয় ॥
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগ এসবে সে মুক্ত ।
অতএব মোর ভক্ত অতি প্রিয়যুক্ত ॥

অনুবাদ

যাঁর থেকে কেউ উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, যিনি কারও দ্বারা উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না এবং যিনি হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

ভক্তের আরও কয়েকটি গুণের কথা এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। ভক্ত কখনই কারও দুঃখ, উৎকণ্ঠা, ভয় অথবা অসন্তোষের কারণ হন না। যেহেতু ভক্ত সকলের প্রতিই কৃপা পরায়ণ, তাই তিনি কখনই এমন কোন কাজ করেন না, যার ফলে কারও উদ্বেগের সৃষ্টি হতে পারে। তেমনই, কেউ যদি ভক্তকে উৎকণ্ঠিত করতে চায়, তাতে তিনি কোন মতেই বিচলিত হন না। ভগবানেরই কৃপার ফলে তিনি এমনভাবে অভ্যস্ত যে, কোন রকম বাহ্যিক গোলযোগের দ্বারা তিনি বিচলিত হন না। প্রকৃতপক্ষে, ভক্ত যেহেতু সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত এবং শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় মগ্ন থাকেন, তাই জড় জগতের কোন অবস্থাই তাঁকে বিচলিত করতে পারে না। বৈষয়িক মানুষ সাধারণত ইন্দ্রিয়সুখ ও দেহসুখের সম্ভাবনায় অত্যন্ত আনন্দিত হন, কিন্তু তিনি যখন দেখেন যে, অন্যের কাছে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের এমন সমস্ত সামগ্রী রয়েছে, তা তাঁর কাছে নেই, তখন তিনি খুব বিমর্ষ হন এবং পরশ্রীকাতর হয়ে ওঠেন। যখন তিনি দেখেন তাঁর শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, তখন তিনি ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর জীবনে যখন ব্যর্থতা আসে, তখন তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত সর্বদাই এই সমস্ত উপদ্রব থেকে মুক্ত, তাই তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়।

শ্লোক ১৬

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥

অনপেক্ষঃ—নিরপেক্ষ; **শুচিঃ**—শুচি; **দক্ষঃ**—নিপুণ; **উদাসীনঃ**—উদাসীন; **গতব্যথঃ**—উদ্বেগশূন্য; **সর্বারম্ভ**—সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টার; **পরিত্যাগী**—ফলত্যাগী; **যঃ**—যিনি; **মদ্ভক্তঃ**—আমার ভক্ত; **সঃ**—তিনি; **মে**—আমার; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়।

গীতার গান

লোক ব্যবহারে ভক্ত সদা নিরপেক্ষ ।
উদাসীন গতব্যথ শুচি আর দক্ষ ॥
শুচি হয় মোর ভক্ত ব্রহ্ম সে স্বভাবে ।
জাতি বুদ্ধি নাহি কর ভক্ত সে বৈষ্ণবে ॥

অনুবাদ

যিনি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, উদ্বেগশূন্য এবং সমস্ত কর্মের ফলত্যাগী, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

তাৎপর্য

ভক্তকে টাকা-পয়সা দান করা যেতে পারে, কিন্তু তিনি কখনও সেগুলি পাবার জন্য সংগ্রাম করেন না। ভগবানের কৃপায় যদি আপনা থেকেই তাঁর কাছে টাকা-পয়সা আসে, তাতে তিনি বিচলিত হন না। ভক্ত স্বাভাবিকভাবেই দিনে দুবার স্নান করেন এবং ভগবানের সেবার জন্য খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠেন। তাই, তিনি স্বভাবতই অন্তরে ও বাইরে অত্যন্ত নির্মল। ভক্ত সর্বদাই সুদক্ষ, কারণ জীবনের সমস্ত কর্মের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণভাবে অবগত এবং প্রামাণিক শাস্ত্র সম্বন্ধে সর্বতোভাবে নিঃসন্দেহ। ভক্ত কখনই কোন বিশেষ দলের পক্ষ অবলম্বন করেন না; তাই তিনি সর্বদাই উদাসীন। তিনি সর্বোপাধি বিনির্মুক্ত, তাই তিনি কখনই ক্লেশ ভোগ করেন না। তিনি জানেন যে, তাঁর দেহটি একটি উপাধিমাত্র। তাই কখনও যদি দেহের কোন রকম যাতনা হয়, তাতে তিনি অবিচলিত থাকেন। শুদ্ধ ভক্ত এমন কিছুর প্রয়াস করেন না, যা কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, একটি বড় বাড়ি তৈরি করতে হলে অনেক শক্তি নিয়োগ করতে হয়। কিন্তু ভক্ত কখনও এই ধরনের কাজে উদ্যোগী হন না, যদি তা তাঁর ভগবদ্ভক্তির উন্নতির সহায়ক না হয়। তিনি ভগবানের জন্য মন্দির তৈরি করতে পারেন এবং সেই জন্য সমস্ত রকমের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা মাথা পেতে গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের জন্য বড় বাড়ি তৈরি করার কাজে প্রয়াসী হন না।

শ্লোক ১৭

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

যঃ—যিনি; **ন**—না; **হৃষ্যতি**—আনন্দিত হন; **ন**—না; **দ্বেষ্টি**—দ্বেষ করেন; **ন**—না; **শোচতি**—শোক করেন; **ন**—না; **কাঙ্ক্ষতি**—আকাঙ্ক্ষা করেন; **শুভ**—শুভ; **অশুভ**—অশুভ; **পরিত্যাগী**—পরিত্যাগী; **ভক্তিমান্**—ভক্তিযুক্ত; **যঃ**—যিনি; **সঃ**—তিনি; **মে**—আমার; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়।

গীতার গান

জড় কার্যে হর্ষ দুঃখ যে জনের নাই ।
ত্যজিয়াছে যে আকাঙ্ক্ষা চিন্তা যার নাই ॥
শুভাশুভ পরিত্যাগী যেবা ভক্তিমান ।
আমার সে প্রিয় ভক্ত তাহাকে সম্মান ॥

অনুবাদ

যিনি প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না এবং অপ্রিয় বস্তুর প্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না, যিনি প্রিয় বস্তুর বিয়োগে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত ইষ্ট বস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং শুভ ও অশুভ সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করেছেন এবং যিনি ভক্তিযুক্ত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্ত বৈষয়িক লাভ ও ক্ষতিতে উৎফুল্ল অথবা বিমর্ষ হন না। তিনি পুত্র অথবা শিষ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং তা না পেলে তিনি দুঃখিতও হন না। তাঁর প্রিয় বস্তু হারিয়ে গেলে তিনি অনুতাপ করেন না। তেমনই, তাঁর ঈপ্সিত বস্তু না পেলে তিনি বিমর্ষ হন না। তিনি সব রকম শুভ-অশুভ, পাপ-পুণ্য আদি জড় কর্মের ঊর্ধ্বে। পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি সব রকম বিপদ বরণ করতে প্রস্তুত। কোন কিছুই তাঁর ভগবদ্ভক্তি সাধনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় না। এই ধরনের ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়।

শ্লোক ১৮-১৯

**সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ ১৮ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥**

সমঃ—সম-ভাবাপন্ন; **শত্রৌ**—শত্রুর প্রতি; **চ**—ও; **মিত্রে**—মিত্রের প্রতি; **চ**—ও; **তথা**—তেমন; **মান**—সম্মানে; **অপমানয়োঃ**—অপমানে; **শীত**—শীতে; **উষ্ণ**—গরমে; **সুখ**—সুখে; **দুঃখেষু**—দুঃখে; **সমঃ**—সম-ভাবাপন্ন; **সঙ্গবিবর্জিতঃ**—কুসঙ্গ-বর্জিত; **তুল্য**—সমবুদ্ধি; **নিন্দা**—নিন্দা; **স্তুতিঃ**—স্তুতিতে; **মৌনী**—সংযতবাক্; **সন্তুষ্টঃ**—পরিতুষ্ট; **যেন কেনচিৎ**—যৎকিঞ্চিৎ লাভে; **অনিকেতঃ**—গৃহাসক্তিশূন্য; **স্থির**—স্থির; **মতিঃ**—বুদ্ধি; **ভক্তিমান্**—ভক্তিযুক্ত; **মে**—আমার; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **নরঃ**—মানুষ।

গীতার গান

শত্রু মিত্র অপমান কিংবা নিজ মান ।
জড়মুক্ত মোর ভক্ত মানয়ে সমান ॥
শীত, গ্রীষ্ম, সুখ, দুঃখ এক যেবা মানে ।
সঙ্গমুক্ত সেই ভক্ত স্থিত আত্মজ্ঞানে ॥
তুল্য নিন্দা স্তুতি আর সন্তুষ্ট গম্ভীর ।
নিকেতন তার নাই মতি তার স্থির ॥
সেই মোর প্রিয় ভক্ত সেই ভক্তিমান ।
ভক্তের লক্ষণ যত করিনু ব্যাখ্যান ॥

অনুবাদ

যিনি শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমবুদ্ধি, যিনি সম্মানে ও অপমানে, শীতে ও গরমে, সুখে ও দুঃখে এবং নিন্দা ও স্তুতিতে সম-ভাবাপন্ন, যিনি কুসঙ্গ-বর্জিত, সংযতবাক্, যৎকিঞ্চিৎ লাভে সন্তুষ্ট, গৃহাসক্তিশূন্য এবং যিনি স্থিরবুদ্ধি ও আমার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, সেই রকম ব্যক্তি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

ভক্ত সর্বদাই সব রকম অসৎসঙ্গ থেকে মুক্ত থাকেন। কখনও কখনও কেউ প্রশংসিত হয় এবং কেউ নিন্দিত হয়; সেটিই হচ্ছে মানব-সমাজের স্বভাব। কিন্তু ভক্ত সর্বদাই কৃত্রিম প্রশংসা ও নিন্দা, সুখ অথবা দুঃখ থেকে মুক্ত থাকেন। তিনি অত্যন্ত সহিষ্ণু। তিনি কৃষ্ণকথা ছাড়া আর কোন কথাই বলেন না। তাই তাঁকে বলা হয় মৌন। মৌন শব্দের অর্থ এই নয় যে, কারও কথা বলা উচিত নয়; মৌন শব্দের অর্থ হচ্ছে বাজে কথা না বলা। প্রয়োজনীয় কথাই কেবল মানুষের বলা উচিত এবং ভক্তের কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের জন্য কথা বলা। ভক্ত সর্ব অবস্থাতেই সুখী। তাঁর ভাগ্যে কখনও অত্যন্ত সুস্বাদু খাবার জুটতে পারে, কখনও না-ও জুটতে পারে, কিন্তু তিনি সর্ব অবস্থাতেই সন্তুষ্ট। তাঁর বাসস্থানের কোন সুযোগ-সুবিধার জন্য তিনি কখনও যত্ন করেন না। তিনি কখনও গাছের নীচে থাকতে পারেন, কখনও আবার বিরাট প্রাসাদোপম

অট্টালিকাতেও থাকতে পারেন। কিন্তু তিনি কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট নন। তিনি হচ্ছেন অবিচলিত, কারণ তিনি সত্যসংকল্প ও জ্ঞানী। ভক্তের গুণাবলীর বর্ণনায় মাঝে মাঝে পুনরুক্তি দেখা দিতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত সদ্‌গুণ ব্যতীত কখনই যে শুদ্ধ ভক্ত হওয়া যায় না, সেটি বুঝিয়ে দেবার জন্যই তা করা হয়েছে। *হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ*—যে ভক্ত নয়, তার কোন সদ্‌গুণ নেই। যিনি ভক্তরূপে পরিচিত হতে চান, তাঁর পক্ষে এই সমস্ত সদ্‌গুণগুলি অর্জন করা একান্ত কর্তব্য, তবে এর জন্য তাঁকে বাহ্যিক প্রয়াস করতে হয় না। কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হওয়ার ফলে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার ফলে, আপনা থেকেই তাঁর মধ্যে এই সমস্ত গুণগুলির বিকাশ হয়।

শ্লোক ২০

যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে ।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

যে—যাঁরা; **তু**—কিন্তু; **ধর্ম**—ধর্ম; **অমৃতম্**—অমৃতের; **ইদম্**—এই; **যথা**—যেমন; **উক্তম্**—কথিত; **পর্যুপাসতে**—পূর্ণরূপে উপাসনা করেন; **শ্রদ্দধানাঃ**—শ্রদ্ধাবান; **মৎপরমাঃ**—মৎপরায়ণ; **ভক্তাঃ**—ভক্তগণ; **তে**—সেই সকল; **অতীব**—অত্যন্ত; **মে**—আমার; **প্রিয়াঃ**—প্রিয়।

গীতার গান

এই শুদ্ধ ভক্তি যেবা করিবে সাধনা ।
অমৃত সে ধর্ম জান জড় বিলক্ষণা ॥
তাহাতে যে শ্রদ্ধাযুক্ত অনুকূল প্রাণ ।
অত্যন্ত সে প্রিয় ভক্ত আমার সমান ॥

অনুবাদ

যাঁরা আমার দ্বারা কথিত এই ধর্মামৃতের উপাসনা করেন, সেই সকল শ্রদ্ধাবান মৎপরায়ণ ভক্তগণ আমার অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ে ২য় শ্লোক থেকে শেষ পর্যন্ত—*ময্যাবেশ্য মনো যে মাম্* (আমাতে মনোনিবেশ করে) থেকে *যে তু ধর্মামৃতমিদম্* (এই অমৃতময় ধর্ম) পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবান তাঁর সমীপবর্তী হবার জন্য অপ্রাকৃত সেবার পন্থা বিশ্লেষণ করেছেন। এই পন্থাগুলি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় এবং কোন ব্যক্তি যখন সেগুলির মাধ্যমে নিয়োজিত হন, ভগবান তখন তা গ্রহণ করেন। অর্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মোপলব্ধির পন্থা অবলম্বন করেছেন যে নির্বিশেষবাদী এবং অনন্য ভক্তি সহকারে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবা করেছেন যে ভক্ত, এই দুজনের মধ্যে কে শ্রেয়। তার উত্তরে ভগবান তাঁকে স্পষ্টভাবে উত্তর দিলেন যে, ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করাটাই হচ্ছে পারমার্থিক উপলব্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে বলা যায়, এই অধ্যায়ে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, সাধুসঙ্গের প্রভাবে অনন্য ভক্তিতে ভগবানের সেবা করার প্রতি আসক্তি জন্মায় এবং তার ফলে সদ্‌গুরু লাভ হয় এবং তাঁর কাছ থেকে শ্রবণ, কীর্তন করা শুরু হয় এবং তখন দৃঢ় বিশ্বাস, আসক্তি ও ভক্তি সহকারে বৈধীভক্তির অনুশীলন সম্ভব হয়। এভাবেই ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় নিযুক্ত হতে হয়। এই অধ্যায়ে এই পন্থা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আত্ম-উপলব্ধির জন্য, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভের জন্য ভক্তিযোগই যে পরম পন্থা, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। পরম-তত্ত্বের নির্বিশেষ উপলব্ধি করার যে পন্থা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, তা কেবল আত্ম-উপলব্ধি লাভের পথে একান্ত প্রয়োজনীয় আত্ম-সমর্পণের সময় পর্যন্তই অনুশীলনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভের সুযোগ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির ধ্যান করা লাভজনক হতে পারে, কিন্তু ভগবানের সবিশেষ রূপের ভক্তিযুক্ত সেবাই হচ্ছে পরম প্রাপ্তি। পরমেশ্বরের নির্বিশেষ অব্যক্ত রূপের উপাসনায় কর্মফল ভোগের আশা পরিত্যাগ করে ধ্যান করতে হয় এবং জড় ও চেতনের পার্থক্য নিরূপণ করার জ্ঞান অর্জন করতে হয়। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ না করা পর্যন্ত এই পন্থার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, কেউ যদি সরাসরিভাবে অনন্য ভক্তিতে ভগবানের সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তা হলে তাঁকে আর ক্রমোন্নতির মাধ্যমে পরমার্থ সাধনের পথে এগোতে হয় না। *ভগবদ্‌গীতার* মধ্য ভাগের ছয়টি অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে যা বর্ণনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত সহজসাধ্য। এই পন্থায় দেহ ধারণ করার জন্য জড় বস্তু-বিষয়ক দুশ্চিন্তা করতে হয় না, কারণ ভগবানের কৃপায় সব কিছু আপনা থেকেই সম্পাদিত হয়ে যায়।

ভক্তিবেদান্ত কহে শ্রীগীতার গান ।
শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ ॥

ইতি—'ভক্তিযোগ' নামক শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।